প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রাকর
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলকাতা ৭০০০১৪

গঙ্গার কথা প্রসঙ্গে

আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা।

বিহারের পাতরাতুতে থাকতাম। বর্ষাকাল। সেবারে বেড়াতে এসে সেজকা মাসখানেক ছিলেন পাতরাতুতে। সন্ধ্যায় নানা গল্প শুনতাম। তার মধ্যে বেশীর ভাগই গঙ্গা সম্পর্কে। ১৯৫৯ সনে প্রথম ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী আর ধৌলী গঙ্গার ধারা দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলাম উচ্চ হিমালয়ের দিকে। তুষারাবৃত অঞ্চলে কোথায় গঙ্গার পবিত্র ধারা লুকিয়ে আছে দেখতে গিয়েছিলাম। মুগ্ধ হয়েছিলাম পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন করে। বাস রাস্তা পিপলকোঠি অবধি থাকলেও বর্ষায় ধস নেমে পথ ভেঙে যেতো। এমনি পথঘাট ভেঙে যেতো গোমুখ যাবার পথে। ভাটোয়ারী থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। পায়ে হাঁটা দীর্ঘ পথ, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি। দুর্গম পথ চলার উৎকণ্ঠা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ। পথ চলতে চলতে—সুদূর অতীত যুগের মহারাজা ভগীরথও এই পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার উৎসের পথে। তাঁর পথ চলার সাধনার ফলশ্রুতি 'গঙ্গাবতরণ', সেজকার লেখা প্রথম বই 'গঙ্গাবতরণ' আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছিল। গঙ্গোত্রী গোমুখ দর্শন করেছিলেন তিনি অনেকবার। উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর তীরে অবস্থানরত সন্ন্যাসীদের কথা, দুর্গম তীর্থের বর্ণনা শুনেছি তাঁর কাছ থেকেই। তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম 'গঙ্গার কথা'। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন কোন সুদূর অতীতে। যুগের সেই স্বাক্ষর রয়েছে রামায়ণে। ঋগ্বেদে গঙ্গার কথা লেখা আছে। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণে গঙ্গার উৎস, গঙ্গার গতিপথ, গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা জনপদ আর তীর্থভূমির কথা রয়েছে লেখা। গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে অবতরণ করেছে মর্ত্যলোকে এ প্রাচীন তথ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ। এই তথ্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করা যায় হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা, অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের অগাধ বিশ্বাস, আর শ্রদ্ধার স্বাক্ষর দেখা যায়

ভাগীরথীর তীরে তীরে। এমন এক বিস্ময়কর পরম পবিত্র নদীর কথা বলতে চেয়েছি।

১৯৫৯ সন থেকে শুরু করে ১৯৫৯ সন পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই চেষ্টা করেছি হরিদ্বার থেকে গোমুখ পর্যন্ত তিন শত মাইল দীর্ঘ ভাগীরথীর ধারা অনুসরণ করবার জন্য। গোমুখের ওপরেও গঙ্গার পবিত্র ধারার অস্তিত্ব অনুভব করেছি। গঙ্গোত্রী গোমুখে গিয়েছি বার বার। গোমুখ পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছি। পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছি মূল হিমবাহের শাখা-প্রশাখাগুলো। এই অঞ্চলে অবস্থিত বিচিত্র তুষারাবৃত শৃঙ্গ দর্শন করেছি কখনো বা অভিযাত্রীর পোশাক পরে, কখনো বা তীর্থযাত্রীর বেশে। এই সব পর্বতশৃঙ্গগুলির নাম— শিবলিঙ, কেদারনাথ, সতোপন্থ, সুমেরু, নীলকণ্ঠ, বদ্রীনাথ। আর এই সব তুষারাবৃত পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা তুষারধারা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিদেশী ভূগোল বিজ্ঞানীরা গঙ্গার উৎস নিয়ে গবেষণা করেছেন। গঙ্গার ধারা নিয়ে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত দীর্ঘ বারো শত মাইল গতিপথ। এলাহাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত ছয় শত মাইল গঙ্গার গভীরতা সব চাইতে বেশী। ১৮৬৯ সনে রাজমহলে গঙ্গার গভীরতা ছিল দশ থেকে পনেরো ফুট। উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নির্দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৮৩৪ সনে এপ্রিল মাসে স্টিমারে করে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ গিয়ে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় আটত্রিশ দিনে।

আজ আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গার জলধারা কি ক্ষীণ হতে চলেছে!

১৮৬৯ সনে সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার ধারার সব চাইতে বেশী পরিমাণ জল পরিবাহিত হত রাজমহল দিয়ে ১৫,০০,০০০ কিউসেক। গঙ্গার স্রোতের বেগ গ্রীষ্মে ছিল ঘণ্টায় তিন মাইল, অন্য সময়ে ঘণ্টায় সাত থেকে আট মাইল। গাজীপুর অঞ্চলে গঙ্গাগর্ভে সঞ্চিত পলিমাটির পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩৫,০০০ টন। ভাগীরথীর জলধারার সব চাইতে বেশী পরিমাণ জল পরিবাহিত হত বহরমপুরে ১,৪০,৭৬২ কিউসেক, জাঙ্গীপুরে ১,৪০,১৬০ কিউসেক।

ভাগীরথীর জলস্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৪·০৫৬ মাইল থেকে ৫·০২৯ মাইল। আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গাগর্ভে প্রবাহিত জলভারের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০,০০০ কিউসেক। শুখা মরশুমে বহরমপুরে ভাগীরথী ক্ষীণ হতে দেখেছি আজ থেকে দশ বছর পূর্বে। পায়ে হেঁটে নদী পারাপার করতে দেখেছি।

গঙ্গা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। রূপকথা আর উপকথায় ভরা এমন বিস্ময়কর নদী, যা মাতৃস্বরূপা, সুদূর অতীত যুগ থেকে ধনসম্পদ ও শস্যসম্ভারে পূর্ণ করে রেখেছিল গাঙ্গেয় উপত্যকাকে, গঙ্গার সেই অপরূপ রূপের কথা বলতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি সেই অতীত যুগের গঙ্গার কথা।

গঙ্গার কথা লিখতে গিয়ে উৎসাহ প্রেরণা পেয়েছি শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে। তার মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর কথা ভুলতে পারি না। আমার প্রথম বই রহস্যময় রূপকুণ্ডু গ্রন্থ রচনায় তাঁর যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম, আজো তা সমানভাবে অব্যাহত।

এই গ্রন্থ রচনার সময় সর্বক্ষণ উৎসাহ দিতেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার, বন্ধুবর রতন সান্যাল, সুভাষ সমাজদার, হিমাদ্রি ভট্টাচার্য ও বিনীত দাশগুপ্ত। পাণ্ডুলিপি রচনার সময় নানাভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যাপ্রতিম শ্রীমতী সীমা হালদার (হাজরা)।

এই দুরূহ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সমীর নাথের দুঃসাহসিকতার কথা ভেবে ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থপঞ্জী -

সংস্কৃত

১:	ঋগ্বেদ	দশম খণ্ড	৭৫ সূক্ত
২.	বাল্মিকী রামায়ণ		বালখণ্ড
৩.	দ্বৈপায়ন ব্যাস-মহাভারত		বন পর্ব
৪.	বায়ু পুরাণ		৪৭ অধ্যায়
			৯২ অধ্যায়
৫.	মৎস্য পুরাণ		৯০ অধ্যায়
			১২১ অধ্যায়
৬.	ভাগবত পুরাণ		১১ অধ্যায়
			১২ অধ্যায়
			১৭ অধ্যায়
৭.	পদ্মা পুরাণ		ক্রিয়াযোগ সার
৮.	বিষ্ণু পুরাণ		১৭ অধ্যায়
৯.	মার্কণ্ডেয় পুরাণ		৯০ অধ্যায়
১০.	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ		১১ অধ্যায়
১১.	স্কন্দ পুরাণ		উত্তরাখণ্ড

ইংরাজী

1.	Ancient Geography	Cunninghum
2-	Geographical Dictionary of Ancient and Medeaval India.	N. L. De.
3.	Studies in the Geography of Ancient and Medeaval India	D. C. Sircar.
4.	Historical Geography of Ancient India.	B. C. Law.
5.	Rivers of India	B. C. Law.

॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনী মাত
স্তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।

ভাগীরথীর জলকল্লোলের সামনে বসে বসে অনেক কথা ভাবতে ভাল লাগে। সূর্য অস্ত যায়। সোনালী আলোর ছটা ভাগীরথীর বুকের ওপরে ঠিকরে পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে পাহাড়ের অলিগলি পেরিয়ে। পাইন আর চীর গাছের ঘন ছায়ার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে নিঃশব্দে। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে উচ্ছল জলধারার ওপরে। এক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিমশীতল জলের মধ্যে। জলধারার রঙ বদলে যায় মুহূর্তের মধ্যে। গাছের ছায়ার ভেতর থেকে ভেসে-আসা হিমেল হাওয়া যেন মাতাল হয়ে ওঠে। ভাগীরথীর বুকে ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসতে শুরু করে। আকাশের রঙ বদলের পালা আরম্ভ হয়। পাহাড়ের পাঁচিল টপকে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের শেষ লোহিত আভা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পূব-উত্তর আকাশের কোণে তুষার-ধবল সুদর্শন পর্বত[১] সোনালী রঙে রঞ্জিত। সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের বুকে মুখ তুলে তাকায়। চারদিকের আলো নিভে যেতে শুরু করে। আকাশের বুকে ফুটে ওঠা ঝকঝকে তারাগুলোর দিকে তাকাতেই চমকে উঠি। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির শব্দ ভেসে আসে। ভাগীরথীর কলরব স্তিমিত হতে থাকে। সমস্ত পাহাড় আর বনভূমি জুড়েই ততক্ষণে শুরু হয়েছে সন্ধ্যা-আরতি। মন্দিরের আরতির পর পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে পুজারী চারদিক প্রদক্ষিণ করে। বসে বসে দেখি, স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে কেমন যেন আনমনা হই।

কেন জানি না, গঙ্গোত্রী আমার এত ভাল লাগে! অশান্ত মনকে নিয়ে বারবার ছুটে আসি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে। সুদূর অতীত যুগের এই পথ ছিল দুর্গম ও বন্ধুর। সেই পথের স্মৃতি নিয়ে আসি দুচোখ ভরে। ভয়, দুর্বলতা, ক্লান্তি, অবিশ্বাস, সবকিছু হারিয়ে যায়। আমার পদযাত্রার সামনে কোন কিছুই দাঁড়াতে পারে না। নতুন নতুন রূপ নিয়ে গঙ্গোত্রী আমায় কতবার ডেকে আনে নানা অছিলায়। শহরের কল-কোলাহল পেরিয়ে আমি যেন সব কিছু ছেড়ে ছুটে চলে আসি। কখনো

১. সুদর্শন পর্বত ২১৩৫০ ফুট

বা আসি পদযাত্রীর সাজসজ্জায়, কখনো বা দুঃসাহসী অভিযাত্রীর বিচিত্র বেশভূষায়। ভাগীরথী খল-খল করে হাসে। জলোচ্ছ্বাসের উল্লাসে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় আমাকে। কলকাতায় ভাগীরথীর তীরে বসে বসে মনের মধ্যে সব আশাআকাঙ্ক্ষা দুঃসাহসের দম্ভ আর অহঙ্কার জড়ো করি। তারপর, সেই সব দুর্বহ বোঝা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসি দীর্ঘ পথ বেয়ে গঙ্গোত্রী। ঢেলে দিই, ভাগীরথীর উচ্ছল জলপ্রবাহের মাঝখানে। অনেক কথা বলবার ইচ্ছে জাগে, ভাগীরথী যেন আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে নিঃস্ব করে দেয়।

সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হতেই আবার নদীর কলোচ্ছ্বাস ভেসে আসতে শুরু করে। ওপারে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া। গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে স্তিমিত আলোর আভাস জেগে ওঠে। গঙ্গোত্রী মন্দিরে ভিড় কমতে শুরু হয়। পূজারী আর পাণ্ডারা জড়ো হতে থাকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপাশে অগ্নিকুণ্ডের চারধারে চীর আর পাইন গাছের ডালপালা জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। আগুনের আলোর মাঝখানে কতগুলো বৃদ্ধ দরিদ্র মানুষের চিত্র দেখি। ছোটবেলা থেকেই ওরা দেখে এসেছে গঙ্গোত্রীর চিত্র। ওরা সুদূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থনকারী। কালের পরিবর্তনে অতীতকালের চিত্র হারিয়ে ফেলেছে। গঙ্গার উৎস, সুদূর অতীতকাল থেকেই পরম পবিত্র তীর্থ। সেই পবিত্র তীর্থ দর্শন মানসে তীর্থযাত্রীরা আসতো। সে যুগে কোন যানবাহন ছিল না। পদযাত্রাই ছিল একমাত্র সম্বল। তাই তারা দুর্গম পথ বেয়ে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আসতো। তাদের চোখেমুখে থাকতো দর্শনের ব্যাকুলতা। পদযাত্রার দুঃখ, বেদনা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার সমাপ্তি হত উৎসস্থলে পেঁছে যাবার পর। অতীত যুগের সেই দীর্ঘ পদযাত্রার ইতিহাস হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে। সেই অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থন করবার চেষ্টা করলে মনে হবে—

Numerous sacrifices of life that must have been made when the sources of Ganges were first explored by pilgrims.—'Burrard'.

গঙ্গার উৎস সন্ধানের প্রথম অভিযানের পেছনে কত অসংখ্য তীর্থযাত্রীর আত্মত্যাগের কাহিনী রয়েছে। সে সব আত্মত্যাগের কাহিনী অতীত যুগের ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। সে যুগের পথ অনুসরণ করে যদি পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে পারতুম হাজার হাজার বছর অতীতের বেদ, রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের দিনগুলিতে ?

গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে বসে বসে এসব কথা আমার মনকে ভরিয়ে

রাখতে চায়। মন্দিরের ভেতরে অস্পষ্ট দীপালোকে দেখি মহারাজা ভগীরথকে। সে যুগের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি যেন মূর্ত হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। গঙ্গার পবিত্র ধারার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রথম সার্থক অভিযানের কথা ভাবতেই মহারাজা ভগীরথের কথাই মনে জাগবে। রামায়ণ ও মহাভারতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। রামায়ণকে অনুসরণ করেছে মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও ভাগবত-পুরাণ। এ ছাড়াও আরো পুরাণে গঙ্গা আনয়নের কাহিনী লেখা আছে। সে সব যুগের কাল নির্ণয় করা আজও দুঃসাধ্য।

ইতিহাস নেই, কিন্তু কাহিনী রয়েছে। গঙ্গা দর্শন ও তার পবিত্র ধারা অন্বেষণের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন মহারাজা সগর[২]। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে তিনি অশ্ব প্রেরণ করেছিলেন। সেই অশ্ব স্বর্গ, মর্ত্য পরিভ্রমণের পর পাতালে প্রবেশ করেছিল। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ষাট হাজার সন্তান যজ্ঞাশ্বের পথযাত্রা অনুসরণ করে স্বর্গ, মর্ত্য ভ্রমণের পর অগ্রসর হয়েছিল পাতাল অভিমুখে। পাতালের প্রবেশ পথ ছিল দুর্গম ও অগম্য। পথ খুঁজে বার করবার জন্য খনন-কার্য সম্পন্ন করতে হয়েছিল তাদের। কঠোর পরিশ্রমের পর তারা পেঁছে গিয়েছিল পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে। সগর-সন্তানগণ আশ্রমে যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পাওয়ায় মহর্ষি কপিলকেই অশ্ব অপহরণকারী মনে করে নানা কুৎসিত ভাষায় কটূক্তি করেছিল। তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে মহর্ষি কপিলের ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি। অভিশাপের ফলে ভস্মীভূত হয়েছিল ষাট হাজার সগর-সন্তান। যজ্ঞাশ্ব আনয়নে দীর্ঘ বিলম্ব লক্ষ্য করে সগর রাজা তাঁর পৌত্র অংশুমানকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বের সন্ধানে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অংশুমান অবশেষে খুঁজে পেয়েছিলেন ষাট হাজার পিতৃব্যের খনন করা পথ। সেই পথের নিশানা অনুসরণ করে তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে। অদূরেই দেখতে পেয়েছিলেন সগর-সন্তানদের স্তূপীকৃত মৃতদেহ। দেহগুলির সামনে শোকাকুল অংশুমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। মৃতদেহগুলির সলিল ক্রিয়ার প্রয়োজন। কিন্তু জলের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। ঠিক এমনি এক অসহনীয় পরিবেশে খগরাজ গরুড় আবির্ভূত হয়েছিলেন অংশুমানের সম্মুখে। ষাট হাজার সগর সন্তানদের অপমৃত্যুর কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন তিনি। ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত সগর-সন্তানদের দেহ ছিল পাপযুক্ত। সেই পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে পতিত-পাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হতে

২. রামায়ণ বালখণ্ড ; মহাভারত বনপর্ব।

হবে। গঙ্গার পবিত্র জলধারায় অভিশপ্ত দেহগুলি ধৌত ও প্লাবিত হলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হবে। গরুড়ের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনবার পর অংশুমান যজ্ঞাশ্ব নিয়ে পেঁাছে গিয়েছিলেন নিজরাজ্যে। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর সমস্ত রাজ্যভার অংশুমানের ওপরে ন্যস্ত করে মহারাজা সগর রাজ্য সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন গঙ্গার সন্ধানে। দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন তিনি গঙ্গার পবিত্র ধারা আনয়ন করবার জন্য। কঠোর তপস্যায় ব্যর্থ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি।

মহারাজ সগরের অবর্তমানে বেশ কিছুকাল রাজ্য পরিচালনা করবার পর মহারাজা অংশুমান রাজ্যভার পুত্র দিলীপের হাতে সমর্পণ করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। স্বরাজ্য পরিত্যাগ করে তিনি বেরিয়েছিলেন দুর্গম হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। হিমালয়ে কঠোর তপস্যার বলে তিনি স্বর্গ-গঙ্গার ধারা আনয়ন করতে চেয়েছিলেন মহর্ষি কপিলের আশ্রমে। সেখানেই সগর-সন্তানদের মৃতদেহ পড়ে ছিল। সহস্র বৎসর কৃচ্ছ্রসাধনা করেছিলেন তিনি হিমালয়ের গভীরে অবস্থান করে। কিন্তু গঙ্গার ধারা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন দুর্গম হিমালয়ের বুকে। অংশু-মানের অভাবে মহারাজা দিলীপ রাজ্য শাসন করেছিলেন। ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে কালাতিপাত করে-ছিলেন। দীর্ঘকাল মনঃকষ্টের ফলে মহারাজ দিলীপ অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। গঙ্গা আনয়নের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

গঙ্গোত্রী মন্দিরের চারদিকের কলরব স্তব্ধ হতে শুরু করে। রাত্রি গভীর হতে থাকে। দূর হতে ভেসে-আসা ভাগীরথীর অস্ফুট কলকণ্ঠ যেন আকাশে বাতাসে মুখর হয়ে থাকে। অস্বচ্ছ দীপালোকে মন্দিরের অভ্যন্তরে মহারাজা ভগীরথের মূর্তি বারবার দেখি। সুদূর রামায়ণ-মহাভারতের যুগ যেন এগিয়ে আসে আমার সামনে। দীর্ঘ পথ বেয়ে দুর্গম হিমালয়ে মহারাজা ভগীরথ একদিন এসেছিলেন এখানে। এখান থেকে আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন গোমুখে। সে সব পথের চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছে কালের স্পর্শে। গোমুখ থেকে দেখা যায় ভগীরথ পর্বতমালা। আর সেই ভগীরথ পর্বতমালার সন্নিকটেই শিবলিঙ্গ পর্বত[৩], কেদারনাথ পর্বত[৪]। শিবলিঙ্গ ও কেদারনাথ তো মহাদেবেরই অপর নাম। এই

৩. শিবলিঙ্গ পর্বত ২১৪৬৬ ফুট

৪. কেদারনাথ পর্বত ২২৭৭০ ফুট

মহাদেবের কাছ থেকে বর প্রার্থনার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। অবশেষে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি। মহাদেবের জটাজল থেকে মুক্ত পবিত্র গঙ্গার ধারা তিনি নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যলোকের জন্য। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে বসে বসে এসব কথা ভাবতে আমার অদ্ভুত ভাল লাগে।

॥ ২ ॥

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥

মহাদেবের জটা!

আমি দেখিনি। মহাদেবকেও নয়। কিন্তু মহারাজা ভগীরথ দেখেছিলেন। দীর্ঘ তপস্যা আর কৃচ্ছ্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি দর্শনলাভ করেছিলেন মহাদেবের। এসব কথা মায়ের মুখ থেকে শুনতাম। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। রামায়ণ মহাভারতের কথা জানতুম না। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত হয়েছিল গঙ্গার পবিত্র ধারা। এই পবিত্র গঙ্গার কাহিনী শুনতে শুনতে বড় হয়েছিলাম। শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। মৃত্যুর দরজা আগলে ধরে শুনেছি। দীর্ঘ জীবনের অনেক পথই পেরিয়ে এসেছি কল্পনার রথে চেপে। গহনগিরির অলিগলি পেরিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি, হাতড়ে বেড়িয়েছি দিশেহারা হয়ে। মহাদেবের জটার দর্শন পাইনি।

একবার চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলাম। কলকাতার গা বেয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে গৈরিকবর্ণা জলধারা। মা আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এই সেই পতিত-পাবনী গঙ্গা। এই পবিত্র জলধারা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেছিল। স্বর্গলোকে প্রবাহিত এই ধারার নাম স্বর্গগঙ্গা। স্বর্গগঙ্গার সৃষ্টির কাহিনী মা শুনিয়েছিলেন একদিন।

দেবর্ষি নারদ ত্রিভুবন পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। পরিক্রমার পথে দেবর্ষি আকস্মিক থমকে দাঁড়িয়েছিলেন এক মনোরম সরোবরের সামনে। সেখানে দেখেছিলেন পরমা সুন্দরী দেবকন্যা আর অপরূপ সুন্দর দেবপুত্রগণ। তাঁদের সর্বাঙ্গে মারাত্মক ক্ষত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিকলাঙ্গ। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁরা ক্রন্দনরত। দেবর্ষি তাঁদের অবস্থা দর্শন করে ব্যথিত হয়েছিলেন। করুণার্দ্র স্বরে তিনি তাঁদের পরিচয় জানতে

চেয়েছিলেন। তাঁদের এই শোচনীয় দুঃখ ও বেদনার কারণও চেয়েছিলেন জানতে। দেবর্ষির প্রশ্নে যন্ত্রণাকাতর স্বরে তাঁরা পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মহাত্মন্, আমরা সবাই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

—সে কি! দেবর্ষি নারদ চমকে উঠেছিলেন—তোমাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, দেহ বিকলাঙ্গ! তোমাদের এই শোচনীয় দুর্দশার কারণ কি?

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী বলেছিলেন—আমাদের এই শোচনীয় দুর্দশার মূলে একজন দাম্ভিক পুরুষ!

দেবর্ষি নারদ যেন চিন্তাকুল হয়েছিলেন। আগ্রহ সহকারে জানতে চেয়েছিলেন—কে সেই দাম্ভিক পুরুষ, যার জন্য তোমাদের এই দুরবস্থা! কে সেই পাপাত্মা! সম্ভব হলে আমি তোমাদের এই দুর্দশা মোচন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

রাগ রাগিণী বলেছিলেন—মহাত্মন্ আমাদের এই দুর্দশার কারণ বলে কি হবে জানি না। আমাদের এই দুর্দশা দূর করাও আপনার সাধ্যাতীত।

—তবু বল! যদি কোন উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

রাগ রাগিণী বলেছিলেন—আমাদের দুর্দশার কারণ, দেবর্ষি নারদ।

—দেবর্ষি নারদ! বজ্রাহত হয়েছিলেন তিনি। আত্মস্থ হয়ে দেবর্ষি বলেছিলেন—কেমন করে এ দুর্দশা হল তোমাদের!

—দেবর্ষি নিজেকে ত্রিভুবনে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ভেবে মনে অহংকার আর দম্ভ পোষণ করেন। অথচ সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছুমাত্র না জেনে তিনি সঙ্গীতের নামে শুধুমাত্র শুদ্ধ রাগ রাগিণী বিকৃত করেছিলেন। তাঁর বিকৃত সঙ্গীতের নির্যাতনে আমরা ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছি।

অসম্ভব মনোবেদনায় দেবর্ষি নারদের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আত্মসমালোচনায় মগ্ন হয়েছিলেন তিনি। তিনি অহর্নিশ সঙ্গীতের প্রচার করেন। সত্যি তো, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ভেবে নিজেকে দাম্ভিক ও অহংকারী করে তুলেছিলেন। লজ্জিত হয়েছিলেন দেবর্ষি। ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাগ-রাগিণীগণকে—কি করলে তোমাদের এ দুর্দশা দূর হবে?

—আমাদের এই দুর্দশা দূর করতে পারেন একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব। তিনিই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদি ও অন্ত। তাঁর সঙ্গীতের মূর্ছনায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ঘটতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তিনি যদি কৃপা করে শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করান, তাহলে আমাদের বিকলাঙ্গ দেহ সবল সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

দেবর্ষি ম্লান হেসে বলেছিলেন—আমি তোমাদের জন্য দেবাদিদেবের আরাধনা করবো।

—সে কি মহাত্মন্!

—হ্যাঁ। আমিই নারদ। আমিই সেই দাম্ভিক ঋষি।

দেবর্ষি নারদ ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়েছিলেন কৈলাসে। সেখানে কৈলাসপতি মহাদেবের চরণ বন্দনা করে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন—দেবাদিদেব, আমার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়েছে প্রভু! আমি স্বল্পজ্ঞান নিয়ে নিজেকে অনেক বড় ভেবেছি। অহংকারে অন্ধ হয়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের কিছুই না জেনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নামে শুদ্ধ রাগ রাগিণী বিকৃত করেছি। আমি মহা অপরাধী প্রভু!

মহাদেব আশ্বস্ত করেছিলেন দেবর্ষি নারদকে। নারদ তাঁর কাছে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন কাতরকণ্ঠে—প্রভু, কৃপা করে তুমি একবার শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাও। তুমি কৃপা না করলে, আমার এ অপরাধ স্খালন হবে না। মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁর বিশাল জটাজাল এলিয়ে শুরু করেছিলেন মহাসঙ্গীত। সেই মহা ওংকার ধ্বনির মধ্যেই নিহিত বিশ্বচরাচরের আদি ও অন্ত। সেই মহাসঙ্গীতের মূর্ছনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ-মর্ত্য রসাতলে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুরণিত হয়েছিল সেই অপরূপ সঙ্গীতের মূর্ছনায়। ভগবান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই মহাসঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবিষ্ট হয়ে বিগলিত হয়েছিলেন ভগবান বিষ্ণু। অকস্মাৎ ব্রহ্মা লক্ষ্য করেছিলেন এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই মহাসঙ্গীতের প্রভাবে বিষ্ণুপাদপদ্ম থেকে নিঃসারিত হয়েছিল পূতঃ জলধারা। সেই পূতঃ জলধারা ব্রহ্মা সযত্নে ধারণ করে রেখেছিলেন কমণ্ডলুতে। ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নিঃসারিত পবিত্র জলধারার নাম স্বর্গগঙ্গা। এই স্বর্গগঙ্গার মহিমা কীর্তন করে শ্লোক রচনা করেছিলেন আদি কবি বাল্মিকী।

> গাঙ্গ্যং বারিং মনোহারি মুরারী চরণচ্যুতম্।
> ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্।।
> পাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
> দূর প্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।।

এই কমণ্ডলুতে স্থিত স্বর্গগঙ্গা আনয়নের জন্য মহারাজা ভগীরথ গৃহ সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন একদিন।

মহারাজা দিলীপের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ভগীরথ। একদিন তিনি কিংবদন্তী শুনেছিলেন: তাঁর প্রপিতামহগণ

মহর্ষি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন পাতালে। সেই ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য মহারাজা সগর, অংশুমান সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন গঙ্গা আনয়নের জন্য। কিন্তু তাঁরা আর ফিরে আসেননি। মহারাজা ভগীরথ তাঁর প্রপিতামহদের ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করে যাত্রা করেছিলেন দুর্গম হিমালয়ে তপস্যা করবার জন্য। অযোধ্যা থেকে হিমালয়, দীর্ঘ পথ। নদ নদী শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করতে হয়েছিল তাঁকে হিমালয়ে পেঁছিবার জন্য। কঠিন সেই পার্বত্য পথ. দুর্গম প্রস্তরাকীর্ণ। সমস্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল মহারাজা ভগীরথকে। তাঁর পদযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ বা পথ চলার কৃচ্ছ্রসাধনার পূর্ণ বিবরণ রামায়ণ মহাভারতে কোথায়ও নেই। তবে আভাস রয়েছে দুর্গম হিমালয়ের কথা। চারদিকে বিশাল পর্বতমালা, নদী, ঝরনা, ফলফুল শোভিত অপরূপ হিমালয়। কোথায়ও বা মনোরম সরোবর, কোথাও পর্বতগুহা, তুষারমণ্ডিত পর্বত শিখর। মহারাজা ভগীরথ উচ্চ হিমালয়ে পেঁছেই শুধুমাত্র ফলাহারে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে-ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধনায় দেহ তাঁর অস্থিচর্মসার হয়েছিল। অবশেষে দেহে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। ঠিক সেই সময় মূর্তিমতী গঙ্গা আবির্ভূতা হয়েছিলেন তাঁর সম্মুখে। স্তবে তুষ্ট হয়ে বরদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মহারাজা ভগীরথ দেবীর কাছে সমস্ত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মহর্ষি কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই অকালমৃত্যু, ব্রহ্মশাপে জর্জরিত দেহ স্বর্গলোকে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না। তাঁদের পাপযুক্ত দেহ পবিত্র গঙ্গার জলে প্লাবিত হলে সর্বপাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে। ভগীরথ কাতরকণ্ঠে অনুনয় করেছিলেন দেবীর কাছে। সমস্ত কাহিনী জানতে পেরে দেবী অবশ্য বিব্রত হয়েছিলেন। স্বর্গলোক থেকে স্বর্গগঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গগঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ, তাঁর দুর্বার গতিবেগ ধারণ করবার ক্ষমতা একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কারো নেই। মহারাজা ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যায় তুষ্ট করেছিলেন মহাদেবকে। তারপর, এক মহাসন্ধিক্ষণে দেবী সুরেশ্বরী-গঙ্গা গগন মার্গ থেকে ভীষণ বেগে অবতরণ করেছিলেন বিশাল জলধারা নিয়ে। মহাদেব তাঁর বিশাল জটাজাল বিস্তার করে অবরুদ্ধ করেছিলেন গঙ্গার সমস্ত জলধারা। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের সময় গঙ্গার মনে হয়তো বা অহংকার হয়েছিল। ভেবেছিলেন, তিনি তাঁর জল-প্রবাহ দিয়ে ভাসিয়ে দেবেন মহাদেবের জটাজাল। গঙ্গার অহংকার অন্তরে

অনুভব করে মহাদেব তাঁর জটাজাল দিয়ে অবরুদ্ধ করেছিলেন গঙ্গার জলধারা। তাই দুর্বার প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে অবতরণের পথ হারিয়ে ফেলেছিল ঘন জটাজালের মধ্যে। ভগীরথকে আবার তপস্যা করতে হয়েছিল মহাদেবকে তুষ্ট করবার জন্য। অবশেষে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর জটাজাল বিদীর্ণ করে গঙ্গার নির্গমন-পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল জটাজাল থেকে মুক্ত স্বর্গগঙ্গা আশ্রয় নিয়েছিল বিন্দুসরোবর নামে এক সরোবরে। সেই সরোবর থেকেই স্বর্গগঙ্গা সপ্তধা হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তিন দিকে। এই ধারাগুলির মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী এই নামে তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল পশ্চিম দিকে। অপর তিনটি ধারা চক্ষু, সীতা ও সিন্ধু প্রবাহিত হয়েছিল পূর্বাভিমুখে। সর্বশেষ ধারা মহারাজা ভগীরথ পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণ দিকে। এই সুরলোকবাসিনী গঙ্গার তিন দিকে প্রবাহিত ধারার জন্য অপর নাম ত্রিপথগা[৫]। গঙ্গার জলধারা প্রবাহিত হয়েছিল মর্ত্যলোকে সমভূমিতে। এই পবিত্র জলধারার গতি কোথাও বা কুটিল, কোথাও বা সহজ ও সরল। কোন কোন স্থানে জলধারা সংকুচিত, কোথায়ও বা জলভারে স্ফীতা। গংগার বিশাল জলধারা ধীর বেগে প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। কোন কোন স্থানে উচ্ছল কলকল ধ্বনিতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিল পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করে কবি কৃত্তিবাস লিখেছিলেন ঃ

সেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইস্থানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি
সেই কথা যে স্থানে গঙ্গারে রাজা বলে
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে।।
আছিলেন সগর বংশ ভস্মরাশি হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলে সবে গঙ্গা জল পাইয়া।।

সগর বংশ মুক্ত করে দেবী সুরেশ্বরী লবণ সমুদ্রে পতিত হয়েছিলেন।

গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগো মিলন।।

যে স্থানে গঙ্গার পূত জল স্পর্শে অভিশপ্ত সগর-সন্তানগণ শাপমুক্ত হয়েছিলেন যেখানে, সেই স্মৃতি বিজড়িত স্থানটির নাম ঃ

"মহাতীর্থ হইল সে সাগর সঙ্গম।"

হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার এই দীর্ঘ গতিপথ, নদীর আদি

৫. রামায়ণ, বালখণ্ড ৪৩ সর্গ ও ৪৪ সর্গ

মধ্য ও অন্তিম গতি। সেই দীর্ঘ গতিপথের প্রদর্শক মহারাজা ভগীরথ।

রথে চড়ে যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু আগাইয়া ॥

অনেক সময় অতিবাহিত হয় নীল আকাশের নীচে। গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় দেখি রৌপ্যখচিত সিংহাসন। তার ওপরে সোনালী রঙে রঞ্জিত গঙ্গামূর্তি। ডান পাশে কৃষ্ণবর্ণের যমুনামূর্তি। বামে শ্বেতাঙ্গিনী সরস্বতী। যমুনার কাছেই যুক্তকরে উপবিষ্ট শান্ত সমাহিত মহারাজা ভগীরথ। রাজার অবশ্য রাজবেশ নেই।[৬] আরও ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শন করি। দেখি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি, দেবাদিদেব মহাদেব আর শংকর সেবিত শংকরাচার্যকে।

৬. বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে সমুদ্রে ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে র.য়ছে ছোট্ট গুহা। সেই গুহার নাম এলিফ্যাণ্টা কেভ। এই গুহার অভ্যন্তরে পাথরে খোদিত আছে নয়টি শিবের মূর্তি। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নৃত্যরত শিব। মূর্তি-গুলির পরিচয়—(১) নটরাজ শিব (২) অন্ধক অসুর নিধনে শিব (৩) শিব পার্বতী বিবাহ (৪) শিবের গঙ্গাবতরণ (৫) মহেশ মূর্তি (৬) অর্ধ-নারীশ্বর শিব (৭) কৈলাস পর্বতে শিব পার্বতী (৮) কৈলাস উত্তোলনকারী শিব (৯) যোগী শিব। এই মূর্তিগুলি আনুমানিক ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর। ঐতিহাসিকদের মতে—এই দ্বীপের প্রাচীন নাম ছিল খড়পুরী বা শ্রীপুরী। এই পুরী মৌর্য-যুগের বলে মনে করা হয়। দ্বীপের তোরণদ্বারে পাথরে খোদাই করা হাতীর মূর্তি ছিল। ১৫৩৪ সনে পর্তুগীজগণ এই দ্বীপ দখল করে দুর্গস্থাপন করেছিল। ১৭৭৪ সনে বৃটিশ সরকার এই দ্বীপ দখল করে নেয়। দীর্ঘ ২৪০ বৎসর পর্তুগীজগণ এই গুহার রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। তোরণদ্বারে হাতীর মূর্তি থাকায় গুহাটিকে এলিফ্যাণ্টা কেভ বলা হত। গুহার প্রবেশমুখেই দেখা যায় ত্রিমূর্তি শিব (মহেশ শিব)। তার ডান পাশেই গঙ্গাধর শিব। শিবের জটাজাল থেকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি দেবীমূর্তিরূপে জলধারা অবতরণ করেছে। শিবের পদ-তলেই মহারাজা ভগীরথ।

গঙ্গোত্রীর মন্দিরে তিনটি নদীরূপিণী দেবীমূর্তি, ভগীরথ ও মহা-দেবের মূর্তির পরিকল্পনার সঙ্গে এলিফ্যাণ্টা কেভ গঙ্গাধর শিবের মূর্তি পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

গাঢ় অন্ধকার, অশান্ত জলধারার অবিশ্রান্ত কলধ্বনি আর চীর, পাইন গাছের ঘন ছায়া ভেদ করে আসা হিমশীতল বাতাস। সেই হিমশীতল বাতাসের একটানা সঙ্গীতের মূর্ছনায় মুখরিত গঙ্গোত্রী। রাত্রি গভীর হয়, ধীরে ধীরে পা ফেলে ভাগীরথীর ওপরকার কাঠের সেতু পেরিয়ে ওপাশে কেদার গঙ্গার ওপারে চলে যাই ডাক-বাঙলোয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে দেখি। এক সময় ভাগীরথীর গুঞ্জন স্তব্ধ হয় যেন।

মহারাজা ভগীরথ গঙ্গার পবিত্র ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যে তাঁর পূর্বপুরুষদের ব্রহ্মশাপজনিত পাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য। রামায়ণের এসব কাহিনী মহাভারতেও লিপিবদ্ধ আছে। মহাভারতের পরেই বিভিন্ন পুরাণে লেখা আছে গঙ্গা আনয়নের কাহিনী। ভগীরথ কোথায় গিয়েছিলেন তপস্যা করবার জন্য, এ তথ্য খুঁজে বার করা অসম্ভব। স্বর্গগঙ্গার ধারা মর্ত্যে এসেছিল। মর্ত্যে এসে সমতল ভূমিকে প্লাবিত করেছিল। জলধারার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে এসেছিল পলিমাটি। সেই পলিমাটি পরতে পরতে বিছিয়ে দিয়েছিল ভারতবর্ষের বুকে। ঊষর ভূমি তাই প্রাণ পেয়েছিল। ধনধান্যে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল। জনপদ গড়ে উঠেছিল গঙ্গার উভয় কুলে। নগর সৃষ্টি হয়েছিল কালক্রমে। গঙ্গার তীরভূমিতে স্থাপিত হয়েছিল তীর্থস্থানগুলো। সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুদূর অতীত যুগ থেকেই। গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

যাবৎতিষ্ঠীতি গঙ্গাত্র তাবত্তীর্থানি সন্তি চ।

যে স্থান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত, সেই স্থানই তীর্থ। সেই সব তীর্থের ইতিবৃত্ত রয়েছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদীর নাম তাই গঙ্গা। পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদনদীগুলির সৃষ্টিরহস্য নিয়ে নানা ইতিবৃত্ত রচনা হয়েছে। গঙ্গার সৃষ্টিরহস্য সুদূর অতীতকাল থেকেই জন-মানসের হৃদয়ে গাঁথা। অতীতকালের আর্যগণ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করে ঘর বেঁধেছিল সিন্ধুনদের অববাহিকায়। জলধারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে প্রলুব্ধ করেছিল গৃহ রচনার জন্য। ভূমির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল। পরে সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়। সেখানকার সবুজ স্নিগ্ধ সমতলভূমি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। গঙ্গা দিয়েছিল সুপেয় জল, জমির অফুরন্ত উর্বরা শক্তি। জননীর স্নেহ, মায়া মমতায় লালন করেছিল তাঁদের।

সভ্যতার আলোকে তারা জীবনযাত্রার নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিল।

গঙ্গার প্রাচীন তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-গুলোয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে দেখতে পাওয়া যায় গঙ্গার উল্লেখ। ঋগ্বেদের নদী স্তুতি (দশম মণ্ডল, ৭৫ নং সূক্ত) উনিশটি নদীর স্তুতি করেছেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সিন্ধুক্ষিৎ। এই উনিশটি নদীর মধ্যে সিন্ধুনদকে তেজসম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জলধারা অন্য সমস্ত নদীর তুলনায় বেশ বেগশালী, স্থূল ও চির-যৌবনযুক্ত। নদী-স্তুতির উনিশটির মধ্যে এগারোটির অস্তিত্ব আজও বর্তমান। তার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ রয়েছে সিন্ধুর পরই। নদী স্তুতিতে বলা হয়েছে ঃ

ইমংমে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পুরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ।।৫
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাবতে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিয়ীয়মে ।।৬

হে গঙ্গা! হে যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু ও পরুষ্ণি! তোমরা সবাই আমার এই স্তব গ্রহণ কর। হে অসিক্নী, মরুদ্বৃধা! হে বিতস্তা, সুষোমা, অর্জিকীয়া, তোমরা শোন। হে সিন্ধু! তুমি প্রথম তৃষ্টমার সঙ্গে মিলিত হও। পরে, সুসর্ত্বা, রসা ও শ্বেতীর সঙ্গে যুক্ত হবে। তুমি ক্রুমু, গোমতী, কুভা ও মেহৎন্বার সঙ্গে মিলিত হয়ে সব নদীর সঙ্গে একই রথে একত্রিত হয়েছ।

ঋগ্বেদের উনিশটি নদীর মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা ব্যতীত অপরগুলি সম্ভবতঃ সিন্ধুর উপনদী বলে মনে করা হয়েছে। এইগুলি সিন্ধু নদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুক্ত। ঋগ্বেদের সমস্ত মণ্ডল ও সূক্তে সরস্বতী নদীকে আটটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সিন্ধুর উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচটি স্থানে। সিন্ধুর পরই সরযু নদীর স্থান। ঋগ্বেদের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার স্থান চতুর্থ। গঙ্গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ষষ্ঠ মণ্ডলে ৪৫ নং সূক্তে ও দশম মণ্ডলে ৭৫ নং সূক্তে। তৃতীয় মণ্ডলে ৫৭ নং সূক্তে জাহ্নবীর উল্লেখ করা হয়েছে। জাহ্নবী নদীর নামকরণ, জহ্নুমুনির কাহিনী হয়তো বা বেদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদের বয়স নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। কারণ, এই কাল নির্ণয় নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মহামতি কান্ মনে করেন, ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। ভারতীয় মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর বিখ্যাত বই "ওরিয়ন"-এ ঋগ্বেদের সময়কাল ৪০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ বলে উল্লেখ করেছিলেন। ম্যাক্স-মুলার প্রমুখ অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেছিলেন—ঋগ্বেদের

সংকলন কাল ২০০০-৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে রামায়ণে। সগর রাজা মহারাজা ভগীরথের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ। বংশপরম্পরা থেকে সগর রাজার রাজত্বকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর। মহারাজা ভগীরথ রামচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ। শতপথ ব্রাহ্মণে রামচন্দ্র, দশরথ, দশরথের একজন শ্বশুর অশ্বপতির উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় পণ্ডিত ও গবেষকদের মতে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব ২০৫০ বৎসর বলে মনে করা হয়। এই তথ্যের ওপরে নির্ভর করলে ভগীরথের সময়কাল অনুমান করা যেতে পারে।

সম্ভবত আর্যগণ পশ্চিম ভারতে এসে প্রথমে বসবাস করতে শুরু করেছিল। তাদের প্রকৃত প্রথম বাসভূমি সম্পর্কে এমন কোন তথ্য ঋগ্বেদ সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সিন্ধু উপত্যকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বে। ঋগ্বেদ অনুসারে সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযু উপত্যকায় বসবাস করতো আর্যগণ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৬৪ নম্বর সুক্তে এই তিন নদী—বেগবতী, মহাতরঙ্গ শালিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সরস্বতী নদী ও সরযু নদীর অস্তিত্ব বর্তমান কালে লুপ্ত। তবে বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর জলধারা বিপুল ছিল। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৬১ নম্বর সুক্তে এই নদী সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই নদীর বিশালতা ও উচ্ছলতাকে লক্ষ্য করে এই সুক্তটি সরস্বতী নদীর প্রতি নিবেদন করেছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ভরদ্বাজ।

> প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
> রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতো পস্তুত্যা চিকিতুষ সরস্বতী ॥ ১৩
> সরস্বত্যভিনো নেষি বস্যো মাপ স্ফরী পয়সামান আ ধক্।
> জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎ ক্ষেত্রান্যঃ বনানি গন্ম ॥ ১৪

যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্তিদ্বারা এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ, যিনি নদীসমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী, যদি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী, সেই সরস্বতী, জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হন। হে সরস্বতি! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধন নিয়ে চল। তুমি আমাদের হীন করো না। অধিক জলভারে আমাদের উৎপীড়িত করো না। তুমি আমাদের বন্ধু ও গৃহ স্বীকার করো। আমরা যেন তোমার নিকট হতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি। অর্থাৎ সরস্বতী নদীতীরে বসবাসকারী আর্যগণ নিশ্চিত হয়ে বসবাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বর্তমানকালে নানা বিতর্কের কারণ হয়ে রয়েছে। বৈদিক যুগের এই নদী বিশাল ছিল। এই নদীর উপত্যকায় সে যুগের আর্যসভ্যতার

নিদর্শন খুঁজে বার করা সহজসাধ্য নয়। তবে যে কারণেই হোক, সেই নদীর ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কালের গর্ভে সভ্যতার চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু ও সরস্বতী উপত্যকা অতিক্রম করে আর্যগণ কবে কোন কালে পূর্ব ও উত্তরে অগ্রসর হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়। সিন্ধু ও সরস্বতীর শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল আর্যগণ। রামায়ণ মহাভারতে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করা হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে লেখা আছে—গঙ্গা সদৃশ তীর্থ নাই। যে স্থানে গঙ্গা আছেন, সেই স্থানই যথার্থ দেশ। সিন্ধু ও সরস্বতী নদী সম্পর্কে এমন কথা কোথায়ও লেখা নেই। অষ্টাদশ পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলির মধ্যে—বায়ু, মৎস্য, বরাহ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, পদ্মা, ভাগবত, বিষ্ণু ও ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণে গঙ্গা অবতার, গঙ্গা মহিমা, স্তবস্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন্ কাল থেকে আর্যগণ গঙ্গা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছিল, সে কালের হিসেব সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তবে মহাভারতের যুগে গড়ে ওঠা নগর—হস্তিনাপুর। তীর্থক্ষেত্র—গঙ্গা-দ্বার, কনখল, প্রয়াগ, কাশী সমৃদ্ধ হয়েছিল।[৭] কারো কারো মতে হস্তিনা-পুর গড়ে উঠেছিল ২০০০ বৎসর খৃষ্ট পূর্বাব্দে। যতদূর জানা যায়, দিল্লী থেকে প্রায় ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্বে গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে কোন এক নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় (ভূমিকম্প ?) হস্তিনাপুর ভগীরথীর নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক যুগের সমৃদ্ধ নগর পাটলিপুত্র গড়ে উঠেছিল গঙ্গার তীরে। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস খৃষ্টপূর্ব ৩০০ বৎসর পূর্বে গঙ্গার উপকূলে পাটলিপুত্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করে-ছিলেন। তখনকার দিনে পাটলিপুত্র ছিল সুদৃশ্য স্থাপত্য শিল্পে উন্নত সমৃদ্ধশালী শহর। মেগাস্থিনিস গঙ্গানদীর উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বিবরণে।

ভারতবর্ষে তখন বহুসংখ্যক বৃহৎ নৌ চলাচল উপযোগী নদী ছিল।

---

৭. গঙ্গার তটভূমিতে গড়ে ওঠা জনপদ—

জনপদের নাম	গঙ্গার যে তীরে অবস্থিত	ভৌগোলিক অবস্থান
কাশী	উত্তর তীরে	বারাণসী জেলা
কুন্তলা	দক্ষিণ তীরে	চুনার জেলা
মগধ	দক্ষিণ তীরে	পাটলিপুত্র জেলা
অঙ্গ	দক্ষিণ তীরে	ভাগলপুর জেলা

সেই সব নদীগুলির উৎপত্তিস্থল উত্তর সীমান্তের পর্বতমালা। সেই উচ্চ পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত নদীগুলি সমতলে পতিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল। সেই গঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করেছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব অংশ সমৃদ্ধ। তাই ঐ অংশে নগর স্থাপিত হয়েছিল। বিদেশী শত্রু গঙ্গা পেরিয়ে নগর জয় করবার চেষ্টা বা সাহস পেতো না। কারণ, গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল সুসভ্য যোদ্ধা। তাদের সৈন্যদল বহুসংখ্যক অতিকায় হস্তীর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতো। সেই অতীত যুগে চার হাজার হস্তী চালিত যোদ্ধাদের লক্ষ্য করেই শত্রু পক্ষ পলায়ন করতো। মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গা ও অপর একটি নদীর সঙ্গম স্থলের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গম স্থলেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নগর পাটলিপুত্র। গঙ্গা ভারতবর্ষের নদীগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান।

রোমান দার্শনিক প্লিনি (৭০ খৃষ্টাব্দ) গঙ্গা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। মিশরীয় দার্শনিক টলেমি (১৫০ খৃষ্টাব্দ) গঙ্গার উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত পৃথিবীর মানচিত্রে। গঙ্গার পরিচিতি সম্পর্কে প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের বিবরণে উল্লিখিত রাজাদের কাহিনীতে ভারতবর্ষ যখন সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা, তখনকার যুগের সুদূর অতীতে ডায়োনীসস্ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল। তখন ভারতে তেমন উল্লেখযোগ্য নগর বা রাজধানী না থাকায় প্রায় সামান্য প্রতিরোধেই অগ্রসর হয়েছিল বিশাল সৈন্যদল। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সৈন্যদল অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারাতে শুরু করেছিল। ক্রমে মহামারীতে পরিণত হয়েছিল। ভীত সেনানায়কগণ যথাসম্ভব সৈন্যদল নিয়ে উচ্চ পর্বত শিখরে পলায়ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানকার শীতল পবিত্র বাতাস ও জলবায়ুতে সুস্থ হয়েছিল সবাই। ডায়োনীসস্ সেই পর্বত শিখরের নাম উল্লেখ করেছিল মীরস্

গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা নগর—

নগরের নাম	রাজধানী	গঙ্গার যে তীরে অবস্থিত
হস্তিনাপুর	কুরু রাজ	ডান তীরে
কাম্পিল্য	দক্ষিণ পাঞ্চাল রাজ	ডান তীরে
কাশী	কাশীরাজ	বাম তীরে
পাটলিপুত্র	মগধ রাজ	বাম তীরে
চম্পা	অঙ্গরাজ	বাম তীরে
বৈশালী	লিচ্ছবি রাজ	বাম তীরে

বলে। মীরস্ সম্ভবত ভারতবর্ষের নাম মেরু পর্বত। মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন—মেরু পর্বত অঞ্চলের বসবাসকারী ডায়োনীসসের বংশ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে স্থির করেছিল। ভারতের এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ডায়োনীসসের বংশ থেকেই উদ্ভূত। এই বংশ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল হীরাক্লিস বা হারকুলিস। মেগাস্থিনিসের মতে হারকুলিস ভারতবর্ষীয়। তাঁর হাতে গদা, দেহে বর্ম। তাঁর দৈহিকবল অসাধারণ। শক্তিবলে তিনি সমস্ত মানব জাতির উন্নতি সাধন করেছিল। হারকুলিস পাটলিপুত্র নগরীর পত্তন করেছিলেন গঙ্গার তীরে। পাটলিপুত্রকে মেগাস্থিনিস পোলিবোথ্রা বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী ডায়োনীসস্ থেকে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত সময়কালের ব্যবধান ৬০৪২ বৎসর। ডায়োনীসস্ হারকুলিসের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে বর্তমান ছিল। তখনকার গাঙ্গেয় সভ্যতার অনেক তথ্যই হয়তো বা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল।

ঋগ্বেদে মোট একুশটি নদনদীর উল্লেখ রয়েছে। এই সব নদ-নদীগুলির অধিকাংশ হিমবত বা হিমালয় পর্বত থেকে উদ্ভূত। কালের পরিবর্তনে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলোর নদীর নামের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানে নামের আরো পরিবর্তন হয়েছে।

নদনদীর নাম

ঋগ্বেদ	মার্কণ্ডেয়পুরাণ	বায়ুপুরাণ	মৎস্যপুরাণ	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	বর্তমান নাম
গঙ্গা	গঙ্গা	গঙ্গা	গঙ্গা	গঙ্গা	গঙ্গা
সরস্বতী	সরস্বতী	সরস্বতী	সরস্বতী	সরস্বতী	সরস্বতী
সিন্ধু	সিন্ধু	সিন্ধু	সিন্ধু	সিন্ধু	সিন্ধু
শতুদ্রু	শতুদ্রু	শতুদ্রু	শতুদ্রু	শতুদ্রু	শাটলেজ
অর্জিকিয়া	বিপাশা	বিপাশা	বিপাশা	বিপাশা	বিয়াস্
পরুষ্ণী	ইরাবতী	ইরাবতী	ইরাবতী	ইরাবতী	রাভী
অসিকিনী	চন্দ্রভাগা	চন্দ্রভাগা	চন্দ্রভাগা	চন্দ্রভাগা	চেনাব
বিতস্তা	বিতস্তা	বিতস্তা	বিতস্তা	বিতস্তা	ঝিলাম
যমুনা	যমুনা	যমুনা	যমুনা	যমুনা	যমুনা
সরযূ	সরযূ	সরযূ	সরযূ	সরযূ	গোগরা
কুভা	কুহূ	কুহূ	কুহূ	কুহূ	কাবুল
গোমতী	গোমতী	গোমতী	গোমতী	গোমতী	গোমতী
শ্রদ্ধাবতী	শ্রদ্ধাবতী	শ্রদ্ধাবতী	শ্রদ্ধাবতী	শ্রদ্ধাবতী	চিত্রা
মরুদ্‌বৃধ	—	—	—	—	সিন্ধু নদীর শাখা

ঋগ্বেদ	মার্কণ্ডেয়পুরাণ	বায়ুপুরাণ	মৎস্যপুরাণ	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	বর্তমান নাম
সুষোমা	—	—	—	—	সিন্ধু নদীর শাখা
ত্রিষ্টমা	—	—	—	—	
শ্বেতী	—	—	—	—	
ক্রমু	—	—	—	—	কুরুম
রস	—	—	—	—	
মেহেৎনু	—	—	—	—	
সুসর্ত্তা	—	—	—	—	
—	ধূতপাপা	ধূতপাপা	ধূতপাপা	ধূতপাপা	শারদা
—	বাহুদা	বাহুদা	বাহুদা	বাহুদা	রাপ্তী
—	দিবীকা	দেবীকা	দেবীকা	দেবীকা	ভিগু
—	বংক্ষু	বংক্ষু	বংক্ষু	বংক্ষু	রামগংগা
—	গণ্ডকী	গণ্ডকী	গণ্ডকী	গণ্ডকী	গণ্ডক
—	কৌশিকী	কৌশিকী	কৌশিকী	কৌশিকী	কুশী
—	—	লোহিত্য	লোহিত্য	লোহিত্য	ব্রহ্মপুত্র

॥ ৪ ॥

ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঙ্গ চন্দ্রাযুত সমপ্রভাম্ ।
চামরে বীর্জামানস্ত শ্বেত চ্ছত্রোপশোভিতাম্ ॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রং নিজাতাম্ ।
সুধা প্লাবিত ভূপৃষ্টামাত্রং গন্ধানুলেপনাম্ ॥
ত্রৈলোক্য নমিতাং গঙ্গাং বেদাদিভি বভিষ্টুতাম্ ।

পদ্মা পুরাণ (ক্রিযাযোগ সার, ৬/১১৬-১২১)

গঙ্গার কথা আমার মনে নতুন করে জেগে ওঠে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গঙ্গোত্রীতে পৌঁছে গিয়েই। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনি সকাল সন্ধ্যায়। ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হবার কিছু সময় পরেই শুনি স্তোত্র পাঠ। সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করেন কমলেশজী যখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিক থেকে ছুটে আসে পাহাড়ের পাঁচিল টপকে, পাইন আর চীর গাছের আড়াল থেকে। মন্দিরের ভেতরে যেন আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় কমলেশজীর সুরেলা

কণ্ঠ ভেসে আসে। আকাশের বুকে তখন তারাদের মিছিল, নীচে ভাগীরথীর অপরূপ কলকণ্ঠ। সবকিছু ছাপিয়ে আসে স্তোত্র পাঠ। তন্ময় হয়ে শুনি। শুনতে শুনতে দীপালোকে দেখা গঙ্গার মূর্তি যেন ভেসে আসে আমার চোখের সামনে। পদ্ম পুরাণে গঙ্গার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। গঙ্গা সুরূপা, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। তাঁর দেহবর্ণ শঙ্খের মতো বা কুন্দ কুসুমের মতো শ্বেতশুভ্র। শুভ্রবসনা দেবীর কণ্ঠে শুভ্র মুক্তার মালা। নানা অলংকার ও আভরণে দেবী ভূষিতা। তিনি দ্বিভুজা—এক হস্তে সুধা কলস ও জ্ঞানের প্রতীক অক্ষসূত্র, অপর হস্তে শ্বেত পদ্ম। সুদন্ডী, সুবদনী, সুপ্রসন্না ও করুণাময়ী। মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, চন্দ্রপ্রভার মতো জ্যোতির্ময়ী। দেবীর বাহন—মকর।

প্রাণতোশিনী তন্ত্রে গঙ্গার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ—

সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং ব্রহ্মাদি পরিশোভিতাম্ ।। ৩/২

কমলেশজী এই সব স্তোত্র শোনাতেন। ছোটখাটো মানুষ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। হাসি হাসি মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো কথা বলতেই। হাত দুটো সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে যুক্ত করে শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে বিগলিত হতেন। গঙ্গোত্রী মন্দির কমিটির সচিব ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর। জন্মের পর থেকেই গঙ্গা দর্শন, গঙ্গা তীরে বাস। শীতের বরফ এসে যখন নদীর কলোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হতে চলেছে, গ্রীষ্মের দাবদাহ সে বরফ গালিয়ে নদীকে আরো উচ্ছল করেছে, তখনো গঙ্গার তীর ছেড়ে চলে যেতেন না। শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়েছেন কমলেশজী নদীর গান শুনে শুনে। সেই চির-চেনা কলধ্বনির ভাষা তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পেঁছে।

আজ থেকে বারো তের বৎসর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে। সেবার বেশ কয়েকদিন গঙ্গোত্রীতে অবস্থান করবার সুযোগ ঘটেছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। মন্দিরের কাছেই ধর্মশালা। সেখানে ছোট একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কাঁসর ঘন্টার শব্দ কানে আসতেই বিছানা ছেড়ে যেন ছুটে গিয়ে হাজির হতাম মন্দিরের সামনে। সকালবেলায় আরতি সমাপ্তির পরই কমলেশজী স্তোত্র পাঠ করতেন গদগদ কণ্ঠে। আবছা অন্ধকারে বহুদূরে কুয়াশায় ঢাকা ভাগীরথীর পুণ্য ধারা স্পষ্ট দেখা যেতো না। ধীর পদক্ষেপে হাজির হতাম ভাগীরথীর তটভূমিতে। নদীর ওপারে সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া। কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে আসতেন তাঁরা ব্রাহ্মমুহূর্তে। তুষার-গলা ভাগীরথীর জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন বেশ কিছু সময় ধরে। প্রতিদিনই প্রত্যুষে দেখতাম একই দৃশ্য। গঙ্গাস্নান তাঁদের নিত্যকর্ম। ধীরে ধীরে সূর্য

উঠতো। কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে সূর্যের লোহিত আভা ছড়িয়ে পড়তো সমস্ত উপত্যকায়। ঝিরঝিরে বাতাস, নদীর কলধ্বনির মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়তো বারবার। ছোটবেলায় সেই প্রথম গঙ্গাস্নানের স্মৃতি আমার মনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। হাল্কা কুয়াশার ওপরে সূর্যের লোহিত আলোর আভাস ভাগীরথীর বুকের ওপরে। সেদিন সেই সোনার জলের মধ্যে স্নান করেছিলাম আমি মায়ের হাত ধরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেছিলাম সেদিন। বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ। গঙ্গামায়ী কি জয়···। বিশাল জয়ধ্বনির শব্দ ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। মা সেদিন গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করেছিলেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। অসংখ্য নরনারী যেন কলকণ্ঠে গঙ্গার বন্দনা করেছিলেন সেদিন। মা বলেছিলেন—এই পবিত্র গঙ্গা, মহাদেবের জটা থেকে নেমে এসেছিল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম গঙ্গার দিকে—মহাদেবের জটা।

মা বলেছিলেন—হ্যাঁ, মহাদেবের বিশাল জটাজাল। কৈলাস পর্বতে জটাজুটধারী মহাদেব অধিষ্ঠিত। পাশেই মানস-সরোবর। গঙ্গার সেই পবিত্র ধারা মানস-সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। মহারাজা ভগীরথ হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে গঙ্গার পবিত্র ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যে। গঙ্গার তাই আর এক নাম ভাগীরথী।

আমি সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—আমিও যাবো হিমালয়ে।

—হিমালয়ে! মা আমার দিকে তাকিয়ে হয়তো হাসতেন সে কথা শুনলে। অবিশ্বাসের হাসি হেসে হয়তো বলতেন—পাগল আর কি! তুই সেখানে যাবি কি করে?

আমি অবুঝের মতো বলতে চাইতাম—বড় হয়েই যাবো সেখানে। মহারাজা ভগীরথ যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথ খুঁজে বার করে যাবো।

মা হাসতেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি কিন্তু মনে মনে কল্পনা করেছিলাম। মাত্র কয়েক বছর পরই মা সামান্য রোগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। মায়ের সেই রোগক্লিষ্ট দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশানঘাটে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে মা আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তো গাল বেয়ে। কলকাতা থেকে নিয়ে আসা গঙ্গার জল দেওয়া হয়েছিল ফোঁটা ফোঁটা করে তাঁর মুখে। আমাদের বাড়ির পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ। জলধারার পাশেই মহাশ্মশান। সেই শ্মশানে মায়ের দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল। সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জল আর গঙ্গার জল মিলিয়ে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে। মা প্রায়ই আমাকে

বলতেন—গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র একস্থান থেকেই নির্গত হয়েছে।

গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর হিমশীতল জলে আমি স্নান করেছি অনেক-বার। স্নান করতে করতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতাম। আমার মনে হত, মা যেন হাত ধরে তুলে নিয়ে আসতেন জল থেকে। গঙ্গোত্রীর শীতল বাতাস এসে পড়তো আমার দেহে, চোখে, মুখে। মহারাজা ভগীরথের পদচিহ্ন খুঁজে খুঁজে দিশেহারা, এসেছি গঙ্গোত্রী। গঙ্গার পথ বেয়ে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি মহাদেবের জটার সন্ধান। ব্যর্থ হয়েছি, হতাশ হয়েছি। ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা বুঝি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

গঙ্গোত্রীতে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত করবার সময় কমলেশজী একদিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভাগীরথীর ধারা পেরিয়ে ওপার। অদূরেই ছোট একটি জলধারা এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সেই জলধারার নাম কেদার গঙ্গা। কেদার গঙ্গা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে-ছিলাম কমলেশজীর সঙ্গে। সামান্য শ'কয়েক ফুট এগোতেই অপরূপ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম থমকে। সামনেই ভাগীরথীর প্রশস্ত জলধারা নেমে এসেছে ধবধবে সাদা পাথরের বুকের ওপর দিয়ে। অবাক হয়ে দেখছি। জলধারা ঘর্ষণে এমন কঠিন পাথর ক্ষয়ে মসৃণ হয়েছে। সেই মসৃণ কঠিন পথেরের বুকের ওপর দিয়ে যেন আবহমান কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে। সেই জলপ্রবাহ অসংখ্য ধারায় ধারায় আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রায় শ চারেক ফুট নীচে। সেই বিক্ষুব্ধ জলরাশি নীচে সঞ্চিত হয়ে অপরূপ কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। সেই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড থেকে জলধারা বয়ে চলেছে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে। গৌরীকুণ্ডের ওপরে ভাগীরথীর প্রবহমান জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে কমলেশজী বলেছিলেন—একেই বলা হয় মহাদেবের জটা।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম—এই কি সেই মহাদেবের জটা ?

জী হাঁ! কমলেশজী বলতেন—বিশাল হিমালয়ের বুকের মাঝ-খানেই তো মহাদেব। এ আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমার বাবাও দেখেছেন, আমার পিতামহ, প্রপিতামহ তাঁরও পিতাজী দেখতেন মহাদেবের জটাজাল। সেকালে—গঙ্গোত্রীতে প্রচুর বরফ জমতো। সেই বরফের ভেতর দিয়ে গঙ্গার বিগলিত ধারা নেমে আসতো। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতুম। মহাদেবের জটাজাল থেকে অবতরণ করেছিলেন গঙ্গা মর্ত্যলোকে। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের কাহিনী রামায়ণ, মহাভারতে লেখা

আছে। পুরাণগুলোতেও এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

কোন কোন পুরাণ অনুসারে চারটি নদীর ধারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। এই চারটি ধারাই মূল একটি ধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। পুরাণকার এই মুখ্য ধারাটিকে স্বর্গগঙ্গা নামে অভিহিত করেছেন। স্বর্গগঙ্গার উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে—ধ্রুব নক্ষত্র-স্থিত ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে পবিত্র ধারা বিগলিত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পতিত হয়েছিল স্বর্গগঙ্গা মেরু পর্বতের শীর্ষে। সেখান থেকে জলধারা নন্দন-কাননে পরিভ্রমণ করে পর্বতগাত্রের চারটি গুহামুখ থেকে নিঃসারিত হয়েছিল। পুরাণকার এই চারটি গুহামুখের সঙ্গে চারটি প্রাণীর মুখের সাদৃশ্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেই চারটি ধারার একটি গরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট গুহা থেকে বহির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ দিকে। এই ধারার নাম গঙ্গা। অপর একটি ঘোড়ার মুখাকৃতিবিশিষ্ট গুহা থেকে নির্গত ধারা প্রবাহিত হয়েছিল পশ্চিম দিকে। এই ধারার নাম চক্ষু। পূর্বদিকে প্রবাহিত ধারা হাতীর মুখাকৃতি-বিশিষ্ট গুহা থেকে বহির্গত হয়েছিল। এই ধারার নাম সীতা। সিংহের মুখাকৃতিবিশিষ্ট গুহা থেকে বহির্গত ধারা প্রবাহিত হয়েছিল উত্তর দিকে। এই ধারার নাম ভদ্রসোম। স্বর্গগঙ্গার এই চারটি ধারা জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত হয়েছে।

বর্তমান কালের ভূগোল-বিজ্ঞানীরা পুরাণ বর্ণিত নদী ও নদী উপত্যকার পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, জম্বুদ্বীপ এশিয়া ও ইউরোপের সম্মিলিত ভূখণ্ড। এই বিশাল মহাদেশকে বলা হয় ইউরেশিয়া। ইউরেশিয়া লবণ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। পৌরাণিক ভূগোলে সপ্তদ্বীপ[১], সপ্তসাগর, সপ্তবর্ষ, সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ রয়েছে। সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপ অন্যতম। জম্বুদ্বীপ আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড আবার বর্ষ নামে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রতিটি বর্ষে বসবাস করতেন পুরাকালের ঋষিগণ। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপ অন্তর্গত একটি বর্ষ[২]। গঙ্গা জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত চারটি নদীর মধ্যে অন্যতম নদী।

১. সপ্তদ্বীপ—

জম্বুদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শকদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ।

২. জম্বুদ্বীপে উল্লিখিত বর্ষ (মানচিত্র)

বর্ষগুলির নাম।	বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান।
ইলাবর্ত বর্ষ	মেরু পর্বত অঞ্চল বা পামীর মালভূমি অঞ্চল।

এই ভারতবর্ষে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়েছে। বর্তমান কালেও হিন্দু পূজাপার্বণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ মন্ত্রপাঠ করবার সময় উল্লেখ করে থাকেন—জম্বুদ্বীপে—ভারতখণ্ডে···ইত্যাদি অর্থাৎ জম্বু-দ্বীপ অন্তর্গত ভারতবর্ষে··· ।

স্বর্গগঙ্গা চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ধারাগুলো মুখ্যতঃ মেরু-পর্বতের ভেতর দিয়ে সাতটি শাখায় পরিভ্রমণ করবার সময় ৮৪০০ যোজন* পথ অতিক্রম করেছিল। স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারা চারটি হ্রদে পতিত হয়েছিল। সেই হ্রদের সঞ্চিত জলে পুষ্ট হয়ে নদীগুলি অতিক্রম করেছিল দীর্ঘপথ। সর্বশেষে নদীগুলি পতিত হয়েছিল সমুদ্রে। স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারা যে হ্রদগুলিতে পতিত হয়েছিল পুরাণে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এই হ্রদগুলো মেরুপর্বতের চারদিকে অবস্থিত।

কেতুমালা বর্ষ	মেরু পর্বতের পশ্চিমাংশ বা পামীর মালভূমির পশ্চিমাংশ।
ভাদ্রস্ব বর্ষ	মেরুপর্বতের পূর্বাংশ বা পামীর মালভূমির পূর্বাংশ।
ভারতবর্ষ	মেরু পর্বতের দক্ষিণাংশ বা পামীর মালভূমির দক্ষিণাঞ্চল।
কিম্পুরুষ বর্ষ	মেরু পর্বতের উত্তর পূর্বাংশ বা তিব্বত অঞ্চল।
হরিবর্ষ	মেরু পর্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বা পামীর মালভূমির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল।
হিরণ্মান বর্ষ	মেরু পর্বতের দক্ষিণ পূর্বাংশ বা পামীর মালভূমির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল।
চম্পক বর্ষ	মেরু পর্বতের উত্তর পশ্চিমাংশ বা পামীর মাল-ভূমির উত্তর পশ্চিমাংশ।
উত্তরকুরু বর্ষ	মেরু পর্বতের উত্তরাঞ্চল বা পামীর মালভূমির উত্তরাঞ্চল।

৩. জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত চারটি প্রধান নদীর নাম (মানচিত্র)

নদীর নাম	বর্তমান ভৌগোলিক পরিচিতি
সীতা নদী	হোয়াং হো নদী
চক্ষু নদী	অক্সাস্ নদী
ভদ্রাসোম নদী	শিরদরিয়া নদী
গঙ্গানদী	গঙ্গানদী

* এক যোজন = ১২·৬৭ কিলোমিটার = ৮ মাইল

মেরু পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত হ্রদের নাম অরুনোদা—বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে কারাকুল হ্রদ। মেরু পর্বতের পশ্চিমদিকের হ্রদ সিতোদা—বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে ভিক্টোরিয়া হ্রদ। মেরু পর্বতের উত্তরে অবস্থিত হ্রদ মহাভদ্র—বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে শোনকুল হ্রদ। মেরু পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত হ্রদ মানস, বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে মানস-সরোবর।

রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণগুলির রচনাকাল একরূপ নয়। তবু অনেক ক্ষেত্রেই রামায়ণ মহাভারতের ভৌগোলিক পরিচয় ও অবস্থান-গুলির সঙ্গে পৌরাণিক ভূগোলের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। যা কিছু বৈসাদৃশ্য বা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেগুলো সম্ভবতঃ কাল পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। সব কিছু বিচার করে দেখা যায় ভূগোল বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নির্ভরশীল তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন। ভূগোল বিজ্ঞানীরা পৌরাণিক যুগের মেরু পর্বতকে পামীর গ্রন্থি বলে উল্লেখ করেছেন। পামীর গ্রন্থি থেকে পতিত স্বর্গগঙ্গার একটি ধারা গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছিল মানস-সরোবরে। অবশ্য স্বর্গগঙ্গার ধারাটি গরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট গুহা থেকে নির্গত হয়েছিল। এই ধারা পার্বত্য অঞ্চল বেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মিলিত হয়েছিল দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে। গঙ্গার উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রবাহ পথকে লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে তথ্যানুসন্ধানী ও ভূগোল বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মানচিত্র অংকন করেছিলেন। সেই মান-চিত্রকে তখনকার দিনের যথার্থ নির্ভরশীল বলে মনে করা হত।

মেরু পর্বত থেকে উৎসারিত স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারার নির্গমনের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বর্ণিত চিত্র পরবর্তীকালে সুদূর তিব্বতে প্রচলিত ছিল[8]। তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থ কাঙড়ি করচ্ছকে দেখতে পাওয়া কৈলাস পর্বত ও মানস-সরোবর থেকে নির্গত চারটি প্রধান নদীর উল্লেখ। এই প্রধান নদীগুলির চারটি গুহামুখ থেকে নির্গমনের চিত্রও দেখা যায় প্রাচীন গ্রন্থে। অবশ্য সেই গ্রন্থে মেরু পর্বতের কোন উল্লেখ নেই।

সুদূর অতীত যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ও পর্যবেক্ষক ঋষিগণ সম্ভবতঃ মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বর্গগঙ্গার বিস্ময়কর ধারা দর্শনে। তাঁরা স্বর্গগঙ্গার ধারাকে তুলনা করেছিলেন আকাশের বুকে জেগে ওঠা ছায়াপথের সঙ্গে। রাত্রির

৪. তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থে লেখা কৈলাস মানস-সরোবর থেকে উদ্ভূত চারটি নদীর নির্গমন পথ।

নিকষ কালো অন্ধকারে আকাশের বুকে ফুটে ওঠা নক্ষত্রপুঞ্জের অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো দেখা যেতো স্বর্গগঙ্গার প্রবাহকে। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ যেন কোন-এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আবর্তিত হয়েছে উত্তরাভিমুখে। যেন কোন এক স্থির দণ্ডকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে আকাশের সেই নক্ষত্রপুঞ্জ। পুরাণ-কারের এই বিস্ময়কর চিত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সন্ধান করতে গিয়ে বর্তমান-কালের ভূগোল বিজ্ঞানীরা মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মতে —নক্ষত্রপুঞ্জের মতো প্রতিভাত স্বর্গগঙ্গার ধারা—তুষারের অবিচ্ছিন্ন ধারা বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পামীর মালভূমি দিয়ে অবতরণ করেছিল ঢালু পর্বত গাত্র বেয়ে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী মেরু পর্বত বা পামীর-গ্রন্থি জম্বুদ্বীপের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই পামীরগ্রন্থি থেকেই প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন পর্বতমালা। সেই সব পর্বতমালাও তুষারমণ্ডিত। পামীর মালভূমিতে সঞ্চিত বরফ নিম্ন উপত্যকা থেকে পর্যবেক্ষণ করা তখনকার যুগের দুঃসাহসী ঋষিগণের পক্ষে হয়তো বা অসম্ভব ছিল না। তুষারসীমার ওপরে বরফাবৃত পামীর মালভূমি বেয়ে নেমে আসা হিম-বাহের দৃশ্যকে আকাশের বুকে দৃশ্যমান স্বর্গগঙ্গা মনে করতেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ।

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে গঙ্গা মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ হয়েছিল। মহাদেবের জটার প্রসঙ্গ প্রথম লক্ষ্য করা যায় রামায়ণে। মহাভারতে অনুরূপ মহাদেবের জটার কাহিনী দেখতে পাওয়া যাবে। পুরাণগুলি মূলত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকেই অনুসরণ করেছে।

বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, স্বর্গগঙ্গা শুধুমাত্র যে মেরু পর্বতেই অবস্থিত ছিল তা নয়। বরং এই পর্বতের গিরিশিরার সমস্ত অংশই সম্ভবতঃ স্বর্গগঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই মূল প্রবাহ মেরু পর্বতকে বেষ্টন করেছিল নিম্নে অবতরণের পূর্বে। পুরাণকারের বর্ণনা

নদীর নাম	গুহামুখ থেকে নির্গত নদীর তিব্বতীয় নাম	তিব্বতীয় নামের অনুবাদ	বুদ্ধদেবের সংগৃহীত নাম
গঙ্গা	লাঙেচন্ খাম্বাব্	হস্তীমুখ থেকে নির্গত নদী	হস্তীমুখ থেকে নির্গত নদী
সিন্ধু	মাপ্চা খাম্বাব্	ময়ূর মুখ থেকে নির্গত নদী	গরুরমুখ থেকে নির্গত নদী
চক্ষু	তামৃচক্ খাম্বাব্	অশ্বমুখ থেকে নির্গত নদী	অশ্বমুখ থেকে নির্গত নদী
সীতা	সেঙ্ খাম্বাব্	সিংহমুখ থেকে নির্গত নদী	সিংহমুখ থেকে নির্গত নদী

অনুসারে মনে হয়, স্বর্গগঙ্গা ধীর বেগে অবতরণ করেছিল বিশাল তুষারাবৃত পর্বতমালার গা বেয়ে। স্বর্গগঙ্গার এই অবতরণ বস্তুতঃ হিমবাহের নিম্ন অঞ্চলে নেমে আসার চিত্র। অবতরণের মুখে হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করেছিল। এই বরফ গলা জলের ধারা নিম্ন উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে বিশাল জলাধারের সৃষ্টি করেছিল পর্বতের পাদদেশে। এই সব বিশাল জলাধারই এক একটি বিশাল হ্রদ। পৌরাণিক তথ্য অনুসারে পামীর মালভূমির পাদদেশে চারটি হ্রদের উল্লেখ রয়েছে। সেই হ্রদ থেকেই স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারা নির্গত হয়ে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল। পামীর মালভূমিতে অবস্থিত স্বর্গগঙ্গার চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চারটি হ্রদে পতিত হওয়া, পরে হ্রদগুলি থেকে নির্গত হয়ে ধারা চারটির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরিপূর্ণ চিত্র পুরাণে প্রতিফলিত হয়েছে। মূল উৎস থেকে এই প্রবাহ লক্ষ্য করলে স্বর্গগঙ্গার বিশেষ অবস্থার কথাই দেখতে পাওয়া যায়। সেই বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের রচনায়। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী স্বর্গগঙ্গা রাত্রির আকাশে জেগে ওঠা ছায়াপথের মতো অথবা আকাশের বুকে পুঞ্জীভূত নক্ষত্র। ছায়াপথ বা নক্ষত্রপুঞ্জ—পুঞ্জীভূত তুষার। অর্থাৎ এই অংশে স্বর্গগঙ্গার তুষারময় অবস্থার কথাই বলা হয়েছে।

উচ্চ পর্বত শিখরে যখন তুষারপাত শুরু হয়, তখন সেই তুষাররাশি সঞ্চিত হতে থাকে পর্বত গাত্রে। কালক্রমে সঞ্চিত তুষার কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়ে পর্বত গাত্র বেয়ে নামতে শুরু করে ঢালু পথ ধরে। পর্বত গাত্র বেয়ে নেমে আসা বরফের ধারা অবশেষে সঞ্চিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত সমতল মালভূমিতে। এই বরফাবৃত মালভূমিই সমস্ত পর্বতমালার গ্রন্থি। স্বর্গগঙ্গা এই মালভূমিকে বেষ্টন করেছে। সুতরাং স্বর্গগঙ্গা মেরু পর্বত থেকে উৎসারিত হয়ে চারটি ধারায় অবতরণ করেছে নিম্নাভিমুখে, এ তথ্যের যুক্তিগ্রাহ্য তাৎপর্য বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীরা উড়িয়ে দিতে পারেননি। ভূগোল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বরফাবৃত স্বর্গগঙ্গা পামীরগ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়েছিল। সেখানকার বরফ ঢালু পর্বতগাত্র পথে অবতরণের সময় গলে চারটি জলধারায় প্রবাহিত হয়েছিল এশিয়া ও ইউরোপের ভূখণ্ডে। অষ্টাদশ পুরাণের অনেকগুলোতেই তুষারাচ্ছন্ন গঙ্গার গলে যাওয়া অংশ, গঙ্গার চারটি ধারা, হিমবাহ, নদী সবই উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার আর এক নাম হৈমবতী। সম্ভবতঃ হিমালয়ের হিমবাহ গলে এই নদীর সৃষ্টি হয়েছিল বলেই।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত মেরু পর্বতের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মেরু পর্বতের সন্নিকটেই অবস্থিত গন্ধমাদন ও

মাল্যবান পর্বত। গন্ধমাদন পর্বত মেরু পর্বতের পশ্চিমে, মাল্যবান পর্বত পূর্বে অবস্থিত। এই পর্বতমালার বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে। মেরু পর্বতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শৃঙ্গবান পর্বত, শ্বেত পর্বত, নীল পর্বত, নিষাধ পর্বত, হেমকূট পর্বত ও হিমবান পর্বত। ভৌগোলিক পরিবেশ বিচার করলে দেখা যায়, পৌরাণিক যুগের এইসব অধিকাংশ পর্বতমালার সংগৃহীত তুষার এসে সঞ্চিত হয়েছে মেরু পর্বতে। পুরাণকার পামীর মালভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়া দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত প্রাচীন যুগের পর্বতমালার পরিচয় হয়তো বা ভালভাবেই জানতেন।

বর্তমান যুগের মানচিত্রে পামীর গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত পর্বতমালার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়।

কারাকোরাম পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।
ধবলগিরি পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।
তিব্বতের মালভূমি অঞ্চল।
কুয়েনলুন ও হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।
হিন্দুকুশ, তিয়েনসান্ ও ট্রান্স্ আলতাই পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।

পর্বতমালার পৌরাণিক যুগের নাম	ভূগোল বিজ্ঞানীদের দ্বারা চিহ্নিত প্রাচীন পর্বতমালার বর্তমান পরিচয়
শৃঙ্গবন পর্বতমালা	কারা তাউ-কিরঘিজ কিটাম পর্বতমালা
শ্বেত পর্বতমালা	নারা তাউ-তুর্কিস্তান এটরাশী পর্বতমালা
নীল পর্বতমালা	জায়াফ্স্তাণ্ ট্রান্স্-আলতাই তিয়েনসান্ পর্বতমালা
নিষাধ পর্বতমালা	হিন্দুকুশ-কুয়েনলুন পর্বতমালা
হেমকুট পর্বতমালা	লাডাক, কৈলাস ট্রান্স-হিমালয়ান পর্বতমালা
হিমবান পর্বতমালা	দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা

মেরু পর্বতের চারদিক থেকে প্রসারিত দীর্ঘ গিরিশিরাগুলোর মধ্যে হিমবান বা হিমালয় পর্বতমালার একটি এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিকে। সেখান থেকেই গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ দিকে। হিমালয় পর্বতমালার অসংখ্য তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গ। সেই সব পর্বত শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে বিশাল হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। এই হিমবাহ থেকেই

উৎসারিত হয়েছে অসংখ্য নদী। হিমবাহের বরফ গলা জলে সৃষ্ট হয়েছে নদীগুলি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই এই সব নদীগুলি অভিহিত হয়েছে গঙ্গা বলে। হিমবাহের বরফগলা জলে সৃষ্ট অনেক নদীই ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রবাহিত। যেমন চীন দেশের বিখ্যাত নদী হোয়াং হোর পৌরাণিক নাম ছিল সীতা নদী। অবশ্য কোন কোন পুরাণে মহাগঙ্গা বলে উল্লেখ করা হয়। ভারতবর্ষের যে সব নদী হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে নির্গত হয়েছে, সেইসব নদীর অনেকগুলোর নামের সঙ্গে 'গঙ্গা' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। যেমন—বিষ্ণুগঙ্গা, ধৌলীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, রামগঙ্গা, গৌরীগঙ্গা। মূলতঃ এই সব নদী হিমালয়ের তুষার ভূমি থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নিম্ন ভূমিতে। পরে, এই ধারাগুলি মূলগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই হিমালয়ের তুষারাবৃত বা হিমবাহ —মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ গঙ্গা। হিমবাহের বরফ গলে যাবার পর বরফগলা জলে পুষ্ট নদীর ধারা মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত গঙ্গা। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে বসে বসে শুনেছি মহাদেবের জটার কথা। কমলেশজী আমাকে শোনাতেন গঙ্গার কথা। কেদারগঙ্গা, জাহ্নবীগঙ্গা, হরিগঙ্গা, ভীলগঙ্গা, ধর্মগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, ভৃগুগঙ্গা এমনি গঙ্গার বিভিন্ন ধারা—মহাদেবের জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে। একই গঙ্গার বিভিন্ন ধারার নানা পরিচয়। এই সব জলধারাই তো নানা পরিচয় নিয়ে বিশাল হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে নেমে এসেছে। গঙ্গোত্রী পেরিয়ে বারবার গিয়েছি গোমুখ। গরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট বরফের গুহা থেকে নির্গত জলধারা দেখেছি। অদূরেই তুষারাবৃত শিবলিঙ্গ পর্বত। আরো এগিয়ে গেলেই কেদারনাথ পর্বত। এই সব পর্বত শিখর থেকে নেমে এসেছে তুষারের ধারা। অবাক হয়ে দেখেছি, এই তো সেই বিশাল শিবক্ষেত্র। মহাদেবের জটাজাল তো এমনি ভাবেই রয়েছে ছড়িয়ে। সেই জটাজাল থেকে নেমে এসেছে গঙ্গার এক একটি ধারা।

রামায়ণ.মহাভারত ও পুরাণে গঙ্গার কথা লিখেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ। সুদীর্ঘ অতীত যুগের ঋষিগণ দুর্গম পথ বেয়ে এসেছিলেন মহাদেবের জটাজালের সন্ধানে। রাজর্ষি ভগীরথ কঠোর সাধনা করে গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন মহেশ্বরকে তুষ্ট করে। সে যুগের সেই সাধনার স্বাক্ষর যেন ভাস্বর হয়ে রয়েছে গঙ্গোত্রীতে। ঘুম ভাঙতেই আমি তাই ভোরবেলায় নেশাগ্রস্তের মতো বেরিয়ে পড়তাম। মন্দিরের অঙ্গন পেরিয়ে সোজা চলে যেতাম ভাগীরথীর তটভূমিতে। পাথরের ওপরে বসে বসে দর্শন করতাম সন্ন্যাসীদের অবগাহন। কমলেশজীও দর্শন করতেন। স্তোত্রপাঠ করতেন উদাত্ত কণ্ঠে। ভাগীরথীর জলকল্লোলের সুরে যেন গলা মিলিয়ে

ফেলতেন। স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে দেখতাম সূর্যের রক্তিম আভা। অনেক দূরে সুউচ্চ গিরিশিরা পেরিয়ে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতো সূর্যদেব। ভাগীরথীর বুকে সোনা রঙ ঢলে পড়তো। কমলেশজীর চোখেমুখে দেখতাম অদ্ভুত দীপ্তি। স্তোত্রপাঠ করতে করতে গঙ্গার অপরূপ রূপকল্পনা অনুভব করতেন হয়তো। আমিও দেখতাম—অস্বচ্ছ দীপালোকে গঙ্গার দীপ্তমূর্তি। দেবী প্রসন্নময়ী. সুচারুবদনা. নেত্রযুগল অমৃত চন্দ্রের প্রভায় ভাস্বর। তাঁর শিরদেশে শ্বেতছত্র। সদা স্নিগ্ধ. করুণার্দ্র মুখমণ্ডল।

কিশোর বয়স থেকেই কমলেশজী গঙ্গোত্রী আসতেন মুখুভাগ্রাম থেকে বাবার সঙ্গে। গঙ্গার জলধারা দেখতে দেখতে সময় কাটতো। মুখুভা গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে যেতেন উত্তরকাশী, সেখান থেকে ঋষিকেশ হরিদ্বার। গঙ্গা সেখানে সমতলভূমিতে অবতরণ করেছে। কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর কলকণ্ঠের মধ্যে গঙ্গার কলধ্বনি শুনতেন। গঙ্গাকে ভালবেসে তিনি বুঝি হারিয়ে যেতেন সব কিছু। তাই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেন প্রয়াগ। যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থানে দেখতেন কুম্ভমেলা। সেখান থেকে বারাণসীর গঙ্গার তীর ধরে এগিয়ে যেতেন। এমনি করে গঙ্গার পথ ধরে চলে যেতেন সাগরসঙ্গমে। গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসঙ্গমে তিনি অনেকবার গিয়েছেন। মহারাজা ভগীরথের পদচিহ্ন খুঁজে খুঁজে উন্মনা হয়ে পথ চলতেন। অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসীর ভিড়, পুণ্যার্থী নরনারীর মাঝখানে অবাক হতেন। সাগর সঙ্গমে সাগরের গর্জনের মধ্যে বুঝি খুঁজে পেতেন গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার কলকলকণ্ঠ। দীর্ঘ পথ গঙ্গার, কত তীর্থ, কত জনপদ গঙ্গার তীরে তীরে। কমলেশজী ভূগোল ইতিহাস জানতে চান না। গঙ্গাকে সাক্ষী করে তাঁর জন্ম হয়েছিল একদিন। তারপর সেই পবিত্র জলধারা সাক্ষী করে দীর্ঘ পথযাত্রা—মহাতীর্থের দর্শনের আশায়।

॥ ৫ ॥

গঙ্গায়াং জ্ঞানতো মৃত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
অজ্ঞানাদ্ ব্রহ্মলোকং চ যাতি নাস্ত্র সংশয়ঃ॥ কূর্মপুরাণ

অলকানন্দা আর ভাগীরথীর সম্মিলিত জলরাশি হিমালয়ের গিরিখাত

বেয়ে মন্থর গতিতে নেমে এসেছে ঋষিকেশে। সেখান থেকে জলধারা আরো ঢালু পথ বেয়ে নেমে এসেছে হরিদ্বারে। সেখানে জলরাশির উচ্ছ্বাস স্তিমিত, উদ্দাম ও সর্বনাশা গতিবেগ যেন আত্মস্থ। শান্তিদায়িনী, ত্রিভুবন-পালিনী এই অপরূপ মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা জলধারার নাম গঙ্গা। মর্ত্যাভিমুখী গঙ্গার করুণাময়ী রূপের প্রকাশ ঋষিকেশের নীলধারার পর থেকেই। হরিদ্বারের পর গঙ্গা সমভূমিতে অবতরণ করে শস্যশ্যামল করে তুলেছে বসুন্ধরা। মুরারীচরণ থেকে অবতরণ কালে গঙ্গার মনে খেদ হয়েছিল। স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যে অবতরণ দুঃখজনক। বিশেষ করে, সুখ দুঃখ, মায়া মোহ ও পাপ তাপ জর্জরিত মর্ত্যে অবতরণ। গঙ্গা তাই ভগবান বিষ্ণুর কাছে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেছিলেন।

করজোড়ে বলেছিলেন—প্রভু! তোমার আদেশে আমি মর্ত্যে অবতরণ করতে চলেছি। আমার জলস্পর্শে ষাট হাজার সগর সন্তান পাপ থেকে মুক্তি পাবেন। আমার জলস্পর্শে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপী তাপী মুক্তি লাভ করবে ত্রিতাপ জ্বালা থেকে। কিন্তু আমি তাদের সমস্ত পাপ তাপ দুঃখ বেদনা বুক ভরে বয়ে নিয়ে থাকবো অনন্তকাল ধরে। আমার মুক্তি হবে কেমন করে প্রভু? তোমার মুক্তি, ভগবান বিষ্ণু স্মিত হাস্যে বলেছিলেন—তোমার আবার পাপ কোথায়? তুমি তো চিরনির্মল। ত্রিভুবনে তুমি পতিতপাবনী নামে খ্যাত।

—কিন্তু প্রভু!

ভগবান বিষ্ণু গঙ্গার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—তবু যদি মনে করে থাকো, তোমার দেহে পাপ প্রবেশ করতে পারে, তাহলে জানবে, তোমার জলে যেমন অসংখ্য পাপীতাপী অবগাহন করবে, তেমন পরম বৈষ্ণব, সিদ্ধপুরুষও অবগাহন করবে। লক্ষ লক্ষ পাপী অবগাহন করলে যদি বিন্দুমাত্র পাপ তোমাকে স্পর্শ করে, শুধুমাত্র একজন বৈষ্ণব অবগাহন করলে দূর হবে তোমার সমস্ত পাপ। এমনি করে তুমি পবিত্র হয়েই থাকবে অনন্তকাল ধরে।

এ-সব কাহিনী নানা পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। বার বার পড়েছি, এসব কথা শুনেছি গঙ্গোত্রীতে সাধুসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে। ১৯৩৭ সনে এসেছিলাম গঙ্গোত্রী। ঋষিকেশ থেকে বাসে উত্তরকাশী, সেখান থেকে সুখী। তারপর পায়েহাঁটা পথ, ধারালী থেকে ভৈরবঘাটি, অবশেষে গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীতে বসে বসে গঙ্গার কথা শুনতাম স্বামী সারদানন্দজীর কাছ থেকে। কেদার গঙ্গার ওপারে, গৌরী কুণ্ডের পাশেই একটা ছোট ঘরে আস্তানা পেতেছিলেন তিনি। কোন আশ্রয় ছিল না, কুঠিয়াও নয়। গঙ্গোত্রীর অস্থায়ী ডাকঘরের পাশেই ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের মেঝেতে

কম্বল বিছানো। সামনেই একটা আসনে গুরুদেবের ছবি। ধূপ ধুনোর গন্ধে ঘর যেন ভরপুর। সামনের আসনের ওপরে সুতো দিয়ে ঝোলানো শুকনো ব্রহ্মকমল ও এনাকোলিস ফুল। শুনেছিলাম সারদানন্দজী কোন সংস্কারেই আবদ্ধ নন। তাঁর ঘরে সবারই অবাধ গতিবিধি। সংসারী মানুষের কথা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। রোগে শোকে জর্জরিত গ্রামের সহজ ও সরল দরিদ্র মানুষ আসতো সুখদুঃখের কথা বলতে। সারদানন্দজী স্মিতহাস্যে বলতেন—আমি সংসারী মানুষ নই, তাই হয়তো সবাই আসে দুঃখ বেদনার কথা বলতে। আমি বিরক্ত হই না, দুঃখ পেয়েই বা কি হবে? ওদের সুখদুঃখে সহানুভূতির কথা বলতে আমার খুবই ভাল লাগে। প্রাণ খুলে ওদের সঙ্গে কথা বলি, ওরা আমাকে আপন বলে মনে করে।

স্বামী সারদানন্দজীর ঘরের পাশেই আর একটি ঘরে দীর্ঘকাল পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গোত্রীর অস্থায়ী পোস্টঅফিস। তীর্থযাত্রীদের জন্য পোস্টঅফিস খুলে রাখতে হয় যাত্রী সমাগমের সময়। পোস্টমাস্টার গঙ্গোত্রী অঞ্চলের শেষ গ্রাম মুখুভার অধিবাসী। স্বল্প বেতন পায় সে। কারণ, পোস্টঅফিসটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী। বড় সংসার তার, অভাবে অভিযোগে হিমসিম খায়। তাই প্রায়ই তাকে পোস্টঅফিসের কাজ বন্ধ রেখে যেতে হয় গ্রামে। তার অনুপস্থিতির সময় সমস্ত কাজ করতেন স্বামী সারদানন্দজী। তীর্থযাত্রীদের জন্য পোস্টঅফিসের দরজা খুলে রাখতে হত তাঁকে। তীর্থযাত্রীদের সেবা, অভাবী পোস্টমাস্টারের স্বল্প আয় বজায় রাখবার জন্য স্বামীজী হাসিমুখে এই কাজটিও করতেন। কোন কিছু বললে স্বামীজী বলতেন হেসে—এরা গঙ্গার তীরের মানুষ, এদের সেবা করা পুণ্যের কাজ। গঙ্গা তীর্থের যাত্রীদের সেবা আর গঙ্গা তীরের মানুষের সেবা দুই-ই সমান আকর্ষণীয়।

ভাল লাগতো স্বামীজীর এসব কথা শুনতে। অদূরেই প্রবহমানা ভাগীরথী, চারদিকে চীর গাছের ভীড়। ছোট্ট ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোয় আসনে উপবিষ্ট স্বামীজী। শীর্ণ, তপঃক্লিষ্ট দেহ। পাশেই একটি ছোট্ট টাইপরাইটার মেসিন। অবসর সময় লেখেন, আর টাইপ করেন। গঙ্গা সম্পর্কে লেখা, হিমালয় সম্পর্কে লেখা। লেখাগুলো বাইরে পাঠান কোন পত্রিকায় ছাপবার জন্য। কোন কোন বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বামীজী বলতেন—এতে বিদেশে গঙ্গা মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়।

দাক্ষিণাত্য নিবাসী এই সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন সংসার ত্যাগ করে। ইট, কাঠ, মাটি আর পাথর, লোহা-কলকব্জার আকর্ষণ তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পারেনি

সংসারে। সংসারের প্রেম-ভালবাসা আর স্নেহ মায়ার কঠিন বন্ধন অতিক্রম করে এক সময় অনেক পথ হেঁটে এসেছিলেন গঙ্গাতীরে ঋষিকেশে। তারপর, গঙ্গার জলধারা তাঁর রক্তে, ধমনীতে শিরা উপশিরায় বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন ঋষিকেশে শিবানন্দ আশ্রমে। সেখানে অবস্থানকালে প্রতিদিন গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলে সকাল সন্ধ্যায় অবগাহন, গঙ্গাজল পান স্বামীজীর মনে এক নতুন উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন—গঙ্গার নীলাভ জলপ্রবাহ তাঁর রক্তস্রোতের মধ্যে এনেছিল অপরূপ আলোড়ন। গঙ্গা যাঁকে একবার আকর্ষণ করে, তাঁর করুণাঘন স্পর্শ একবার যাঁরা লাভ করেন, গঙ্গার তীর ছেড়ে আর তাঁরা দূরে যেতে পারেন না কিছুতেই। সারদানন্দজীর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। গঙ্গার পথ ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন উত্তরকাশী। সেখানে ভাগীরথীর তীরে বাস করতেন সিদ্ধপুরুষ বিষ্ণুদত্ত মহারাজ। ভাগীরথীর শীতল জলেই প্রায় সারাদিন অবস্থান করতেন। সারদানন্দজী তাঁকে দর্শন করে চলে গিয়েছিলেন আরো ওপরে—গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর বিচিত্র পরিবেশ, তীর্থযাত্রীদের ভিড় তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ভাগীরথীর জলধারার সঙ্গে তিনি বুঝি নির্জনে মনের কথা বলতে চাইতেন। তাই গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন পাইন আর চীর গাছের ভীড় ঠেলে। চীরগাছের বনছায়ায় ঢাকা চীরবাসায় লতাপাতা দিয়ে কুটির বেঁধেছিলেন। নির্জনে বনছায়ায় ঘর বাঁধা, তাঁর মনকে ভরে রেখেছিল। দু পাশে বিশাল গিরিশিরা, তারই পদতলে কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছিল ভাগীরথী। সূর্য ওঠে পূর্ব দিক থেকে। সামনেই সূর্যস্নাত মহারাজা ভগীরথ বুঝি শিলীভূত হয়ে তুষারশুভ্র কিরিটী ধারণ করে সমাধিস্থ। অদূরেই ভৃগু-পর্বত। বিস্মিত স্তব্ধ স্বামী সারদানন্দজী। এই পরিবেশই তো তিনি কল্পনা করেছিলেন। দু চোখ ভরে দেখতেন। দু কান ভরে শুনতেন ভাগীরথীর উচ্ছল সঙ্গীত। মাঝে মাঝে নিজেই সেই সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইতেন। চীরবাসা তাঁর কাছে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। তিনি শুধু সন্ন্যাসীই নন। তিনি যেন কবি। প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী। বিজ্ঞানী হয়েও তিনি যেন কার্যকারণের জটিলতায় আবদ্ধ থাকতে চাননি। তাই হয়তো ভাগীরথীর জলকল্লোলের শব্দ আর চীরগাছের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের মধুর সঙ্গীতের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে থাকতেন তিনি চীরবাসায়। চিরবাসায় ভাগীরথীর ওপরে পুরনো ধর্মশালা। পূর্বে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথ ছিল সেখান দিয়ে। সেই ধর্মশালা পেরুতেই ভৃগু-গঙ্গার ধারে কুঠিয়া বেঁধে বাস করতেন বিষ্ণুদাস মহারাজ, গুরুদেও দাসজী,

হংসানন্দ তীর্থ। সারদানন্দজী মাঝে মাঝেই যেতেন গোমুখ। তারপর একদিন চীরবাসার নির্জনবাস ত্যাগ করে সারদানন্দজী চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই অস্থায়ী পোস্টঅফিসের পাশের ঘর-টায়। ১৯৬৬ সনে কমলেশজী আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সারদানন্দজীর ছোট্ট ঘরটায়। বসে বসে শুনতাম তাঁর কথা। ঘরে দেখতাম বিভিন্ন দেশের তীর্থযাত্রী। স্বামীজীর দর্শনের জন্য এসেছেন তাঁরা। তীর্থস্থানে সন্ন্যাসীর আগমন, অবস্থান তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে। গঙ্গোত্রী অঞ্চলেই বাস করতেন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী, রামানন্দ অবধূত, নরহরি মহারাজ, অন্তর্-যামী মহারাজ, মহেন্দ্রপুরী নাগা, অচ্যুতানন্দজী। কোন্ তীর্থে কতজন বড় সন্ন্যাসী, মহাত্মা বাস করেন, তা নিয়ে পাণ্ডাদের মধ্যে যেন প্রতি-যোগিতা চলতো।

ভাগীরথীর তীরে গঙ্গোত্রী মন্দির অঞ্চলে, চীরবাসা, ভুজবাসা, তপো-বন সমস্ত অঞ্চলে অবস্থানরত সন্ন্যাসীদের কথা তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতো। সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্যে অনেক সময় অনেক অলৌকিক কাহিনীর জন্ম নিত। তারপর প্রচার হত ফুলের সৌরভের মতো দেশ-দেশান্তরে। গঙ্গা ও তার উৎস দর্শন করতে থামতেন তীর্থযাত্রীরা। সেই তীর্থযাত্রা সুদূর অতীতকাল থেকেই অব্যাহত। গঙ্গা দর্শন, গঙ্গার তীরে অবস্থানরত সাধু মহাত্মাদের দর্শন দুই-ই সার্থক হত দীর্ঘপথশ্রমে আর পথচলার কঠোর সাধনার ফলে। স্বামী সারদানন্দজীকে গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাণ্ডারা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। সাধনভজন ছাড়াও স্বামীজী অবসর সময় ব্যস্ত থাকতেন বইপত্র নিয়ে। ১৯৬৮ সনে তাঁকে দেখেছিলাম মন্দির সংলগ্ন ধর্মশালার একটা ঘরে। ১৯৬৯ সনে তিনি নিজস্ব কুঠিয়া বানাতে শুরু করেছিলেন। এক বৎসর লেগেছিল সেই কুঠিয়া নির্মাণ কার্য শেষ হতে। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় ভাগীরথীর বিভিন্ন রূপ দর্শনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। গঙ্গা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী শুনতেন তিনি। সে সব কাহিনী প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। সারদানন্দজীকে তাই হয়তো মাঝে মাঝেই যেতে দেখেছি গোমুখে। বেশ কিছুদিন অবস্থান করতেন সেখানে। গঙ্গার কলধ্বনির মধ্যে হয়তো সুদূর অতীত যুগের কথা শুনবার আশায় দিন গুনেছিলেন।

গঙ্গাকে প্রাণভরে ভালবেসেছেন একজন পরিব্রাজক। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি নন, কিন্তু সংসারে আবদ্ধ গৃহী মানুষও নন। ১৯৬০ সনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সামান্য পরিচয় ঘনিষ্ঠ

হয়েছিল। তাঁকে আমি সেজকা[1] বলে ডাকি। তাঁর কাছে বসে বসে শুনতাম গঙ্গার কথা। গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী, গোমুখ পর্যন্ত গঙ্গার দীর্ঘ প্রবাহ তিনি অনেকবার দর্শন করেছিলেন। ঋষিকেশ থেকে গোমুখ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ প্রায় তখনকার কালে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হত। সেই দীর্ঘ পদযাত্রা সহজসাধ্য ছিল না আদৌ। বিপদসঙ্কুল সেই পথের স্মৃতিচারণ করতেন তিনি। তারপর পায়েচলা পথ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল বাস রাস্তা চালু হবার পর থেকেই। বেশীদিনের কথা নয়, একবার একদল সন্ন্যাসী স্বল্প শীত বস্ত্র ও নাম মাত্র অর্থ সংগ্রহ করে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন। তার পর গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ, গোমুখ পেরিয়ে দুর্গম তুষারাবৃত গিরিপথ অতিক্রম করে পেঁাছে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। এই দুঃসাহসিক পদযাত্রার কাহিনী শুনেছিলাম সেজকার কাছ থেকে। এই দুঃসাহসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে দু একজনের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। শৈশবে মায়ের মুখ থেকে শোনা গঙ্গার উৎসের কথা আমার স্মৃতিকে ভরিয়ে রেখেছিল। গঙ্গার উৎস দর্শনের স্বপ্ন দেখতাম তখন থেকেই। সেই দুর্গম পথ, যে পথের আবিষ্কার করেছিলেন রামায়ণের যুগে মহারাজা ভগীরথ। সেজকা হয়তো বা মহারাজা ভগীরথের পথের নিশানা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। মায়ের মুখে শোনা গঙ্গার স্মৃতি যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেজকার লেখা বই "গঙ্গাবতরণ" আমাকে গঙ্গার পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গঙ্গোত্রী, গোমুখ। ঋষিকেশ থেকে উত্তরকাশী, সেখান থেকে গাঙ্গনানী পর্যন্ত বাস রাস্তা। তারপরই পায়ে হাঁটা পথ। সুখী, হরিপ্রয়াগ, ধারালী, ভৈরবঘাটি। ভৈরবঘাটিতে রাত্রি বাস করে পর দিন পেঁাছে গিয়েছিলাম গঙ্গোত্রী।

১৯৬৩ সনে সেজকা গোমুখ থেকে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ পেরিয়ে কালিন্দীখাল অতিক্রম করে। সেজকার যাত্রাপথের সঙ্গী ছিলেন প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, তাঁর সহধর্মিনী সুলেখিকা শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস, বিখ্যাত রেডিওলজিস্ট ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ পট্টবর্ধন, স্বামী সুন্দরানন্দ। প্রধান গাইড ছিল দিলীপ সিং। স্বামী সুন্দরানন্দ গঙ্গোত্রীতেই কুঠিয়া বানিয়ে বসবাস করতেন। গঙ্গোত্রী অঞ্চল তাঁর সুপরিচিত। সেই দলের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীরও যাবার কথা ছিল। সেজকার কাছেই শুনেছিলাম যাত্রাপথের কথা। গঙ্গোত্রী থেকেই কুলি ও গাইড নিয়ে প্রথম দিন দলবল সহ তাঁরা চীরবাসায় স্বামী সারদানন্দজীর কুঠিয়ায় রাত্রি যাপন করে—

১. শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন। গঙ্গোত্রী থাকতেই সেজকা খবর পেয়েছিলেন যে সারদানন্দজীর গুরুদেব স্বামী শিবানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। তাই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ যাবেন কিনা? স্বামী সুন্দরানন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সারদানন্দজী কিন্তু নির্বিকার। গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন। এ তো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। জন্ম, মৃত্যু, মানুষের জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। সন্ন্যাসী হলেও দেহ আছে। রোগ, মৃত্যু—দেহের চরম পরিণতি অস্বীকার করা যায় না। সন্ন্যাসীর আবার মায়া-মমতা কিসের? সেদিন সারদানন্দজীর যেন নিজেকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন নানা কাজের মধ্যে। সেই দিনই তিনি ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন। সবার জন্য খানা বানিয়েছিলেন সযত্নে। রসুই-খানার পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কারণে অকারণে ভেঙে পড়েছিলেন উচ্ছল হাসিতে। চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে যোগাড়যন্ত্র করেছিলেন সব কিছুই। সবাইকে সযত্নে খাইয়ে দাইয়ে আগামীকালের পদযাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করেছিলেন। সমস্ত কাজ সমাপ্ত করে সারদানন্দজী অনেক রাত ধরে গল্প করেছিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বামী সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো বা অন্যমনস্ক হতেন। এমনি করেই রাত্রি শেষ হয়েছিল। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই কুলি আর গাইড নিয়ে যাত্রা করবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন সবাই। হঠাৎ সেজকার মনে হয়েছিল—সব ব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্বামী সারদানন্দজীকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অবাক হয়েছিলেন সেজকা। উচ্ছল উৎসাহী স্বামী সারদানন্দজীর পক্ষে ঘুমিয়ে থাকা তো সম্ভব নয়? ব্যাপার বুঝতে না পেরে স্বামী সুন্দরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই পরে বুঝতে পেরেছিলেন সেজকা। রাত থাকতেই হঠাৎ সারদানন্দজী ব্যস্ত হয়েছিলেন। সারারাত ধরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে মনস্থির করে ফেলেছিলেন তিনি—নাঃ, আর সময় নষ্ট করা নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে ভোর হবার আগেই।

দীর্ঘপথ, সময় সংক্ষিপ্ত। সুন্দরানন্দজী বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেই ভাবা, সেই কাজ! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিলেন একাকী। গোমুখ থেকে বদ্রীনাথের পথ নয়! চীরবাসা থেকে সোজা উত্তরকাশীর পথে। সব পরিকল্পনা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেদিন। গোমুখ থেকে বদ্রীনাথের পথ, ভাগীরথীর উৎস পেরিয়ে চির তুষারাবৃত অঞ্চল, অসংখ্য তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ, গঙ্গার

উৎস পেরিয়ে বদ্রীনাথ দর্শনের স্বপ্ন ও কল্পনা, সব ত্যাগ করে সারদানন্দজী ছুটে গিয়েছিলেন ঋষিকেশ। সেখানে আশ্রমে তাঁর গুরুদেবের মৃতদেহ সংরক্ষিত ছিল। সংস্কার ত্যাগী সন্ন্যাসী যেন সংস্কারে আবদ্ধ হয়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য। সেজকা বলেছিলেন হেসে—সারদানন্দজী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সংসার নেই তাঁর, তাই বলে কি বন্ধনমুক্ত! তিনি যে বিরাট সংসারের বন্ধনে যুক্ত। সে বন্ধন এড়িয়ে যাবেন কেমন করে?

সারদানন্দজীর সঙ্গে সেজকার সামান্যই পরিচয়। তবু তাঁর কথা উঠলেই সারদানন্দজী অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলতেন—উমাপ্রসাদজী তো সন্ন্যাসীই! সংসারের বেশভূষা তাঁর বহিরঙ্গ রূপ। অন্তর তার যথার্থ গেরুয়া রঙে রাঙানো।

গঙ্গোত্রীতে দীর্ঘকাল বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কথা। গঙ্গাকে ভালোবেসে স্থায়ী আশ্রম বানিয়েছিলেন তিনি। গঙ্গার উৎস পরম পবিত্র তীর্থস্থান। সেই তীর্থস্থানে বসবাস করবার জন্যই হয়তো এই নগ্ন মৌনী সন্ন্যাসী এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। ছোট্ট কৃশকায় চেহারা, হাসি হাসি মুখ, দুচোখে শিশুসুলভ সারল্য। কতকাল আগে তিনি এসেছিলেন গঙ্গোত্রী, তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না কেউই। ভাগীরথীর ওপারে তাঁর ছোট্ট কুঠিয়া। সেখানে কুঠিয়ার সামনে এসে বসতেন। কুঠিয়ার ভেতর থেকে ভোর হতেই বেরিয়ে আসতেন নগ্নদেহে দুহাতে দুটো বালতি নিয়ে। সূর্যের সোনালী আলোর আভাস সবেমাত্র ভাগীরথীর জলের ওপরে জেগে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী বালতি দুটো পাথরের ওপরে রেখে নেমে পড়তেন হিমশীতল জলের মধ্যে। অবগাহন করতেন দীর্ঘ সময় ধরে। প্রভাত সূর্যের লোহিত আভায় তাঁর মুখ যেন ভাস্বর হয়ে উঠতো। ভাগীরথীর হিমশীতল জলে তাঁকে অবগাহন করতে দেখতাম আমি দিনের পর দিন। যেমন দেখেছিলাম উত্তরকাশীতে সিদ্ধপুরুষ বিষ্ণু দত্ত মহারাজকে। তিনি ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী। সংসারী মানুষের দৃষ্টি সহ্য করতে পারতেন না যেন। দ্রুত পালিয়ে যেতেন জল থেকে উঠে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীও ভাগীরথীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন নিজেকে। স্নান সমাপ্ত করে দু বালতি জল নিয়ে উঠে আসতেন। ভারী বোঝা নিয়ে খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেন অক্লেশে চলে যেতেন কুঠিয়ার দিকে। বালতি নামিয়ে রেখে বসতেন ধুনির পাশে। দুহাত দিয়ে তুলে নিতেন ধুনির ছাই। বেশ করে সর্বাঙ্গে মাখাতেন। ভাগীরথীর

পবিত্র জল আর ধুনির ছাই সর্বাঙ্গে লেপন করে বসে থাকতেন আসন পেতে। সূর্যের রক্তিম চোখ ভাগীরথীর জল স্পর্শ করে ধীর বেগে এগিয়ে যেতো। তারপর যেন পাথরের ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়তো শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়ার সামনে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রীরা আসতো দর্শন লাভের আশায়। দর্শনার্থী দেখলেই আসন ছেড়ে দ্রুত ঢুকে যেতেন কুঠিয়ার ভেতরে। সেখান থেকে শুকনো ফল নিয়ে আসতেন। কিছুই না থাকলে গুড় বা চিনি নিয়ে এসে দিতেন হাতে। হাসতেন শিশুর মতো। আকারে ইঙ্গিতে বা ইশারায় কুশল জানতে চাইতেন। দর্শনার্থীরা অনেকেই কিছু না কিছু আনতেন মহাত্মা দর্শনের জন্য। যথার্থই মহাত্মা। আমার কথা নয়, তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস। দীর্ঘ দিনের পুরনো পাণ্ডাদের কথা। এই সব কথাই ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। ১৯৬০ সনে আমার এক আত্মীয় এসেছিলেন গোমুখ। তখন পথযাত্রীদের পায়ে হাঁটা পথ শুরু হত ধরাসু থেকে। উত্তর কাশী, ভাটোয়ারী, গাঙ্গনানী, হরিপ্রয়াগ, ধারালী, ভৈরবঘাটি, গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীতে দিনকয়েক বিশ্রাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে দর্শন করতেন প্রতিদিনই। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন গঙ্গোত্রী মন্দির দর্শনের পরই প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে দর্শন করলে মনটা ভরে ওঠে আনন্দে। তিনি যথার্থই মহাত্মা। তাঁর ধারণা, সন্ন্যাসীর বয়স একশো সত্তর বৎসরেরও বেশী। তিনি নাকি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ১৯৫০ সনের শোনা কাহিনী ও ছবি দেখে আমিও ভাবতাম সেই সন্ন্যাসীর কথা। গঙ্গার উৎসের সন্নিকটে অবস্থানকারী সিদ্ধপুরুষ দর্শনের কল্পনা মনে জাগতো। তখন আমার বয়স কম। আমার পক্ষে এই দুর্গম পথে যাবার কথা স্বপ্নের মতো মনে হতো। তখন যাঁরাই যেতেন গঙ্গোত্রীর পথে, তাদের কাছেই শুনতাম পরম আগ্রহ ভরে পথের কথা, গঙ্গোত্রীর কথা আর সেই সিদ্ধপুরুষের কথা। গঙ্গা, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর প্রাণ। দীর্ঘকাল ধরে গঙ্গোত্রীতে বসবাস করে ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলতেন। সেই গঙ্গার জলে অবগাহন, গঙ্গার জল সেবন, গঙ্গা দর্শন তাঁর অপরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করতেন অহর্নিশি। এই গঙ্গাই অবতরণ করেছিল স্বর্গ থেকে। গোমুখের ওপরেই চিরতুষারময় উচ্চভূমি; সেখানেই স্বর্গগঙ্গা।

গঙ্গোত্রীতে বসবাস করবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী। সাধারণের সমক্ষে দেখতে পাওয়া যেতো না তাঁকে। গোমুখের

ওপরে, তুষারাবৃত গিরিশিরা বা হিমবাহের ওপরে মাঝে মাঝে গঙ্গোত্রীর নিকটবর্তী অঞ্চলের মেষ পালকেরা একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছিল। সে দর্শনও ক্ষণিকের জন্য। মানুষ দেখলে যেমন অন্য কোন জীব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীও দ্রুত পালিয়ে যেতেন কঠিন বরফের ঢাল বেয়ে। কোথায় তাঁর বাসস্থান, কি তাঁর আহার, জানা যেতো না কিছুই। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডা আর পূজারীরা নানা অদ্ভুত কাহিনী শুনতো মেষপালকদের কাছ থেকে। এই অদ্ভুত উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দর্শন সম্পর্কেও নানা কাহিনী পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। সবাই বিশ্বাস করতো, সন্ন্যাসী কোন এক অসাধারণ সিদ্ধপুরুষ। কোন কোন উৎসাহী পাণ্ডা ও পূজারী মাঝে মাঝে এগিয়ে যেতো গোমুখ পেরিয়ে। সেখানে তুষারাবৃত অঞ্চলে দর্শন পেতো সেই সিদ্ধপুরুষের। তারা তাঁর পরিচয় জানতে পারতো না। এমনি বেশ কিছুকাল পরে সেই বিরক্ত সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া গিয়েছিল গঙ্গোত্রী মন্দিরের ওপারে ভাগীরথীর তীরে। তখন অবশ্য ভাগীরথীর ওপারে কোন সন্ন্যাসীর কুঠিয়া ছিল না। গঙ্গোত্রীর মানুষেরা এই বিস্ময়কর সন্ন্যাসীর দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিল। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর তীরে এমন একজন সিদ্ধপুরুষকে স্থায়ীভাবে রাখবার কল্পনাও করেছিল হয়তো। তাই সন্ন্যাসীর জন্য খাদ্যবস্তু নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরক্ত সন্ন্যাসী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতেন। গঙ্গোত্রীর মানুষেরা কিন্তু আবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো সেই সিদ্ধপুরুষের দর্শন লাভের আশায়। সন্ন্যাসী কিন্তু আবার আসতেন গঙ্গোত্রীতে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি যেন বেশ কিছুটা পরিবর্তিত মনে হতো। বিষয়ী মানুষদের লক্ষ্য করে আর তেমন বিরক্ত বোধ করতেন না। একদিন ভোরবেলায় গঙ্গোত্রী মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখেছিলেন—উলঙ্গ সন্ন্যাসী ভাগীরথীর হিমশীতল জলে অবগাহনরত। অবগাহন শেষে কেমন যেন তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন গঙ্গোত্রীর মন্দিরের দিকে। কেমন যেন শান্ত সমাহিত তাঁর দৃষ্টি। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা যথারীতি খাদ্যবস্তু পুঁটুলি করে ছুঁড়ে দিয়েছিল ভাগীরথীর ওপারে সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে। সন্ন্যাসীও লক্ষ্য করেছিলেন অবহেলাভরে। তারপর কিছু সময় পর মৃদু হেসে খাদ্যবস্তু তুলে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে যেতেন, হারিয়ে যেতেন ঘন চীর আর পাইন গাছের ভিড়ে। এমনি করেই চলেছিল এই অদ্ভুত খেলা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। গঙ্গোত্রীর মানুষরা ইতিমধ্যেই তাঁকে যেন ঠিক চিনে ফেলেছিল। তাই সাহস করে এগিয়ে যেতো সন্ন্যাসীর কাছে। প্রণাম করে খাদ্যবস্তু পায়ের কাছে রেখে চলে আসতো। এমনি

করেই বিরক্ত সন্ন্যাসী গঙ্গোত্রীকে ভালবেসেছিলেন। দুর্গম তুষার ভূমির নির্জন বাস ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর তীরে কুঠিয়া বেঁধেছিলেন। এর পরে এই মৌনী সন্ন্যাসী সম্পর্কে নানা গল্প নানাভাবে পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল। নানা বইয়ে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর অলৌকিকতা অবশ্য চোখে আমি দেখিনি। তবে যে কোন দর্শনার্থীর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী যথার্থই মহাত্মা। তাঁর শিশুসুলভ সারল্য, হাসি ভরা মুখ আমার দুচোখ ভরিয়ে দিতো। সত্তর বৎসর বয়স্ক একজন পাণ্ডা আমাকে বলেছিলো—মহাত্মাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ একই রকম ভাবে দেখে এসেছে। একবার বর্ষায় গঙ্গোত্রীর একপাশ থেকে বড় বড় পাথর আলগা হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সব সন্ন্যাসী কুঠিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু কুঠিয়া ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী। পাণ্ডা আর পূজারীরা জোড় হাত করে অনুনয় করেছিল। ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর এসে যেখানে পড়বে, সে স্থানটি গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। সব চাইতে বড় পাথরগুলো শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়ায় পড়বার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী ছিল। সবার অনুরোধ, সবার অনুনয়-বিনয়েও কিন্তু মৌনী সন্ন্যাসী ইশারায় জানিয়েছিলেন যে দেহ রাখবার ইচ্ছে অনিচ্ছে ভগবানই ভালো বুঝবেন। আমি ভেবে উতলা হব কেন?

তারপর সত্যি সত্যি গঙ্গোত্রীর মন্দিরের ওপারের গিরিশিরার ওপর থেকে বড় বড় পাথর আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। একটি বড় পাথর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ছিল শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কুঠিয়ার দিকে। মৃত্যুর মুখোমুখি অচল অটল হয়ে মহাত্মা বসেছিলেন আসনে। প্রচণ্ড ঘর্ঘর ধ্বনি, বজ্রপাতের শব্দ, এমনি মারাত্মক বিপর্যয়েও ভীত হন নি তিনি। মস্ত বড় পাথর ঠিক তাঁর ওপরে না পড়ে একপাশ দিয়ে গড়াতে গড়াতে অপর একটি পাথরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে। সেই বড় পাথরের গা থেকে একটি ছোট্ট টুকরো এসে লেগেছিল শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর মাথায়। সামান্য আহত হয়েছিলেন তিনি। আঘাত পেয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন ইশারায়—সবই গঙ্গাজীর ইচ্ছে!

ভাগীরথীর তীর অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে আরো শুধু সন্ন্যাসীর দর্শন হবে। তাঁরাও প্রতিদিন ভাগীরথী দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, অবগাহন করেন প্রতিদিন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে দর্শন করবার পরই কিন্তু দর্শন করতে হবে অবধূত রামানন্দজীকে। তিনিও উলঙ্গ সন্ন্যাসী, তবে মৌনী নন। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ। দর্শনার্থীদের সঙ্গে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। ব্যস্ত হয়ে দৈনন্দিন পুজোর প্রসাদ দেন সবাইকে।

পুজোর প্রসাদ, চিনি বা মিছরি। মুঠো মুঠো করে দেন সবার হাতে হাতে। দর্শনার্থীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী ও গুণী সন্ন্যাসী। চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি, মুখে প্রশান্তির স্পর্শ। কোন কথা না বলে নীরবে বসে থাকতে ভালো লাগে। ধুনির আগুনের সামনে নীরবে বসে থাকেন তিনি। মুখে হাসি যেন ভরে থাকে।

অক্টোবর মাসের শেষটায় দীপাবলীর দিন গঙ্গোত্রীর মন্দির বন্ধ হয়। পুজারী ও পাণ্ডারা মুখুভা গ্রামে নেমে চলে যায়। গঙ্গার পুজো সেখান থেকেই চলে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে থাকে। শুষ্ক ঝোড়ো হাওয়া ছুটে আসে সোজা উত্তর দিক থেকে। সংগে সংগে বয়ে নিয়ে আসে সাংঘাতিক হিম প্রবাহ। গাছের পাতা ঝরে পড়তে শুরু করে। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় তুষারপাত শুরু হয়। সারাদিন, সারারাত, তারপর ক'দিন ধরে চলে তুষারপাত। চীর আর পাইন গাছের পাতায় পাতায় জমতে থাকে তুষারকণা। এমনি করে নভেম্বর শেষ হয়। দিন কয়েক কড়া রোদ থাকলেও জমানো তুষার কিন্তু গলতে চায় না। গংগোত্রী অঞ্চলের সব সন্ন্যাসী কুঠিয়া বন্ধ করে নীচে অবতরণ করতে শুরু করে। ধারালী পেরিয়ে সোজা গাঙ্নানী। কেউ কেউ নেমে যান উত্তরকাশী। গংগোত্রীর নির্জন পুরীতে অবস্থান করেন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী ও রামানন্দ অবধূত। দুজনই উলংগ। একজন মৌনী অপর জন নির্বাক নন। দুজনেই একদিন দেখতেন, ভাগীরথীর অপূর্ব পরিবর্তন। জলধারার উচ্ছল শব্দ যেন অবরুদ্ধ হয়ে যেতো। মেঘের ঘন আবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে সূর্যদেব উঁকি দিত। কুঠিয়ার ওপরে জমানো বরফ মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তো। কুঠিয়ার বারান্দায় বসে বসে দেখতেন দুজনই। কোন কথা না বললেও নীরবে অনেক কথা বলা হয়ে যেতো। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে সমস্ত অঞ্চল তুষারে ঢেকে যেতো। কুঠিয়ার ভেতরে ধুনির সামনে বসে বসে রামানন্দজী দেখতেন। কতগুলো ছোট ছোট পাখী যেন বরফে ঢাকা ভাগীরথীর ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে সোজা হাজির হতো রামানন্দজীর কুঠিয়ার সামনে। নরম তুষার কণার ভেতরে যেন ঢুকে পড়তো পাখীগুলো। ঠোঁট দিয়ে সুড়ংগর মতো বানিয়ে বেরিয়ে পড়তো নরম তুষারের ভেতর থেকে। মাঝে মাঝে বিশাল আকৃতির কাক এসে বসতো সামনে। রামানন্দজী রুটি টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতেন পাখীগুলোর সামনে। মাঝে মাঝে বড় আকৃতির কাঠবেড়ালী গুটিকয়েক হাজির হতো কুঠিয়ার সামনে। কাঠবেড়ালীগুলোর সারা গায়ে মসৃণ গাঢ় খয়েরী রঙের লোম, পেটের দিকটায় সাদা। রামানন্দ–

জীকে যেন চিনে ফেলেছিল ওরা। ভয় পেতো না তাই। কোন খাবার না পেলে এগিয়ে আসতো, ঢুকে পড়তো কুঠিয়ার ভেতরে নির্ভয়ে। রামানন্দজীর ধুনির পাশে বসতো এসে। বরফে ঢাকা ভাগীরথীর দিকে তাকিয়ে রামানন্দজী ভাবতেন স্বর্গগঙ্গার কথা। সেই স্বর্গগঙ্গার ধারা নেমে এসেছিল মর্ত্যে। রামায়ণে লেখা আছে যেসব কথা। গঙ্গার ধারাকে ভালোবেসে আরো একজন তরুণ সন্ন্যাসী বাসা বেঁধেছিলেন গঙ্গোত্রীতে। তাঁর নাম স্বামী সুন্দরানন্দ। দাক্ষিণাত্যবাসী এই তরুণ সন্ন্যাসী কেন এসেছিলেন দীর্ঘ পথ বেয়ে সুদূর গঙ্গোত্রীতে, সে খবর আমার জানা নেই। গঙ্গোত্রীতে কুঠিয়া বানিয়ে তিনি আশেপাশে দুর্গম অঞ্চল ভ্রমণ করতেন। তিনি গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখ, সেখান থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে তপোবনে। সেখানে তপোবনে একটি গুহার সামনে দর্শন পেয়েছিলেন একজন সিদ্ধপুরুষের। তাঁর নাম চিন্ময়ানন্দ মহারাজ। ১৯৫৭ সন থেকে তপোবনে গুহার মধ্যে তিনি অবস্থান করতেন বলে তাঁর সাধারণ পরিচয় ছিল তপোবন মহারাজ। তপোবন মহারাজ কেরলের অধিবাসী। সংস্কৃত ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে হিমালয়ের বহু দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অবস্হান করেছিলেন তপোবনে। 'হিমগিরি বিহার' বলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি বই রচনা করেছিলেন তিনি। তপোবনে স্বামী সুন্দরানন্দজী তাঁকে সেবা শুশ্রূষায় তুষ্ট করেছিলেন। কালক্রমে তিনি 'শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন তপোবন মহারাজের। সুন্দর সুগঠিত দেহ স্বামী সুন্দরানন্দজী। যোগ ব্যায়ামে বিশেষ করে আসনে তিনি ছিলেন পারদর্শী। দার্জিলিঙের পর্বত আরোহন সংস্হার সাহায্যে পর্বতারোহণ শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন পর্বত অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। '১৯৬০ সনে সেজকার সঙ্গে সুন্দরানন্দজী কালিন্দী খাল অতিক্রম করে পেঁছে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। গঙ্গা তীরে দীর্ঘদিনের অবস্হান, গঙ্গোত্রী হিমবাহের বিভিন্ন শাখা হিমবাহে পেঁছে গিয়ে সেই বিচিত্র ছবি তুলে আনা যেন তাঁর অদ্ভুত সাধনা। তাঁর অন্য কোন সাধনার কথা আমি জানি না। তিনি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কি না জানা নেই। গঙ্গাকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করবার আনন্দ তাঁর দেহমনকে ভরপুর করে রেখেছে। সুন্দরানন্দজীকে আমি কয়েকবার নন্দনবন ও তপোবনে দেখেছিলাম। গোমুখ থেকে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন একাধিক বার।

গঙ্গোত্রীতে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যতম নরহরি মহারাজ। তাঁর বয়স নব্বইয়ের ওপরে। গঙ্গোত্রী থেকে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন

ভুজবাসায়। দিন কয়েক অবস্থান করে গোমুখ দর্শন শেষে ফিরে আসতেন গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর আকর্ষণ, ভাগীরথীর আকর্ষণ। সর্বোপরি গঙ্গার আকর্ষণ পেরিয়ে আর কোথাও যেতে পারতেন না তিনি। তাঁকে আমি বারবার দেখেছি ভুজবাসায়। ভোর হতেই গোমুখ চলে যেতেন। যথেচ্ছ সময় অতিবাহিত করে আবার আসতেন। গঙ্গার কথা বলতেই মৃদু হাসতেন। জানতেন শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে—গঙ্গাজী আমার ধ্যান, গঙ্গাজী আমার জপতপ। ভাগীরথীর তীরে বসে বসে অবিরত জলাধারার কলকল ধ্বনি শুনতেন।

গঙ্গোত্রীতেই ভাগীরথীর তীরে বসবাস করেন অন্তর্যামী মহারাজ, মহেন্দ্র পুরী নাগা। উভয়েরই বয়স সত্তরেরও ওপরে। সর্বকনিষ্ঠ সন্ন্যাসী—অচ্যুতানন্দ স্বামী। গঙ্গোত্রীতে গৌরীকুণ্ডের পাশেই বসবাস করতেন স্বামী অদ্বৃজানন্দ। বর্তমানে তিনি অবশ্য উত্তর কাশীতে বসবাস করেন। গঙ্গোত্রী থেকে চীরবাসায় যাবার পথে মাইল খানেক দূরে কুঠিয়া বেঁধে বাস করেন গঙ্গাদাসজী ফলাহারী ও হংসানন্দতীর্থ। হংসানন্দতীর্থ মৌনী সন্ন্যাসী।

গঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথীর তীর ধরে গোমুখ যাবার পুরনো পথের প্রথম ধর্মশালা চীরবাসা। সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলে ভৃগু গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি রয়েছে কয়েকটি কুঠিয়া। সেখানে বাস করতেন উলঙ্গ সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাস মহারাজ। তার কাছেই গুরুদেও দাসজী ও রঘুনাথ দাসজীর কুঠিয়া। তারো সামান্য দূরে কৃষ্ণা ভারতীর কুঠিয়া।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের পথ আর তেমন দুর্গম নয়। অর্ধেক পথ পেরুতেই চীরবাসা। ভাগীরথীর ওপর রয়েছে পুরনো পরিত্যক্ত ধর্মশালা। নদীর ধার দিয়ে পায়ে চলা অতি প্রাচীন যুগের পথের রেখা। সে যুগের পথ ছিল দুর্গম ও বিপজ্জনক। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের কাছে এই পথ ছিল অগম্য। পুণ্যার্থীরা মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতো সে যুগের তীর্থ গঙ্গার উৎস স্থলে। কিন্তু এই দুর্গম পথের মাঝেই কুঠিয়াবাস করতেন সাধু সন্ন্যাসীরা। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নিস্পৃহ তাঁরা। ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, ধ্বস নামা, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যা কিছু দুর্যোগ, সবই তাঁরা লক্ষ্য করতেন। সব কিছুকেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করে কাল অতিবাহিত করতেন। গঙ্গার উচ্ছ্বাস আর কলধ্বনি তাঁদের সব কিছু ভুলিয়ে রাখতেন।

চীরবাসা পেরিয়ে আরো এগিয়ে গেলেই ভুজবাসা। চীর আর পাইন গাছগুলোর ভিড় হাল্কা হতে হতে সর্বশেষ বৃক্ষসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা

ভুজগাছ দেখেই হয়তো এমন নামকরণ হয়েছিল সেখানকার। ভুজগাছের ছায়ার তলায় ভুজবাসা। সেখান থেকে গোমুখ প্রায় আড়াই মাইল বা চার কিলোমিটার দূরে। ভুজবাসায় লালবেহারী সন্ন্যাসীর কুঠিয়া। ভাগীরথীর উৎসের কাছাকাছি বেশ প্রশস্ত উপত্যকার মাঝখানে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কুঠিয়া যেন অপরূপ ধর্মশালা। ওপরে ভুজবাসা ধরের গিরিশিরার গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনার মুখে একটা নল লাগিয়ে লালবেহারীজীর কুঠিয়া পর্যন্ত জল আনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য। সামনেই পুব দিকটায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ। দূর থেকে বরফ দেখা যায় না। মনে হয়, ধূসর রঙের অজস্র ছোট বড় পাথরের স্তূপ। সেই পাথরের স্তূপের শেষ প্রান্তে গুহা, সেখান থেকে নির্গত জলধারা সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করে। পাথরের স্তূপগুলোর পেছনেই ভাগীরথী পর্বতমালা। ক্লান্ত তীর্থযাত্রীরা যেন চোখ মেলে স্বপ্ন দেখে। গোমুখ দেখতে পায়। ভুজবাসা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে স্বাভাবিক ভাবে চললে। গঙ্গা গোমুখ থেকে নির্গত হয়েছে, এ তথ্য সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বরফের গুহা থেকে নির্গত হয়েছে জলধারা। মন্দির নেই, পূজারী নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যেন অনন্তকালের বিশাল গুহামন্দির। নদীর কলকল ধ্বনি অহরহ স্তুতি করে। চারপাশে ছড়ানো এনাফেলিস আর এপিলোরিয়াম ফুল তাঁর পুজোর আয়োজন করে। তুষারময় স্বর্গগঙ্গা যেন পুণ্যার্থীদের প্রার্থনায় দ্রবীভূত। করুণাঘন জলধারা প্রবাহিত হয়েছে মর্ত্যের মানুষের মুক্তির জন্য। চিরন্তন ক্ষুধা থেকে মুক্তি, অভাব, অভিযোগ, দুঃখ বেদনা থেকে মুক্তি। সব কিছু থেকে মুক্তির জন্য অপরূপ সঞ্জীবনী সুধা।

গঙ্গোত্রী মন্দির দর্শনের জন্য যত তীর্থযাত্রীদেব সমাগম হয়, তার এক চতুর্থাংশের চাইতেও কম যাত্রী দেখা যায় গোমুখ দর্শনের জন্য। গোমুখ তীর্থযাত্রীদের কাছে লালবেহারীজী অত্যন্ত পরিচিত আপনজন। কর্কশ ও নীরস কণ্ঠ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলেন। ১৯৬৬ সনে গঙ্গোত্রীতে দিন কয়েক কাটাবার পর ভুজবাসায় এসেছিলাম। দিন তিনেক ছিলাম সেখানে। লালবেহারী বড় কুঠিয়ায় নয়। অদূরেই ভুজগাছ। সেই ভুজগাছের তলায়, গাছের ডাল আর ছাল দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট কুঠিয়াতে বাস করতাম। সন্ধ্যার পরই হিমশীতল প্রবাহ যেন নেমে আসতো কুঠিয়ার চারপাশে। ভাগীরথী থেকে বালতি করে জল এনে রাখতেই আধঘণ্টার মধ্যেই জমতে শুরু করতো। কুঠিয়ার দরজা জানলা ছিল না। তাই প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ যেন বিনা বাধায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তো কুঠিয়ার ভেতরে। হাত পা জমে যেতে চাইত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়।

অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসায় এসে কোনমতে রাত্রিবাস করেই পরদিন সকালে গোমুখ দর্শন করতো। তারপর সেখান থেকে সোজা নেমে যেতো গঙ্গোত্রী। আবার নতুন তীর্থযাত্রীর দল এসে ভিড় করতো। বড় কুঠিয়ার ভেতরে আশ্রয় নিতো সবাই। কুঠিয়ায় চাল, ডাল, আটা, জ্বালানী কাঠ আর কেরোসিন তেল মজুত থাকতো। কম্বল থাকতো জমা করা। তীর্থযাত্রীদের তিনি যে শুধু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আশ্রয় দিতেন তাই নয়। পরম আত্মীয়ের মতো ক্লান্ত যাত্রীদের বসিয়ে দিতেন আগুনের পাশেই। গেলাস ভর্তি গরম চা বা কফি দিতেন, সেই সঙ্গে সেদ্ধ আলু অথবা সদ্য ভাজা পকৌড়ি। তারপর সন্ধ্যা ঘোর হতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যখন তীর্থযাত্রীরা কুঠিয়ার ভেতরে যাবার চেষ্টা করতো, লালবেহারী চীৎকার করে উঠতো—অন্দর-মে মৎ যাও। বাহার মে বৈঠো। আগ হ্যায় ইধর, গরম খানা বনু গিয়া। খানা খাও, ইসকা বাদ্ অন্দরমে যাকে আরাম করো।

ঠাণ্ডা আর উচ্চতা জনিত কষ্টে ক্লিষ্ট যাত্রীদের যত্ন করে রুটি আর আলুর সব্জী তুলে ধরতেন ক্ষুধার্ত সবার মুখের সামনে।

সেবারকার ভুজবাসার স্মৃতি আমার স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেই ছোট্ট কুঠিয়া থেকে কয়েক পা এগুলেই ভাগীরথীর জলধারা। সূর্য উঠতেই সোনালী রঙে রঞ্জিত ভাগীরথী পর্বতমালা আমার দু চোখকে যেন মুগ্ধ করতো। সূর্যের আলো এগিয়ে আসতো সুউচ্চ গিরিশিরার ওপরে। ভাগীরথীর ওপারের গিরিশিরা, তার মাথায় মন্দা পর্বত[১]। মন্দা পর্বতের পূর্বে গিরিশিরার ওপর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিবলিঙ্গ পর্বত। পশ্চিমে অদূরেই ভৃগু পর্বত[২]। ভুজবাসা থেকে বেরিয়ে পড়তাম ভোরবেলায়। গোমুখ দর্শন করে ওপরে উঠে যেতাম গঙ্গোত্রী হিমবাহে। হিমবাহ পেরুলেই তপোবন। তপোবনের গোড়াতেই গুহা রয়েছে। সেই গুহার পাশ দিয়ে বয়ে যেতো ক্ষীণ জলধারা। আর সেই জলধারার দু'পাশে প্রিমুলা ফুলের ভিড়। জলধারার পাশ দিয়ে ঘাসের গায়ে এপিলোবিয়ামের গাঢ় গোলাপী ফুল চারদিক যেন আলো করে থাকতো। সেপ্টেম্বর মাসেই সেখানে দেখা যেতো জেনসিয়ানার নীল ফুল। ঐ গুহার মধ্যে বেশ কয়েক বছর বাস করেছিলেন চিন্ময়ানন্দ মহারাজ। তাঁকে সবাই বলতো তপোবন মহারাজ। ১৯৫৭ সন থেকে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেতো। তপোবন মহারাজের

১. মন্দা পর্বত ২১৩৬০ ফুট

২. ভৃগু পর্বত

মধ্যে। ১৯৬০ সনে বিষ্ণুদাস মহারাজ তপোবনে স্থায়ী বসবাস করতে এসেছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ১৯৬০ সনে দেহান্তর পর বিষ্ণুদাস মহারাজ মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন সেই গুহার তপোবনে এসেছিলেন রামচরণ দাস। তাঁর পরিচিত নাম ছিল সিমলা মহারাজ। ১৯৬০ সনে শঙ্করপুরী এসে তপোবনে বসবাস করতে শুরু করেছেন। শুনেছি, সিমলা মহারাজ ও শঙ্করপুরী এই দুজন সন্ন্যাসীই বর্তমানে তপোবনে অবস্থান রত। তবে তপোবন মহারাজই সম্ভবত বেশ কিছুকাল তপোবনের গুহায় বসবাস করতেন বলেই হয়তো বা এমন ধরনের নামকরণ হয়েছিল। মাথার ওপর সাক্ষাৎ শিবের আলয় শিবলিঙ্গ পর্বত, ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপারে ভাগীরথী পর্বতমালা। যেন মহাদেবকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে তপস্যারত মহর্ষি ভগীরথ। অনন্তকালের সুদীর্ঘ তপস্যায় মহর্ষির শিলীভূত দেহ ভাগীরথী পর্বতমালা। অদূরেই কেদারনাথ পর্বত। তপোবন মহারাজ হয়তো বা ভাবতেন—গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে নিঃসারিত হয়েছে। সেই মহাদেবের অবস্থান এই তপোবনে। এই তো অপরূপ পবিত্র সিদ্ধ পীঠস্থান। সাধন ভজনের জন্য এমন অপরূপ পরিবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে? গুহার ওপরে পাথরের ঢাল পেরিয়ে ওপরে গেলেই শিবলিঙ্গ পর্বতের গিরিশিরার গায়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে। সেখানে অপরূপ ফুল যেন কমল। গুহার একধারে হলদে রঙের এক জাতীয় কম্পোজিটা ফুল। আর কম্পোজিটার কাছেই এনাফেলিস ফুল। ফুলের বৃন্ত ও গাছের ডগায় মসৃণ রেশমের মতো আঁশ। শীতের বরফ থেকে আত্মরক্ষার অপরূপ পোশাক।

তপোবন মহারাজের অবর্তমানে গুহা প্রায় শূন্য ছিল। ভুজবাসার নীচে ভাগীরথী ও ভৃগুগঙ্গার সঙ্গমস্থলের কাছেই ছিল বিষ্ণুদাস মহারাজের কুঠিয়া। সিদ্ধ পুরুষ বিষ্ণুদাস মহারাজের কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছিলেন লালবেহারীজী। অনন্ত ১৯৫২-১৯৬০ সনে তপোবনে গুহায় কোন সন্ন্যাসী বাস করতেন না। তারপরই বিষ্ণুদাস মহারাজ কুঠিয়া ত্যাগ করে চলে যেতেন তপোবন। বেশ কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করবার পর শীতের শুরুতেই নেমে আসতেন তাঁর পুরনো কুঠিয়ায়। হয়তো বা ভাগীরথীর জল কল্লোলের স্মৃতি ভেসে উঠতো মানসপটে। কিংবা ভৃগুগঙ্গার অস্ফুট গুঞ্জন তাঁকে ডেকে আনতো তপোবন থেকে। দেখতে দেখতে শীত এসে হানা দিত। নীল আকাশ ঢেকে যেতো গাঢ় মেঘে। শুরু হত তুষারপাত। দিনের পর দিন তুষারপাত সেই সঙ্গে একটানা তুষার ঝড়। কুঠিয়ায় বসে বসে দেখতেন বিষ্ণুদাস। চারদিকে শুভ্রতার অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে স্তূপীকৃত বরফ। ভৃগু-

গঙ্গার ক্ষীণ কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যেতো শেষটায়। ভাগীরথীর নীলাভ জলধারার উজ্জ্বলতা জমাট হয়ে যেতো। সাংঘাতিক হিমপ্রবাহে বুঝি ভাগীরথীর কলকণ্ঠ নীরব ও নিথর হয়ে যেতো। বিশ্ব প্রকৃতিও বুঝি ঘন বরফের আবরণে যেতো ঘুমিয়ে। মাঝে মাঝে বজ্র নির্ঘোষে হিমানী সম্প্রপাত নেমে আসতো ভৃগু পর্বতের গা থেকে। প্রকৃতির এমনি অপরূপ সৃষ্টি ও ধ্বংসের চিত্র দর্শন করতেন বিষ্ণুদাস মহারাজ। বরফে স্তূপ জমতে জমতে কুঠিয়াও যেন ঢেকে যেতো। এই বরফই তো স্বর্গ-গঙ্গার সঞ্চিত বারি রাশি।

ভৃগুগঙ্গার দুধারেই বেশ কিছুটা স্থান সমতল। এপ্রিল মাসের শুরুতে শীতের বরফ গলতে থাকে। বরফ গলা জলে সিক্ত মাটির বুকে জেগে উঠতো সোনালী ঘাস। জলের ধারে ধারে নরম মাটির বুকে অসংখ্য ফুল ফুটে উঠতো। প্রজাপতি আর মৌমাছির ভিড় দেখতেন বিষ্ণুদাস। কুঠিয়ার স্বল্প পরিসর স্থানে, আলু, রাই, মুলোগাছ লাগাতেন। সভ্য ও যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের সঙ্গ পরিহার করে কুঠিয়া বেঁধেছিলেন দুর্গম স্থানে। নির্জনে ঈশ্বরের নাম করতেন আর শ্রবণ করতেন ভাগীরথীর সংগীত। ১৯৬০ সনে শীতের বরফ গলতেই বিষ্ণুদাস মহারাজ দুজন শিষ্য সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তপোবন। স্থির করেছিলেন, তপোবনে গুহাতেই বসবাস করবেন সারা বৎসর। তাই প্রয়োজন বোধে জ্বালানী কাঠ ও কেরোসিন তেল মজুত করেছিলেন। আবশ্যকীয় খাদ্যবস্তু আনিয়েছিলেন দুই শিষ্যকে নীচে পাঠিয়ে। এমন করে সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতেই অক্টোবর মাস এসেছিল। সেই সময় তপোবন অঞ্চলে পর্বতারোহীদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। সর্বশেষে একদল সামরিক অভিযাত্রী শিবির স্থাপন করেছিল তপোবনের কাছেই। হঠাৎ একদিন অভিযাত্রীদের একজন বিষ্ণুদাস মহারাজের কাছে কেরোসিন তেলের অভাবের কথা জানিয়েছিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাস মহারাজ জানতেন—তুষার সীমার ওপরে বসবাস করতে হলে জ্বালানী ও খাদ্যবস্তু না থাকলে সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। মজুত ভাণ্ডার কমতে শুরু করলে, আর হাওয়া খারাপ হলে নীচে অবতরণ করে কোন কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। বিষ্ণুদাস মহারাজ এসব জানতেন। শীতে ও বর্ষায়—প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছিলেন তুষার সীমার ওপরে। সব কিছু জেনেও তিনি বিনা দ্বিধায় প্রাণস্বরূপ জ্বালানী কেরোসিন তেল তুলে দিয়েছিলেন অভিযাত্রীদের হাতে। অভিযাত্রীরা আশ্বাস দিয়েছিল, গোমুখেই তাদের মজুত ভাণ্ডার রয়েছে। নীচে পেঁছেই প্রচুর কেরোসিন তেল পেঁছে

দেবে তপোবনে। অভিযাত্রীরা পরদিনই চলে গিয়েছিল গোমুখে। তার পরদিন, সেখান থেকে সোজা নেমে গিয়েছিল গঙ্গোত্রী। তপোবনে কেরোসিন তেল পেঁছে দেবার দায়িত্বের কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল তারা। এর তিন চারদিন পর তুষারপাত শুরু হয়েছিল। তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল সাংঘাতিক তুষার ঝড়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকটায় এ-ধরনের তুষারপাত ও তুষার ঝড় প্রায় বছরই হয়। বিষ্ণু-দাস ভেবেছিলেন—এ-ধরনের তুষারপাত ও ঝড় থেমে যাবে দুদিনেই। খুবই সামান্য কেরোসিন তেল ছিল তাঁর কাছে। তুষার ঝড়ের দাপট কিন্তু অব্যাহত ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, হিমশীতল ঝোড়ো বাতাস, এমন মারাত্মক পরিবেশে বিষ্ণুদাস হয়তো বা অবিচলিত থাকতেন। কিন্তু বিপদ হয়েছিল তাঁর শিষ্য দুজনের জন্য। তাদের অনভ্যস্ত পরিবেশ, স্বল্প শীতবস্ত্র, নগ্ন পা, এই অবস্থায় গুহার বাইরে বেরুনো সম্ভব হচ্ছিল না। জ্বালানীর অভাব, তার ওপর বরফ গলিয়ে পানীয় ও খাদ্য বানানো হয়েছিল অসম্ভব। দুর্বল হতে শুরু করেছিল দিনের পর দিন। বিষ্ণুদাস মহারাজ সত্যি-সত্যি ভয় পেয়েছিলেন। অবশ্য নিজের জন্য নয়। তাঁর শিষ্য দুজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। তুষার ঝড় বন্ধ না হলে গুহার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শোচনীয় মৃত্যু ঘটবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে। হাত পা অসাড় হতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে যাবে শেষটায়। ভেবেই হয়তো শিউরে উঠেছিলেন মারাত্মক ভয়ে। নীচে থেকে কোন সাহায্য আসবে না জেনেই ব্যাকুল হয়েছিলেন। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য দুজন শিষ্যকে নিয়ে অবতরণ করতে শুরু করে-ছিলেন প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যেই। নগ্ন পা, স্বল্প শীতবস্ত্র, অনাহার, অনিদ্রায় ক্লান্ত তিনজন মানুষ বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে করতে বরফের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছিলেন। নীচে ভূগুগঙ্গার কাছে পুরনো কুঠিয়াতে রয়েছে নির্ভরশীল আশ্রয়, পর্যাপ্ত জ্বালানী ও খাদ্যবস্তু। যেমন করেই হোক নীচে পেঁছুতে পারলেই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কিন্তু সাংঘাতিক তুষার ঝড়ের মধ্যে নরম বরফের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে অবতরণ করেছিলেন। কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের পা দুটো অসাড় হতে চলেছে। তাঁদের গতি মন্থর হতে মন্থরতর হতে চলেছিল। গোমুখের প্রায় কাছাকাছি এসে বিষ্ণুদাসের একজন শিষ্য যেন পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন নরম বরফের ওপরেই। কোন কিছু ভাববার পূর্বেই ভয়ে বিস্ময়ে বিষ্ণুদাস মহারাজ দেখেছিলেন, শিষ্যটি নরম বরফের ভেতরেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার চোখ মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। প্রাণহীন দেহ

বরফের ভেতরই রেখে অপর শিষ্যকে সঙ্গে করে নিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণুদাস মহারাজ। সারাদিন একটানা অবতরণ করেছিলেন তুষার ঝড়ের মধ্যেই। বিকেল হতেই তুষার ঝড়ের দাপট কমতে শুরু করেছিল। অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছিল চারদিক থেকে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের তাপমাত্রা নেমে যেতে আরম্ভ করেছিল। অসাড় দেহ নিয়ে বিষ্ণুদাস মহারাজ শিষ্যকে পথ দেখিয়ে এগুতে এগুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন একটি পাথরের আড়ালে। তুষার ঝড়ের ঝাপটা লাগছিল না সেখানে। আর এগুতে পারছিলেন না তাঁরা। সেই পাথরের আড়ালে বসেছিলেন দুজন। হঠাৎ এক অস্ফুট শব্দে চমকে উঠেছিলেন বিষ্ণুদাস। দেখেছিলেন—তাঁর শিষ্য পাথরের ধারেই স্বল্প পরিসর স্থানটিতেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেহ নীল হয়ে গিয়েছিল। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলেন তিনি। বিষ্ণুদাস মহারাজ অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মর্মান্তিক মৃত্যুকে।

আরো দুদিন তুষারপাত হবার পর পরিষ্কার হয়েছিল আকাশ। রৌদ্রের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। ভুজবাসা থেকে লালবেহারীজী ব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর গুরুদেব, দুজন শিষ্যসহ তপোবনে অবস্থান করছেন। বহু কষ্টে নরম বরফের ঢাল বেয়ে যাত্রা করেছিলেন তপোবনের দিকে। কিন্তু কাছেই পাথরের আড়ালে দেখতে পেয়েছিলেন বিষ্ণুদাস মহারাজকে। বিষ্ণুদাস দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে বসেছিলেন পাথরের গায়ে। তাঁর দেহ ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পাশেই একজন শিষ্যের মৃতদেহ পড়েছিল। শিষ্যের মর্মান্তিক মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছিলেন। দু'হাত দিয়ে বন্ধ করেছিলেন চোখ দুটো। মৃত্যু অন্ধ, কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণ নিয়ে যাবার সময় মৃত্যু যেন এসেছিলেন দু চোখ মেলেই।

তপোবন থেকে গোমুখ মাইল পাঁচেক দূরত্ব হতে পারে। দূরত্ব অনুমান করতে হয়। দুর্গম পথ বলে সময় লাগে সমস্ত পথ পেরুতে। ভুজবাসা থেকে খুব ভোরবেলায় রওনা হলে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে যেতো। ঘণ্টা ছয়েক সময় যেতে। অবশ্য ভুজবাসায় ফিরে আসতে সময় লাগতো ঘণ্টা চারেক। সন্ধ্যা নেমে আসতেই হিমপ্রবাহ যেন দ্রুত নেমে আসতো। স্টোভ জ্বালিয়ে খাবার বানিয়ে ফেলতাম দ্রুতবেগে। খানা শেষ করেই বসতাম লালবেহারীর পাশেই ধুনির আগুনের সামনেই। লালবেহারীজীর পাশেই বসতো আর দুজন সঙ্গী ব্রহ্মচারী। গঙ্গার গল্প শুনতাম। ভাগীরথীর কথা আর গোমুখ, তপোবন, শিবলিঙ্গ…লাল-

বেহারীজী এক নাগাড়ে গল্প করে যেতেন। গঙ্গার উৎস গোমুখ। এই গোমুখ সুদূর অতীতে ছিল গঙ্গোত্রীতে—ঠিক গৌরীকুণ্ডে। লালবেহারীজী এক কথাই শুনেছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে। তাঁর গুরুদেব হয়তো এই তথ্যই জানতেন। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে এমনি তথ্য প্রচারিত হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকাল থেকে। এই গঙ্গার পবিত্র উৎস দর্শনের উদ্দেশ্যে অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা আসতেন। নানা গল্পের ফাঁকে ব্রহ্মচারী দুজন বলতেন দুঃখ করে—এবার খুবই কম মূর্তির দর্শন হয়েছে বাবা! বুঝেছিলাম—গোমুখের যাত্রী সংখ্যা তেমন হয় নি। লালবেহারীজীর আশ্রমে খুব কমই যাত্রী এসেছিল।

দিনকয়েক ভুজবাসায় অতিবাহিত করবার পর সেবার আমি সঙ্গীদের নিয়ে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম সবার কাছ থেকে। লালবেহারী ও তাঁর সঙ্গী ব্রহ্মচারী দুজনের চোখ মুখ করুণ হয়ে উঠেছিল। এক সময় বলেই ফেলেছিল—তোমরা চারমূর্তি তিনদিন কাটালে, কিন্তু সেবা করতে দিলে না। এ বড়ি আফশোষ্ কি বাত্। পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লালবেহারী বলেছিল হাত ধরে—ফির আওগে!

আমি হেসেছিলাম—সন্ন্যাসীদের এত মায়া ভালো নয়।

লালবেহারী কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতেন—আমি তো সন্ন্যাসী নই বাবা!

—তবে তুমি কি?

—গঙ্গামাঈই কী সেবায়েত।

—কি বলছো?

—সাচ্ বাত্! আমি দিনরাত গঙ্গা দর্শন করি, গঙ্গা স্পর্শ করি। গঙ্গার জল পান করি প্রতিদিন গঙ্গাজী তো আমার এতো কাছে! কিন্তু গঙ্গা দর্শনের জন্য যে সব তীর্থযাত্রী কঠিন পথ পেরিয়ে আসেন, তাঁদের দর্শন করা, সেবা করার ভেতর দিয়েই আমাদেরও গঙ্গার সেবা করা হয়। পথের বাঁকে লালবেহারীর হাসি মিলিয়ে যায়। আমরা আবার ভাগীরথীর পথ ধরে নামতে শুরু করতাম।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপারে নন্দনবন থেকে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ভুজবাসায়। নীচে লালবেহারীজীর আশ্রম দেখা যাচ্ছিল। ওপর থেকে দেখেই লালবেহারী চীৎকার করে ডাকতে শুরু করেছিলেন। বাধ্য হয়ে নীচে নেমে গিয়েছিলাম। আশ্রমে পৌঁছেই লালবেহারী চীৎকার করে গালিগালাজ শুরু করেছিলেন—ক্যা, তুম লাট সাহেব বন্ গয়া! লোটাভর চা বানায়া। গঙ্গাজীকি পানিমে ডাল দেউঙ্গা।

আমি বাধা দিয়ে বোঝাতে চাইছিলাম। লালবেহারী দারুণ অভিমানে বলেছিলেন—তোমাদের চা নিতে হবে না। ইধর বৈঠনে কা জরুরৎ নেহী। ভাগো হিঁয়াসে।

গরম চা ভর্তি লোটা কেড়ে নিয়ে আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছিলাম। কাছেই বানানো খিচুড়ি, ওঁকে না জিজ্ঞাসা করেই তুলে নিয়ে খেতে শুরু করেছিলাম।

লালবেহারী তারস্বরে চীৎকার করেছিলেন—খবরদার, এ খানা খাবে না।

অভিমান ভাঙাতে হয়েছিল। আন্তরিকতার আতিশয্যে মুগ্ধ হতাম। গম্ভীর হয়ে লালবেহারী বলতেন—গঙ্গামায়ীর কাছে এসেছো। তোমাদের সেবা করতে দেবে না এ ক্যা বাত্ ? ওঁর দুচোখ করুণ হয়েছিল—দেখো, দিন ভর কৌ মুর্তি ইধার নেহী আয়া।

আরো কতবার গিয়াছে গঙ্গোত্রী, গোমুখ। গৌরী গঙ্গার উৎস দর্শন করতে গিয়েছি ছুটে। গিয়েছি অলকানন্দার উৎসের দিকে, পিন্ডার গঙ্গা, মন্দাকিনী—এমনি গঙ্গার অজস্র ধারার পথ অনুসরণ করে গিয়েছি হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে। সর্বশেষে ফিরে এসেছি গঙ্গোত্রী। সেই হাসি হাসি মুখ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর, রামানন্দ অবধূত, সারদানন্দজী, গঙ্গাদাসজী নরহরি মহারাজ। সবাই হেসেছেন—গঙ্গাময়ীর কাছে এসেছো ? আসবেই তো, এই তো সাক্ষাৎ গঙ্গা গঙ্গা মা, স্বর্গগঙ্গা। স্বর্গ থেকে নেমে আসা পবিত্র সুরধনী ! সেবার গোমুখ থেকে সোজা নেমে যাচ্ছিলাম গঙ্গোত্রী। ভুজবাসার কাছে আসতেই লালবেহারীজী চীৎকার করে ডেকেছিল—নেমে এসো চা বন্ গয়া।

পথ থেকে আশ্রমে নেমে যেতে হবে শ চারেক ফুট। ওপর থেকে ইশারায় জানিয়েছিলাম নামতে পারবো না, তাড়া আছে, সোজা নেমে যাবো গঙ্গোত্রী।

লোটাভর্তি গরম চা নিয়ে লালবেহারীজী তরতর করে চড়াই ভেঙে এসেছিলেন—এ ক্যা বাত, মেরা কসুর, বাতাও ?

—কুছ নেহী। লজ্জিত হয়ে আবার লোটা নিয়ে নেমে গিয়েছিলাম। ওর সংগী দুজন খুব খুশী। বহুদিন পরে যেন সেই চিরপরিচিত মূর্তি এসেছে সেবা করবার সুযোগ দেবার জন্য। ধুনির পাশে বসেছিলাম। অবাক হয়ে দেখেছিলাম ওঁদের হাসিমুখ। ওরা কি সাধন ভজন করেন, জানি না। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন কিনা জানা নেই।

গঙ্গাকে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসেন সেই সব পথযাত্রী যাঁরা গঙ্গার উৎস দর্শনের আশা উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে আসেন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে।

॥ ৬ ॥

বিসসর্জ ততো গঙ্গা হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে॥
হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গা শিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চেতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীন্তু দিশং শুভা॥
সপ্তমী চান্বগাতাসাঃ ভগীরথ রথন্তদা।
ত্রীন্ পথো ভাবন্তীতি তস্মাত্ ত্রিপথগা স্মতা॥ (রামায়ণ)

গঙ্গোত্রীর মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথীর তীরে বসে বসে অজস্র প্রশ্ন জাগে আমার মনে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নরহরি মহারাজকে আমার অদ্ভুত ভালো লাগে। গঙ্গোত্রীর তিনি প্রাচীন সন্ন্যাসী। তাঁর বয়সের সঠিক হিসাব আমার জানা নেই। তবে বয়সের ভারে তিনি ন্যুজ। বালক-সুলভ সারল্য তাঁর চোখমুখে। গঙ্গার কথা বলতে বলতে তাঁর দুচোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাগীরথীর জলধারা তিনি কতকাল ধরে দর্শন করেছেন, তবু দর্শনের আশা মেটে নি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় ভাগীরথীর বিচিত্ররূপ দর্শন করেন। তাঁর কাছে বসে বসে গঙ্গার কথা শুনি। যেই গঙ্গা সেই ভাগীরথী। একই ধারার নানা নাম। গঙ্গোত্রী থেকে মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে চলে যান ভুজবাসায়। সেখানে লালবেহারীর আশ্রমে দিনকয়েক অবস্থান করেন শুধু প্রতিদিন গোমুখ দর্শন করবার উদ্দেশ্যে। ভোর হতেই চলে যান গোমুখ। বরফের গুহার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন বিস্ময়ভরা চোখ মেলে। সেই বিশাল গুহার ভেতর থেকে কলকল শব্দে নির্গত হয় উদ্দাম জলরাশি। কোথা থেকে আসে এই জলরাশি, কোথায় সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার? গুহার ভেতরে অনেক দূর দেখা যায়, ভেতর থেকে যেন মৃদু গুরুগুরু ধ্বনি। অস্ফুট কণ্ঠে নরহরি মহারাজ

বলেন—পতিত পাবনী গঙ্গা। নীলাভ বরফের গুহা থেকে নির্গত গঙ্গার পবিত্র ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

গঙ্গার উৎস, গতিপথ সব কিছুরই বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় প্রথম রামায়ণে। রামায়ণের পরেই গঙ্গার বিবরণ দেখা যায় পুরাণে। সমস্ত পুরাণের রচনাকাল একই সময় না হলেও তথ্যগত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় সবগুলোর মধ্যেই। গঙ্গার সৃষ্টি রহস্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বায়ু পুরাণে ও মৎস্য পুরাণে। গঙ্গার গতিপথ সম্পর্কে বায়ু পুরাণে[১] লেখা আছে হাজার হাজার পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে, শত শত উপত্যকা, হাজার হাজার বনভূমি ও শতাধিক গুহা পেরিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার পর গঙ্গা অবশেষে পতিত হয়েছে দক্ষিণ সাগরে। মৎস্য পুরাণে[২] গঙ্গার দীর্ঘ গতিপথ সম্পর্কে বলা হয়েছে—গঙ্গা, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপ, গ্রামক, কিম্পুরুষ, নর, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভারত, পাঞ্চাল, কৌলিক, মাগধ, ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এইসব জনপদ পবিত্র করেছে। এই গঙ্গা বিন্ধাচল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে দক্ষিণ সাগরে। প্রায় যোজনখানেক প্রশস্ত পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়েছে গঙ্গা। এই শাখাগুলোর বিভিন্ন পরিচয় রয়েছে। অন্য যে কোন পরিচয়ই থাকুক না কেন, মূলতঃ এগুলো গঙ্গা নামেই পরিচিত।

বিভিন্ন পুরাণে[৩] গঙ্গার কথা লেখা আছে, গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে বিশদভাবে। বায়ু পুরাণে ৪৭ অধ্যায়ে ও মৎস্য পুরাণে ১২১ অধ্যায়ে "গঙ্গা অবতার" বর্ণনা করা হয়েছে একই ভাবে। বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গার উৎস, গতিপথ ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার উৎস ও অন্তিম গতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল রামায়ণের বালখণ্ডে। মহাভারতের বনপর্বে রামায়ণের কাহিনীরই

---

১. বায়ু পুরাণ ৪২ অধ্যায় পৃঃ ৩৪-৩৮

২. মৎস্য পুরাণ ১২১ অধ্যায় পৃঃ ৩৬০

৩. ভাগবত পুরাণ ১৭ ও ৪২ অধ্যায়।
বায়ু পুরাণ ৪২, ৪৭ ও ৯২ অধ্যায়।
মৎস্য পুরাণ ৯০ ও ১২১ অধ্যায়।
বিষ্ণু পুরাণ ১৭ অধ্যায়।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯০ অধ্যায়।
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১১ অধ্যায়।

সংক্ষিপ্তসার দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত "গঙ্গা অবতার" অবশ্য রামায়ণের কাহিনীর অনুরূপ বলা চলে না। কোন কোন তথ্যবিদ্ মনে করেন, রামায়ণ রচিত হয়েছিল মহাভারতেরও পূর্বে। পুরাণ অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালের রচনা।

'গঙ্গা অবতার' বর্ণনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা ও তার উত্তরে হেমকূট পর্বতমালার কথা। গঙ্গার উৎস এই হিমালয় ও হেমকূট পর্বতমালার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বায়ু পুরাণে এইসব পর্বতমালার ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালার পার্শ্বদেশে কৈলাস নামে এক বিশাল পর্বতমালা অবস্থিত রয়েছে। এই পর্বতমালার পাদদেশে শরৎকালীন মেঘের মতো বর্ণবিশিষ্ট পবিত্র সুখশীতল জল উদ্ভূত হয়েছে। সেই পবিত্র জল সঞ্চিত হয়ে মন্দা নামে পবিত্র জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে। এই পবিত্র জলাধার মন্দা হতেই উদ্ভূত হয়েছে শুভ প্রদায়িনী মন্দাকিনী নামে দিব্য নদী। দিব্য নদীর তীরভাগে সৃষ্ট হয়েছে এক বৃহৎ মনোরম নন্দনবন। পুরাণকারের বর্ণনা অনুসারে মনে হয় কৈলাস পর্বতের হিমশীতল স্বচ্ছ জলের প্রস্রবণ থেকেই উৎসারিত জলধারা ঢালু পথে প্রবাহিত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে একটি সুদৃশ্য হ্রদে। সেই হ্রদের নাম মন্দা। মন্দা থেকেই নির্গত হয়েছে পবিত্র মন্দাকিনী নদী।

বর্তমান ভূগোলে অবশ্য কৈলাস পর্বতমালায় মন্দা নামে কোন হ্রদ বা মন্দাকিনী নদীর দর্শন পাওয়া যাবে না। তবে কোন কোন ভূগোল বিজ্ঞানী মন্দাকিনী নদীকে জঙ্ চু্য বলে মনে করেন। কৈলাস পর্বতের পাদদেশ থেকে তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে। সেই জলধারাগুলোর নাম যথাক্রমে স্বা চু্য, উমা চু্য ও জঙ্ চু্য। জঙ্ চু্য গৌরী কুণ্ড থেকে নির্গত হয়েছে। এই গৌরীকুণ্ডই কৈলাস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। মন্দা হ্রদটি যথার্থই গৌরীকুণ্ড কিনা এ তথ্য জানা যায় নি। কৈলাসের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত ধারা তিনটি সর্বশেষে মিলিত হয়েছে রাক্ষস তালে।

কৈলাস পর্বতমালার পূর্ব-উত্তর দিকে চন্দ্রপ্রভ নামে রত্নসন্নিভ গিরি রয়েছে। এই গিরির পাদদেশে অচ্ছোদা নামে দিব্য সরোবর বিরাজিত। এই সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে অচ্ছোদা নামে এক দিব্য নদী। এই নদীর তীরে চিত্ররথ নামে একটি বন রয়েছে। বর্তমান ভূগোল বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপ্রভ পর্বতকে কাঙ্লিঙ্ কাঙ্রী পর্বত বলে মনে করেন। এই

পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাঙ্‌পো বা ব্রহ্মপুত্র নদ। অচ্ছোদা সরোবরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তবে কৈলাসের উত্তর পূর্বে অবস্থিত লা কাঙইসৎসো নামে হ্রদের কথা মনে পড়ে। অচ্ছোদা সরোবরকে কোন কোন পুরাণে পবিত্র সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সূর্যপ্রভ পর্বত। সেই পর্বতের পাদদেশে লোহিত নামে সরোবর রয়েছে। সেই দিব্য সরোবর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে লৌহিত্য নামে পবিত্র নদ। লৌহিত্য নদ বিশোক নামে রমণীয় বনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

বর্তমান ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী সূর্যপ্রভ পর্বতের বর্তমান নাম পুনরুদ্ধার করা যায় নি। তবে কৈলাস পর্বতমালার দক্ষিণ পূর্বে নিচেন থাঙ্‌লা পর্বতমালা। এই পর্বতমালার পাদদেশে নামচেবারোয়া পর্বত[৪]। নামচেবারোয়া পর্বতের পাদদেশ থেকে লৌহিত্য নদ উৎপন্ন হয়েছে। পুরাণ অনুসারে লৌহিত্য নদই ব্রহ্মপুত্র। লোহিত সরোবরের অস্তিত্ব অবশ্য বর্তমান ভূগোলে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে বৈদ্যুতগিরি। তারই পাদদেশে অবস্থিত সিদ্ধসেবিত পবিত্র মানস সরোবর। এই মানস সরোবর থেকেই প্রবাহিত হয়েছে সরযূ নদী। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত বৈভ্রাজবন[৫]। বৈদ্যুত-গিরির বর্তমান নাম গুরলামান্ধাতা[৬] পর্বত। এই পর্বতের পাদদেশ থেকেই নির্গত হয়েছে সাটলেজ নদী বা শতদ্রু নদী। শতদ্রু ও সরযূ, এই দুটি নদীর কথাই লেখা আছে ঋগ্বেদে। এই নদী দুটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাণে। ঋগ্বেদে সরযূ অত্যন্ত বিখ্যাত নদী। সেদিক দিয়ে শতদ্রুর পরিচয় খুবই সামান্য। ঋগেবদে বর্ণিত সরযূ নদীর প্রাধান্য থাকলেও মানস সরোবর থেকে নির্গত এই নদীর গতিপথ কিন্তু আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কৈলাস পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মেঘাকার শ্রীমান পর্বত। সেই পর্বত শত সংখ্যক হেমশৃঙ্গ দ্বারা শোভিত। এই গিরির উপরভাগে ধূম্রলোহিত পর্বত অবস্থিত। শৈলদা নামে সুদৃশ্য সরোবর এই পর্বতের পাদদেশে উৎপন্ন হয়েছে। শৈলদা সরোবর থেকেই নির্গত হয়েছে শৈলদা

৪. নামচেবারোয়া পর্বত—২৫,৪৪৫ ফুট।

৫. বৈভ্রাজবন—অলকাপুরীর সন্নিকটে অপরূপ উপবনের নাম বৈভ্রাজবন।
(মেঘদূত—উত্তর মেঘ)

৬. গুরলামান্ধাতা—২৫,৩৫৫ ফুট।

নামে দিব্য নদী। এই নদীর তীরে সরভু নামে স্বর্গীয় বন বিরাজিত।

কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে বিশাল কারাকোরাম পর্বতমালা। শ্রীমান পর্বত সম্ভবত কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলের কোন পর্বত শিখর হওয়াই স্বাভাবিক। ধূম্রলোহিত পর্বতের বর্তমান নাম নাঙ্গা পর্বত[৭]। শ্রীমান পর্বতের পাদদেশে সুদৃশ্য হ্রদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে শৈলদা সরোবর কাশ্মীরে অবস্থিত উরাল হ্রদ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। উরাল হ্রদের পরিমাণ প্রায় ৪৪ বর্গমাইল। এই হ্রদ থেকেই নির্গত ঝিলাম নদী সিন্ধু নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেই সিন্ধু নদ সমুদ্রে পতিত হয়েছে। ঝিলামের গতিপথের সঙ্গে পুরাণে বর্ণিত শৈলদা নদীর গতিপথের পরিপূর্ণ মিল নেই।

কৈলাস পর্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত মঙ্গলময় প্রাণী ও ঔষধিপূর্ণ গৌর পর্বত। এই পর্বতের গাত্রদেশ হরিতাল বর্ণ, শৃঙ্গগুলি হিরণ্ময়। গৌর পর্বতের পাদদেশে কাঞ্চনকণাযুক্ত বালুকাময় দিব্য সরোবর রয়েছে। সেই সরোবরের নাম বিন্দুসর বা বিন্দু সরোবর। রাজর্ষি ভগীরথ বিন্দু সরোবর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন গঙ্গাকে তুষ্ট করবার জন্য। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি। গঙ্গাদেবী ত্রিপথগা প্রথম সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দেবী সোমপাদ থেকে প্রসূত হয়ে সপ্তধা ভিন্নাকারে প্রবাহিত হন। আকাশে রাত্রিযোগে নক্ষত্র মণ্ডলের সমীপে যে উজ্জ্বল ছায়াপথ প্রতীয়মান হয়, তিনিই দেবী ত্রিপথগা, তাতেই স্পষ্ট হয়েছিল সরোবর[৮]।

কৈলাস পর্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত গৌর পর্বতের সঠিক বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ সহজসাধ্য নয়। তবে কৈলাস পর্বতমালার উত্তরাংশে অবস্থিত পর্বতমালার নাম আলিঙ্ কাঙ্রা। তারও উত্তরে সুদীর্ঘ কুয়েনলুন পর্বতমালা। কৈলাস ও এই পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তিব্বতের প্রশস্ত মালভূমি। বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি স্থল ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গার উৎসের পরিচয়ের সঙ্গে খুবই সামান্য সাদৃশ্য রয়েছে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে। রামায়ণের যুগের সঙ্গে পুরাণের যুগের ব্যবধান দীর্ঘ। তাই হয়তো রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গার ভৌগোলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কালের পরিবর্তনে দীর্ঘ ও বিস্তারিত হয়েছে।

৭. নাঙ্গাপর্বত—২৬,৬২০ ফুট।

ভূগোল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পামীর মালভূমি থেকে শুরু করে সুদূর অতীত যুগের বরফের অবিচ্ছিন্ন ধারা ঢালু পথে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। এই প্রবহমান ধারা হিমালয় থেকে কারাকোরাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তুষার যুগের প্রভাবে বরফের এই অবিচ্ছিন্ন ধারা বিভিন্ন পর্বতমালার উচ্চ অঞ্চল থেকে অবতরণ করেছিল ঢালু অঞ্চলে। অপেক্ষাকৃত সমতল উপত্যকায় সঞ্চিত হয়েছিল বরফের ধারা। পরে সেখান থেকে উপচে পড়া বরফ আরো ঢালু অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছিল। কালক্রমে বিভক্ত হয়েছিল এই অবিচ্ছিন্ন বরফের ধারা। সেখান থেকেই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারাগুলি প্রবাহিত হয়েছিল উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে। এই অঞ্চলের পর্বত-মালার মধ্যে অন্যতম—তাঙ্‌লা, আলিঙ কাঙরা, নিচেন্ থাঙ্‌লা ও গুরলামান্ধাতা। এই পর্বতগুলির শিখরদেশ থেকে নেমে আসা হিমবাহের বরফ সঞ্চিত হত ঢালু উপত্যকায়। এমনি করেই তুষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তিব্বতের বিশাল ভূমি। তুষার যুগের সমাপ্তির অব্যবহিত পরে মালভূমির উচ্চ উচ্চ স্থান থেকে তুষার অপসৃত হলেও, অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে সঞ্চিত ছিল দীর্ঘকাল ধরে। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঢালু তুষার ক্ষেত্র গলে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ভূগোল বিজ্ঞানীরা তিব্বতের মালভূমিতে অনেকগুলো হ্রদের অবস্থানের কারণ নির্দেশ করেছিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের বিশাল ভৌগোলিক পরি-সীমার মধ্যে অবস্থিত জম্বুদ্বীপ—মুনি ঋষিদের কাছে কিন্তু অপরিচিত ছিল না। সেকালে মেরু পর্বত ও তার সংশ্লিষ্ট পর্বতমালা ছড়িয়েছিল চতুর্দিকে।* বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে এই পর্বতমালা ও তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলের বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিব্বতের মাল-ভূমি—পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। এই মালভূমিকে মোটামুটিভাবে বেষ্টন করেছে যেসব পর্বতমালা, সেগুলি বিশাল প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। হিমালয়ের বিশাল প্রাচীরের উত্তরে লাডাকি গিরিশ্রেণী। লাডাকি গিরি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উচ্চ পর্বতশিখর গুরলামান্ধাতা। এই পর্বতমালার আরো পঁচিশটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে একটির উচ্চতা ২৩৬০০ ফুট, দুটি ২২০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট; তেরোটা ২১০০০ ফুটেরও বেশী। বাকী পাঁচটির উচ্চতা ২০,০০০ ফুটেরও বেশী। নিচেন্-থাঙ্‌লা পর্বতমালার উত্তরে আলিঙ্ কাঙ্রি পর্বতমালা। এই পর্বত-

* মানচিত্র

মালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আলিঙ্ কাঙ্রি (২৪000 ফুট)। অন্যান্য পর্বত-শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ও ভৌগোলিক অবস্থান ও সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তিব্বতের মালভূমির সর্ব উচ্চ গিরিপ্রাচীর মূলতঃ কারা-কোরাম পর্বতশ্রেণীর শেষে পূর্ব উত্তর অংশ। তারও উত্তরে কুয়েনলুন পর্বতমালা। তুষার যুগে আলিঙ্ কাঙরি, নিচেনথাঙ্লা, দুই পর্বত-মালার মধ্যবর্তী উপত্যকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তুষার সঞ্চিত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি লাডাকি পর্বতমালা ও কৈলাস পবতমালা থেকে তুষার নিম্ন উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল সুদূর অতীত যুগে[১]। সেইসব হ্রদ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বর্তমান ভূগোলতত্ত্ববিদ্ মনে করেন ঃ 'The filling of a rock basin previously scooped out of a glacier.'—Huntington.

প্রাচীন যুগের পাঁচটি বিখ্যাত হ্রদগুলির মধ্যে—নন্দা, অচ্ছেদা, শৈলদা ও বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমান মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অপর উল্লেখযোগ্য হ্রদ মানস সরোবরের ভৌগোলিক পরিবেশ, অবস্থান কিন্তু বর্তমান মানচিত্রে সুন্দরভাবে চিহ্নিত রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও এইসব হ্রদ হয়তো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল। তীর্থ পরিক্রমায় তাঁরা এইসব দুর্গম অঞ্চল দর্শন করতেন। পরবর্তীকালে সুদূর অতীতের ব্যবধানে হ্রদগুলোর অস্তিত্ব পৌরাণিক যুগেও বিপন্ন হয়নি। বর্তমান ভূগোলতত্ত্ববিদ্‌গণ নন্দা, অচ্ছেদা ও শৈলদার বর্তমান পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিন্দু সরোবরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য হয়েছে। পৌরাণিক ভূগোল অনুসারে বিন্দু সরোবর তিব্বত অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। বায়ু পুরাণ[১] ও মৎস্য পুরাণে বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক পরিচয় থেকে এই ধারণাই প্রমাণিত হয়। বিন্দু সরোবরের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিন্দু বিন্দু জমানো জলের হ্রদ। প্রাচীন তথ্য অনুসারে দেবী ত্রিপথগা মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ গঙ্গার ধারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে তুষারকণা রূপে আবদ্ধ হয়েছিল। উচ্চ পর্বত শিখরে জমানো বরফের ধারা (হিমবাহ) অবরুদ্ধ হয়েছিল। তুষার যুগের জমানো বিশাল তুষারভূমি পরবর্তীকালে গলতে শুরু করেছিল। তখন হিমবাহ অঞ্চলের বরফ পর্বতশৃঙ্গের গা বেয়ে তিনদিক দিয়ে শুরু করেছিল অবতরণ করতে। গঙ্গার এই ত্রিপথ-গামী অবতরণের নাম ত্রিপথগা। তুষার অঞ্চলের তুষারগলা জলরাশি

বিশাল উপত্যকার বেষ্টনী ভেদ করে খুঁজে বার করেছিল বহির্গমনের পথ। এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে সম্ভবতঃ মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ ত্রিপথগা গঙ্গার অবতরণ বলে মনে করা হয়েছিল। মহারাজ ভগীরথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিলেন দুর্গম স্থানে (বিন্দু সরোবর)। তিনি হয়তো সেখানে গঙ্গাবতরণের বিস্ময়কর ঘটনার পর্যবেক্ষক মাত্র। তাঁর এই দুর্গম অঞ্চলের সন্ধানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পদযাত্রার মধ্যে কঠোর সাধনা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ বলে মনে করা হয়েছিল। অতীত যুগের মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়াকে দৈবী ও আসুরিক শক্তির প্রভাব বলে বিশ্বাস করতো। হিমালয়ের বিশালতা ও তার অপরূপ সৌন্দর্য সর্বক্ষেত্রেই মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তাই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে অপ্রাকৃতিক বলে ভাবাই স্বাভাবিক বলে মনে করতো। বিন্দু সরোবরের অবস্থান নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানীরা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব নিয়েও কারো কারো মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। সেসব প্রশ্নের সঠিক জবাব হয়তো বা নাও পাওয়া যেতে পারে। তবু সুদূর অতীত যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গৌর পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গ যাকে আলিঙ্ কাঙ্রি পর্বতমালা বলে মনে করা হয়, তারই পাদদেশে অবস্থিত বিন্দু সরোবর। সুদূর অতীত যুগে, হয়তো বা তুষার যুগের অব্যবহিত পরে—তাঙ্লা, কৈলাস, আলিঙ্ কাঙ্রি ও নিচেন্থাঙ্লা পর্বতমালা থেকে নেমে আসা তুষার সঞ্চিত হয়েছিল পর্বতমালার পাদদেশে। সে যুগের সেই তুষারধারা কালক্রমে অবলুপ্তির পথে গলতে শুরু করেছিল। সেই বরফগলা জল সঞ্চিত হয়ে জলাধারের সৃষ্টি করেছিল। সে যুগের হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো জমে প্রাকৃতিক বাঁধের সৃষ্টি করেছিল হয়তো। ফলে বরফগলা জলের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছিল অপরূপ হ্রদের। তিব্বতের মালভূমির প্রায় সমস্ত অংশেই তুষার যুগের চিহ্ন বর্তমান। বিন্দু সরোবর সৃষ্টি পর্বের ইতিহাস থাকা সম্ভব নয়। কালের পরিবর্তনে সেই হ্রদ নিশ্চিহ্ন হওয়া অসম্ভব বলা চলে না। তিব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমির ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ভূগোল বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—সেই অঞ্চলে তুষার যুগের পরবর্তীকালে অনেকগুলো হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সব হ্রদের অনেকগুলোই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।[১০]

বিন্দু সরোবর থেকে নির্গত জলধারা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। সেই প্রবাহ কখনো বা প্রস্তরময় অংশ দিয়ে

প্রবাহিত হবার সময় ভূগর্ভে প্রবেশ পথের সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন পুরাণে অন্তঃশীলা নদীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

কারো কারো ধারণা, বিন্দু সরোবর হিমালয় পর্বতমালার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। তুষারযুগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সুখী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। গঙ্গোত্রী থেকে সুখী পর্যন্ত ভাগীরথীর ধারা বস্তুতঃ হিমবাহ উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত। সুখীর একপাশে গিরিশিরার ওপরে ঝুলন্ত উপত্যকার চিহ্ন বর্তমান। গঙ্গোত্রীর সামান্য নীচে পাটাঙ্গনায় গ্লেসিয়াল পেভমেন্টের অবস্থান আজও দেখতে পাওয়া যায়। জাঙলা থেকে ঝালা পর্যন্ত উপত্যকা প্রশস্ত হয়েছে। সুখীর নীচে থেকে অতীত যুগের হ্রদের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের কোথায়ও গঙ্গার উৎস সম্পর্কে কোন কিছুই লেখা নেই। রামায়ণেই সর্ব প্রথম গঙ্গার উৎসের কথা দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার উৎসের কাহিনী হয়তো বেদেরও পূর্বে আর্যদের কাছে জ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি পুনায় বিংশ আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব কংগ্রেসে অধ্যাপক জি. আর. শর্মা গাঙ্গেয় উপত্যকা সম্পর্কে একটি নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু কিছু অংশ খনন করে ৮০০০ বৎসর পূর্বেকার সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন।[১১] সেকালে ভারতীয়রা গাঙ্গেয় উপত্যকায় ধানের চাষ করতো। কারণ চাল তাদের মুখ্য খাদ্য ছিল।

ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধুর কথ বারবার বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু ও তার পাঁচটি শাখানদী ও সরস্বতী নদী। কিন্তু পরবর্তীকালে সপ্তসিন্ধু বলতে সাতটি পবিত্র নদীর কথা বলা হয়েছে।

গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী জলস্মিন সন্নিধম্ কুরু ।।

হিন্দুদের পুজো পার্বণের শুরুতেই সপ্তনদীর পবিত্র জল দিয়ে আচমন বিধি প্রচলিত রয়েছে আজও।

বৌদ্ধ যুগের নদীর মধ্যে সরস্বতী, শ্রদ্ধা (সিন্ধুর অন্তর্গত শাখা-নদী) ব্যতীত গঙ্গার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের পণ্ডিতগণ সিন্ধুনদ ও তার উপনদী শাখা নদী মোট পনেরোটির পরিচয় জানতেন। বৌদ্ধগ্রন্থে সাতটি পবিত্র নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ন গঙ্গা যমুনা বপি বা সরস্বতী
নিম্নগাভ কিরাবতী মাহীবাপি মহানদী ।।

বৌদ্ধগ্রন্থে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে গঙ্গার বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাগঙ্গা, সদিনা গঙ্গা, লোহিয়া গঙ্গা
আরতি গঙ্গা, পরমাবতী গঙ্গা, মধু গঙ্গা ॥

প্লিনি গঙ্গা ও তার উনিশটি শাখানদীর উল্লেখ করেছিলেন। যদিও গঙ্গা ও সিন্ধু ভারতের দীর্ঘতম নদী, কিন্তু গঙ্গানদীকে অপরের তুলনায় দীর্ঘতম নদী বলা হয়েছে। প্লিনির পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গঙ্গা কোন নির্দিষ্ট উৎস থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নীল নদের মতোই। অপরের মতে, গঙ্গা কোন পর্বতগুহা বা ফাটল থেকে নির্গত হয়ে উনিশটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে নদী-গুলির নাম।

এরাম্নোবোয়স	যমুনা নদী
কসগাস	কৌশিকি
সোনাস্	শোন
কণ্ডোবেটাস	গণ্ডক

প্লিনির সমসাময়িক কোন তথ্যাভিজ্ঞের মতে, গঙ্গা কোন ঝরণা থেকে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরই সেই জল-ধারা অসমান খাড়া পাথরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে কঠিন প্রস্তর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল গভীর খাদের সৃষ্টি করে। নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হবার পূর্বে একটি হ্রদের সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়েছিল সমভূমিতে। এইভাবে প্রায় আট মাইল পথ প্রবাহিত হবার পর গড়ে একশো স্টাড়িয়া বিস্তার বিশিষ্ট প্রায় একশো ফুট গভীর হয়ে গঙ্গা অন্তিম গতিপথে প্রবেশ করেছিল অনেক দেশ ভ্রমণের পর পর। বিদেশীদের দৃষ্টিতে গঙ্গার সৃষ্টি ও অন্তিম গতিপথ আলোচনা করলে মনে হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অস্পষ্ট চিত্র বিদেশীদের মনের মধ্যে স্থান পেয়ে-ছিল।

৮. বিন্দুসর/বিন্দু সরোবর

অন্তুতরেণ কৈলাসং শিবং সর্বৌষধিং গিরিম্।
গৌরন্তু পর্বতশ্রেষ্ঠং হরিতালময়ং প্রতি ॥
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যোষধিময়ো গিরিঃ।
তস্যপাদে মহাদ্দিব্যং সরঃ কাঞ্চন সন্নিভম্ ॥
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ।

গঙ্গার্থে স তু রাজর্ষিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ ॥

মৎস্য পুরাণ। ১০১ অধ্যায়।

অস্তুত্তরেণ কৈলাসচ্ছিব সর্বৌষধো গিরি ॥
গৌরনামা গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ।
হিরণ্যশৃঙ্গ সুমহান দিব্যৌ মণিময়ো গিরিঃ ॥
তস্য পাদে মহাদিব্যং শুভং কাঞ্চন বালুকাময়।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র যাতো ভগীরথঃ ॥

বায়ু পুরাণ। ৪২ অধ্যায়

৯. তিব্বতের মালভূমিতে তেইশটি হ্রদ বর্তমান। এই হ্রদগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত। পাঞ্জাব হিমালয়ের উত্তরে তিনটি হ্রদ।

ৎসো মোরারি—আয়তন—৪৬ বর্গ মাইল।
উচ্চতা—১৫০০০ ফুট
ৎসো কাইগার—উচ্চতা ১৫৬৯০ ফুট
ৎসো কারু—উচ্চতা ১৫৬৮৪ ফুট

নেপাল হিমালয়ের উত্তরে দুটি হ্রদ গালুংগু ৎসো—আয়তন ৪০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৫০০০ ফুট
ৎসোমো ত্রেতুঙ—আয়তন ৪০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৪০০০ ফুট

আসাম হিমালয়ের উত্তরে একটি—নারা ইয়ৎসো

দক্ষিণ তিব্বতে তিনটি হ্রদ মানস সরোবর—আয়তন ২০০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৪৯০০ ফুট
রাক্ষস তাল—আয়তন—১৪০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৪৮৫০ ফুট
গুগু—আয়তন—৪০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৫৮০০ ফুট

দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে পাঁচটি হ্রদ ইয়াবডক আয়তন—৩৪০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৪৩০০ ফুট

(সাঙপোর দক্ষিণে) ত্রিগু আয়তন—৫১ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৫৫০০ ফুট

পোমো আয়তন—২০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৬১৯০ ফুট

পাৎসো আয়তন—২০ বর্গমাইল
উচ্চতা—১৪৫০০ ফুট

ডুমো

দক্ষিণ তিব্বতে	একটি হ্রদ	ইগরঙ	আয়তন—১০০ বর্গমাইল
(শাঙপোর উত্তরে)			উচ্চতা—৭৩০০ ফুট
উত্তর-পশ্চিম তিব্বতে	তিনটি হ্রদ	টাইটেন্	আয়তন—২৫০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৬৫০০ ফুট
		সাগর	আয়তন—১০০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—
		আরপর্ট	আয়তন—১০০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৭২০০ ফুট
উত্তরে তিব্বতে	দুটি হ্রদ	মারখাম্	আয়তন ১০০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৬২০০ ফুট
		হারমিওদেস	আয়তন—২০০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৬০০০ ফুট
উত্তর-পূর্ব তিব্বতে	তিনটি হ্রদ	কোকোনর	আয়তন ১৬৩০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১০৭০০ ফুট
		আরিঙ্নর	আয়তন—২৫০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৩৭০০ ফুট
		দ্যসারিঙ্নর	আয়তন—২২০ বর্গমাইল
			উচ্চতা—১৩৭০০ ফুট

১০. তিব্বতের হ্রদ সৃষ্টির কারণ—

1. The damming of the main valley by the fans of tributaries (Driw)

2. Rise of the river bed and consequent deposition of material above the barrier so formed (Oldham).

3. The filling of a rock basin previously scooped out by a glacier (Huntington)

পরবর্তী ভূতত্ত্ববিদ্ মনে করেন—

The further suggestion, now made by us, that the damming of the main valley may have taken place owing to its conversion into a tributary valley may be regarded as a modification of Mr. Driw's hypothesis and if we add to this the damming of tributary vallyes by moraines of glaciers the main valley, we shall probably have included all the causes at work to form the more important lakes of Tibit.

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে প্রখ্যাত ভূগোলতত্ত্ববিদগণ তিব্বতের হ্রদগুলো পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁরা হ্রদের তটভূমি লক্ষ্য করে মূল সিদ্ধান্তে পেঁছেছিলেন যে—হ্রদগুলোর জল শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। অনেকগুলো হ্রদের শুষ্ক জলাধার দেখে বোঝা যায় হ্রদগুলো একদা বিশাল ছিল। শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে Huntington মনে করেন—Mr. Huntington regards them as evidence of deseccation it is true, but of a deseccation that was oscillatory, embracing periods now drier, now urtter but the tendency to aridity generally greater than its opponent.

বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব অতীত যুগে থাকলেও পরবর্তীকালে শুকিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। প্রাচীন যুগের পাঁচটি হ্রদের মধ্যে মানস সরোবরের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। হয়তো তার Aridity কম।

১১. Report—Pune Dec. 22, 1978 : Post plenary Symposium of the 20th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences.

The discovery is claimed to have established the transition from a hunting and food gathering economy to an area of agiculture.

The traces of transition were brought to light during recent excavations in the Vindhyas, and the Ganga Valley by Prof. G. R Sharma, Head of the Department of Ancient Indian History, Allahabad University,

Professor Sharma told the symposium that extremely arid conditions in the hoary past forced the river's including the Ganga, to recede into narrow channels and depper their beds leaving behind a large number of horse-shoe lakes. These lakes, he contended played a decisive role in the life of man in the epi-Palocolithic and mesolithic periods.

The stone tools found during the excavations at Sarai Nahar Rai and Mahadha in the Ganga Valley and Chopani Mando, Mahagda and Ko Dihawa in the Belau Valley, indicated existence of epi-palacolithic, mesolithic, advanced mesolithic and neolithic cultures,

Among them the naolithic site of Ko Dihawa furnished evidence of a cultivated Indian variety of rice in the 6th

॥ ৭ ॥

জাহ্নবী স্মরণং কুর্য্যাৎ সর্বতীর্থেষু মানব।
নান্য তীর্থং তু জাহ্নব্যাং স্মরণীয় কদাচন ॥

গংগা দর্শন সর্ব তীর্থসার, এই সারতত্ত্ব অনুভব করেই হয়তো গংগার সন্ধানে রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন সগর রাজা। দীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তিনি। গংগার উৎস তাঁর কাছে অজ্ঞাতই ছিল। পরবর্তীকালে অংশুমান দুর্গম হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন গংগার সন্ধানে। উৎসের সন্ধান তিনি খুঁজে পান নি। কৃচ্ছ্রসাধনায় আর বিপদসংকুল পদযাত্রায় ব্যর্থ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন হিমালয়ের বুকেই। সর্বশেষে গংগার উৎস সন্ধানে সার্থক হয়েছিলেন মহারাজা ভগীরথ। উৎস থেকে গংগার অন্তিম গতিপথ পর্যন্ত পরিক্রমা করে পেঁছে গিয়েছিলেন সাগরে। তাঁর সেই সার্থক অভিযান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে রামায়ণে। রামায়ণের পর মহাভারত ও সর্বশেষে পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে গংগার আনয়নের ইতিবৃত্ত। রামায়ণের পর মহাভারত তারপর পুরাণ, এই দীর্ঘকালের সেতু অতিক্রম করে অসংখ্য তীর্থযাত্রী গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎসে। সেই অগণিত পুণ্যার্থীদের স্মৃতিবিজড়িত গঙ্গা ভারতবর্ষের জনমানসে এক বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে রয়েছে। ভগীরথের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুণ্যার্থীদের দীর্ঘ ও দুর্গম পদযাত্রার পরিপূর্ণ বিবরণ হয়তো বা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গামাহাত্ম্য, গংগা স্তব, গংগাতীর্থের কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুরাণগুলোতে।

millennium B. C. and also of domesticated animals including sheep, goats and pigs,

The excavation at Sarai Nahar Rai and Mahadha, Prof. Sharma said had yielded evidence of the earliest human fossils in India, including 35 skeletons, tired systematically in shallow, long graves.

These humans brought stone implements from parts of the Vindhyas to places where they temporarily stayed on the bank of the lakes, demonstrating seasonal migration.

Statesman,

শৈশবে মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম গঙ্গার কথা। গঙ্গা মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে থেকে সেই পবিত্র জলধারা হিমালয়ের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল নিম্ন উপত্যকায়। তখনকার দিনের কোন কোন পুরনো ভূগোল বইয়ে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে এমন তথ্যই লেখা ছিল। মানস সরোবর হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থস্থান। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলোয় মানস সরোবরের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। পুরাকালের মুনিঋষিরা মানস সরোবরের তীর্থে তপস্যা করেছেন। পরবর্তীকালে দুঃসাহসী তীর্থযাত্রীরা মানস সরোবরে যেতেন তীর্থ মানসে। পুরাণ অনুসারে স্বর্গগঙ্গার একটি ধারা মানস সরোবরে পতিত হয়েছিল। মানস সরোবর থেকে সেইধারা গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ দিকে। পুরাণের এই তথ্য অনুসরণ করেই সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গঙ্গার উৎস স্থল মানস সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল সেকালের ভূগোলে। এই তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি সেযুগে। মানস-সরোবরের উচ্চতা ১৪৯০০ ফুট। কিন্তু তিব্বত ও হিমালয়ের সীমারেখার সর্বনিম্ন গিরিপথের উচ্চতা ১৬০০০ ফুটেরও বেশী। তিব্বতের নিম্ন অঞ্চল থেকে পথ বেয়ে জলধারা উচ্চ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নয়। গঙ্গার উৎস নিয়ে তথ্যাবিদ্দের মনে তাই বহুবিধ প্রশ্ন জেগেছিল। গঙ্গার উৎস নিয়ে কোনরূপ পর্যবেক্ষণ বা সমীক্ষার পূর্বেই সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে একদল পর্তুগীজ মিশনারী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করেই দুর্গম পদযাত্রায় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের পদযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মিশনারী কার্যের প্রসারের জন্য সুদূর নিষিদ্ধদেশ তিব্বতে প্রবেশ করা। গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন হিমালয়ের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে। তাঁদের দুঃসাহসিক পদযাত্রা, উচ্চ হিমালয়ে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে মূল উৎসের সন্ধানে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁরা, সুখ, দুঃখ বেদনা ও মৃত্যু কোন কিছুকেই ভয় পান নি। মূল ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁরা গঙ্গার ধারা, নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর বিবরণ, স্থানীয় পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সব কিছুর নিখুঁত চিত্র রেখে গেছেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণ—ভূগোল বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠ তাঁরা করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই দীর্ঘ ও দুর্গম পদযাত্রা, গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের অনুপ্রেরণা হয়তো বা পেয়েছিলেন বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকেই, তাই এই মিশনারী সন্ন্যাসীরা পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক

তথ্যের সম্বন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। যে সব মিশনারীরা গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে দুর্গম হিমালয়ে পেঁছেছিলেন উৎসের দিকে, তাঁদের কথা বলা হল।

পর্তুগীজ মিশনারীদের নাম।	দীর্ঘ পদযাত্রার সময়কাল।
আন্তেনিও দ্য আন্দ্রে	১৬২৪ সন
আজে ভেদো	১৬৩১ সন
ফাদার দেসদেরী	১৭১৫ সন

পবিত্র গঙ্গার প্রবাহ অনুসরণ করে উচ্চ হিমালয়ের পথে এগুতে এগুতে উৎসের দিকে যাত্রা করেছিলেন প্রথম পর্তুগীজ মিশনারী আন্তেনিও দ্য আন্দ্রে, তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু ধর্মগ্রন্থলিতে লেখা গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য জানতেন, যদিও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিষিদ্ধ রাজ্য তিব্বতে প্রবেশ করা ও সেখান খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। গৌণ উদ্দেশ্য—গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে উৎস খুঁজে বার করা। কারণ প্রকৃৎ উৎস তখনও সবার মনে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৬২৪ সনের শুরুতেই আন্দ্রে ছোটখাট দল নিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা দিয়ে পায়ে হেঁটে পেঁছে গিয়েছিলেন হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গা সমতলে অবতরণ করেছে, সেখান থেকে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে পেঁছেছিলেন ঋষিকেশ। সেখান থেকে পেঁছে গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ। ধারা দুটির সম্মিলিত নাম গঙ্গা। আন্দ্রের ধারণা মূল গঙ্গার বেশীর ভাগ জল। অলকানন্দা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অলকা-নন্দার পথ ধরেই তিব্বতে প্রবেশ পথ সহজসাধ্য হতে পারে। তাই অলকা-নন্দার ধারা অনুসরণ করে তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন শ্রীনগর। হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর পেঁছতে তাঁর মোট সময় লেগেছিল পনের দিন। সমস্ত পথে আন্দ্রে বদ্রীনাথের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় শ্রীনগর ছিল চাঁদরাজাদের রাজধানী। আন্দ্রে জানতেন বছরের শুরুতেই উচ্চ হিমালয়ের শীতের বরফ গলতে শুরু করেনি। তাই তাঁদের এ ধরনের দুঃসাহসিক অভিযান সার্থক নাও হতে পারে, এ ছাড়াও আন্দ্রের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। কারণ, এই পনেরো দিনের পদযাত্রার মধ্যে সহযাত্রিদের ভেতর থেকে অনেকেই বুঝতে পেরেছিল যে আন্দ্রের ছোট্ট দল তীর্থযাত্রায় আসেনি, ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও নয়। বিদেশীরা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশে শ্রীনগরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান-কার রাজা আন্দ্রেকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করেছিলেন। শেষটায় প্রমাণ

অভাবে তাঁদের মুক্তি দিতে হয়েছিল। শ্রীনগর থেকে আন্দ্রে দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন উত্তুঙ্গ গিরিশিরায় ওপর দিয়ে। তুষারাবৃত সেই গিরিশিরা, উচ্চ থেকে উচ্চতর সেই গিরিশিরার পেঁছিতে আন্দ্রেকে তুষারাবৃত বিশাল পাঁচিল পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। যারা উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করতে অভ্যস্ত, হিমশীতল তুষারাবৃত অঞ্চলের ওপর দিয়ে তিব্বতের মালভূমিতে পেঁছে যাওয়া দুঃসাহসিকতা, সেই সময় পর্যন্ত কোন ইউরোপীয়ান ভ্রমণকারী ঐ দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের উৎসের পথে যাননি। তাই বিদেশীদের ঐ অঞ্চলের যাবার উপযোগী কোন পথ-নির্দেশ বা তথ্যও জানা সম্ভব ছিল না। কারণ সমস্ত অঞ্চলই তুষারাচ্ছন্ন ও দুর্গম, খাড়া গিরিশিরা পেরিয়ে অগ্রসর হবার পথ খুবই সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক। একটার পর একটা মাথা উঁচু করে ক্রমাগত খাড়া হয়ে পথ রোধ করে রয়েছে, পথযাত্রীদের ঐ বিপজ্জনক সংকীর্ণ পথ ধরে ইঞ্চির পর ইঞ্চি পা ফেলে অতি সন্তর্পণে এগুতে হয় পাথরের খাঁজ দু হাতে আঁকড়ে ধরে। নীচের দিকে তাকালে চোখে পড়ে গঙ্গা, তটভূমি কেটে কেটে চলেছে ফেনিল উচ্ছ্বাসে। বহুদূর থেকেই গঙ্গার খাড়া গিরিখাত দেখা যায়। আন্দ্রে পথ চলতেন ধীর পদক্ষেপে। বিপজ্জনক স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-চোখ ভরে দেখতেন মুগ্ধ হয়ে। এমন ভয়ংকর সৌন্দর্য, এমন বিপদসংকুল পথ! হিন্দু তীর্থযাত্রীরা কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে যেতেন ঐ দুর্গম পথ বেয়ে, খাড়া পাথরের গা ঘেঁষে, কোথাও বা পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে। ভয়ংকর পথ দেখেও তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হতেন না। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত কণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করতেন বদ্রীনাথের নাম। দেবতার ওপর তাঁদের এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। পথের কোথাও সামান্য সমতল স্থান হলেই দেখা যেতো মন্দির। সেই মন্দিরের কারুকার্য আন্দ্রেকে মুগ্ধ করতো, সেই মন্দিরের অঙ্গনে বসে থাকতেন জন কয়েক সন্ন্যাসী। তাঁরা সবাই হিন্দু সন্ন্যাসী, তাঁদের সর্বাঙ্গে ত্যাগ তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনার চিহ্ন। তাঁরাই মন্দিরগুলোতে পুজো ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

শ্রীনগর থেকে একটানা পনের দিন ধরে চলে খাড়া চড়াই ও বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আন্দ্রে দলবল নিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন তুষারাবৃত গিরিশিরার ওপরে। সেখানে সাংঘাতিক শীত,

চারদিক থেকে হিমেল হাওয়া, আন্দ্রে সংগীদের নিয়ে তীর্থযাত্রীদের সংগে সঙ্গে প্রবেশ করেছিল এক বিস্ময়কর শহরের তোরণ দ্বারে। চারদিকে দুর্লংঘ প্রাচীর। সেই প্রাচীর যেন একটার পর একটা রয়েছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তার ওপরেই তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি যেন মেঘের বুক চিরে মাথা উঁচু করে রয়েছে, তোরণ-দুয়ার পেরিয়ে যোশীমঠে পেঁছে গিয়েছিলেন আন্দ্রে। যোশীমঠ অলকানন্দার পাশেই অবস্থিত। শ্রীনগরের গা ঘেঁষে অলকানন্দা দেখে আন্দ্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অলকানন্দাকেই তিনি গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেলেন ভ্রমণ কাহিনীতে। গঙ্গার দুটি ধারা ভাগীরথী ও অলকানন্দা। অলকানন্দাকেই তিনি মুখ্য ধারা বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস অবশ্য পরবর্তী বিদেশে ভ্রমণকারী ও অভি-যাত্রীদের প্রভাবান্বিত করেছিল। শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী, সেই শ্রীনগরের নামে নাম এই শহর গাড়োয়াল রাজাদের রাজধানী। ফলে শ্রীনগর নিয়ে ভুল হতে পারে, আন্দ্রে অবশ্য কাশ্মীরের শ্রীনগরে পদযাত্রা করেন নি। তিনি অলকানন্দার তীর ধরে হেঁটে এসেছিলেন শ্রীনগর, ১৬২৪ সনের শ্রীনগরে নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। অলকানন্দার তটভূমিতে গড়ে ওঠা অপরূপ শহর মুগ্ধ করেছিল আন্দ্রেকে। পরবর্তী-কালে অলকানন্দার বিশেষ বর্ণনা দিয়েছিলেন জে. মুর।

"অলকানন্দার জলের বর্ণ সমুদ্রের জলের মতো নীল, পথের রেখার বেশ নীচে দিয়ে প্রবাহিত, নদীর এক পারে তৃণপূর্ণ পাহাড়ের ঢাল, সেখান উঁচু গাছ কদাচিৎ দেখা যাচ্ছিল, অপর পারে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাইন গাছ। পাহাড়ের খাড়া ধার নেমে এসেছে তটভূমিতে। নদীর তট-রেখায় বেশ ছোট ছোট গাছপালাপূর্ণ উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। জলধারা কোন কোন স্থানে খাড়া পাথরের খাদের মাঝখানে আবদ্ধ। যেন প্রস্তরময় পাহাড়ের গা কেটে কেটে কোন সুদক্ষ কারিগর এই অপরূপ জলধারার পথ বানিয়েছে। তার গিরিখাদ সুদৃশ্য, বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময়। ওপর থেকে নদীর অপরপার পর্যন্ত দেখলে দুচোখ যেন জুড়িয়ে যায়। নদীর পারে যেন ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের গা, সেখানে সুন্দর ভাবে সাজানো বড় বড় গাছের সারি। কোন কোন স্থানে পথ সংকীর্ণ, খাড়া পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপ কাটা। সেই ধাপ ক্রমান্বয়ে উচ্চ গিরিশিরার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে পথ প্রায় সাংঘাতিক চড়াই, একরূপ খাড়া বললেই চলে। সেখান থেকে নদী প্রায় হাজার খানেক ফুট নীচে।"

যোশী মঠে অলকানন্দা আবার বিষ্ণু গংগার সংগে যুক্ত হয়ে সংগমের সৃষ্টি করেছে। বিষ্ণু গংগার আর একটি নাম ধৌলী গংগা। সংগমের

উচ্চতা ২৩০০ মিটার/৭৫৪৬ ফুট, বিষ্ণু গঙ্গার উদ্দাম জলরাশির তটরেখা অনুসরণ করে দুর্গম কণ্টকর পদরেখা। তীর্থযাত্রীরা সেই পথ ধরে ক্রমাগত চড়াই ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছিল। আন্দ্রে এক কথায় গিরিশিরার ওপর দিয়ে দুর্গম বিপজ্জনক পথের বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু ঝুলন্ত দড়ির সেতু পেরুনো নয়, জমানো বরফের সেতু পেরুতে হয়েছিল বার বার। নদীর ওপরটাই জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। বরফের তলা দিয়ে নদীর জলধারা দারুণ উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছিল। তলা দিয়ে বরফের গুহা-মুক্ত নীল জলধারার গর্জন শুনতে শুনতে বরফের সেতু পারাপার করতে হয়েছিল গঙ্গার ওপর দিয়ে। বিষ্ণু প্রয়াগের পরই অলকানন্দাকে বিষ্ণু গঙ্গা বলেই বলা হত, আন্দ্রে কিন্তু অলকানন্দা বা বিষ্ণু গঙ্গাকে গঙ্গা বলেই অভিহিত করেছিলেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। শ্রীনগর থেকে বদ্রীনাথ পৌঁছতে পুরো দেড় মাস সময় লেগেছিল আন্দ্রের, সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি অথবা জুন মাসের শুরু। আন্দ্রের চিঠিতে তারিখ দেওয়া হয়েছিল—১৬ই মে, ১৬২৪ সন, শ্রীনগর থেকে বদ্রীনাথের পথে পাঁচদিন অতিবাহিত করবার পর।

বিষ্ণু গঙ্গার তীরে অবস্থিত বদ্রীনাথ, অপরূপ তার পরিবেশ, বদ্রীনাথ মন্দির সম্পর্কে আন্দ্রে বলেছেন যে—অগণিত তীর্থযাত্রী প্রতি বছরই মন্দিরে এসে হাজির হন[১]। তাঁরা সারা ভারতবর্ষ থেকে আসেন। এমনকি সুদূর সিংহল থেকেও আসতেন। মন্দিরের একটি বিশাল শিলাস্তূপের ভেতর থেকে কয়েকটি প্রস্রবণ বেরিয়েছে, তার সবকটার জলই উষ্ণ, একটি ধারার জল সাংঘাতিক গরম। সেই প্রস্রবণের জলে সামান্য সময়ের জন্য অবস্থান করাও কারও পক্ষে যেন অসম্ভব মনে হত। প্রস্রবণের কয়েকটি, বিশেষ করে তিনটি ধারার জল সঞ্চিত হয়েছে তিনটি কুণ্ডে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা সেই কুণ্ডে স্নান করে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কুণ্ড থেকে উপচেপড়া জল নীচে বিষ্ণু গঙ্গার হিমশীতল জলে পতিত হয়। বদ্রীনাথের মন্দিরের প্রচুর ধনসম্পদ শত শত বৎসর থেকে সঞ্চিত হয়েছে। অবশ্য তুলনামূলক ভাবে তীর্থযাত্রীরা বেশী সংখ্যক আসতে পারেন না। কারণ বছরের তিন মাসই বদ্রীনাথ বরফে ঢাকা থাকে। যোশীমঠ, কেদারনাথ, পাণ্ডুকেশ্বর সবই গাড়োয়ালে অবস্থিত। এর মধ্যে বদ্রীনাথে সবচাইতে বেশী সংখ্যক তীর্থযাত্রী আসেন। বদ্রীনাথের উচ্চতা ৩১৭০ মিটার/১০৬৯৮ ফুট, বদ্রীনাথ পর্বতের পাদদেশের উচ্চতা ৫০৮০ মিটার/১৬৬৬২ ফুট, সেখানকার হিম-প্রবাহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিষ্ণু গঙ্গা। (আন্দ্রের বর্ণিত সমস্ত উচ্চতা

সম্ভবতঃ আনুমানিক) পদযাত্রার সময় আন্দে্র বিভিন্ন জাতের মানুষ দেখে-ছিলেন। শ্রীনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা ও চাল চলন আলাদা ছিল। তারা ভাত খায়, সবজী ও পাঁঠার মাংস পছন্দ করে। তারা বেশ শক্তিশালী, আন্দ্রে নানা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন, কোন কোন অঞ্চলের মানুষ বরফ চুষে খাওয়া পছন্দ করতো। একবার আন্দ্রে দুতিন বৎসর বয়স্ক বাচ্চাকে বরফের গুলি চুষতে দেখেছিলেন। অতটুকু বাচ্চার বরফ হাতে করে রাখা ও বরফ চুষে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ভেবেছিলেন। তাই বাচ্চাটার হাত থেকে বরফের গুলি কেড়ে নিয়ে মিষ্টি মেঠাই হাতে দিয়েছিলে। বাচ্চাটা কিন্তু মিষ্টি মুখে দিয়েই স্বাদ বুঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কান্না শুরু করেছিল বরফের গুলির জন্য। ঐ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মেয়েরা জমি চাষ করতো। পুরুষেরা করতো তাঁতের কাজ, সম্ভবতঃ এই সময়ই আন্দ্রে প্রথম ভোটিয়ার কথা শুনেছিলেন। তারা ভারত তিব্বত সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসী। তাদের আচার ব্যবহার ও চাল-চলন গাড়োয়াল কুমায়নদের মতোই।

আন্দ্রে বদ্রীনাথ পেরিয়ে উত্তর দিকে এগুবার সময় মানা গ্রামে পেঁছে গিয়েছিলেন। মানা গ্রাম স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান। গ্রামের একদিকটায় সরস্বতী নদী. অপর দিকটায় বিষ্ণু গঙ্গা, এই দুটি ধারা একসাথে মিলিত হয়ে সঙ্গমের সৃষ্টি করেছে। সেখানকার উচ্চতা ৩১৭৮ মিটার/১০৪২৪ ফুট। গ্রীষ্মে ভোটিয়া ব্যবসায়ীরা মানা গিরি-পথের পাশে সাময়িকভাবে অবস্থান করতো। মানা গিরিপথ জাস্কার গিরিশ্রেণী অতিক্রম করবার একমাত্র পথ। তার উচ্চতা ৫৬০৮ মিটার/ ১৮৩৯৪ ফুট অর্থাৎ মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের চাইতেও ৮০০ মিটার/২৫২৪ ফুট বেশী উঁচু। এই গিরিপথ অতিক্রম করা এমন দুঃসাধ্য নয়।

মানাগ্রাম পেরুবার পরই উচ্চ গিরিশ্রেণী। সেই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করবার পরই জনশূন্য নির্জন অঞ্চল, এই পথে বৎসরের মাত্র দুই মাসের জন্য যাতায়াত সম্ভব হয়। এই গিরিপথ অতিক্রম করতে ২৩ দিন সময় লাগে। যেহেতু সেখানে বড় গাছ নেই, লতাগুল্ম বা ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই, তাই লোকবসতিও অসম্ভব। যখন তখন তুষারপাত হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অথচ পথে আগুন জ্বালাবার কোন উপায় থাকে না। কারণ আশ্রয় মেলে না কোথাও, পথচারীরা ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করে। ছাতু জলে মিশিয়ে নেয়, তাই আগুন জেবলে রান্না করার প্রয়োজন পড়ে না। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, অনেক লোক বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারায় এই পথে যাবার সময়। একথা সত্য যে সুস্থ সবল মানুষ এই পথে

যাবার সময় আকস্মিক অসুস্থ হয় পড়ে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রাণ হারায়। আন্দ্রের বিশ্বাস এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ, এত ঠাণ্ডা, উপযুক্ত খাদ্যাভাব, মানুষের দেহের তাপমাত্রা তাই দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য এ সম্পর্কে তৎকালীন—রিটার সাহেব মনে করেন যে—কেবল আগ্নেয়-গিরির নিকটবর্তী অঞ্চলের পাথর থেকে বিষাক্ত কার্বনিক গ্যাসের ধারা নির্গত হয়, কিন্তু আসলে এগুলো উচ্চ হিমালয়ের প্রভাবের ফলস্বরূপ। হেডিনকেও উচ্চ হিমালয়ের ফল অনুভব করতে হয়েছিল। হিমালয়ের উচ্চ গিরিপথ পেরুবার সময় বিশেষ করে ৫০০০ মিটার উচ্চতার পর উচ্চ হিমালয়ের প্রভাব অনুভব করা যায়। যখন ফ্রেজার প্রথম গংগোত্রী গিয়েছিলেন স্থানীয় লোকজন তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। তারা বলেছিল যে—পথচারীরা সাধারণ বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতো। ডিুইউ কয়েক বছর কাশ্মীর ও লাডাক অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বলতেন—স্থানীয় লোকজন মাঝে মাঝে উচ্চ হিমালয়ে যেতো। সেখানে হাল্কা বাতাস, সাধারণত বিশেষ ধরনের উদ্ভিদগুলোর উপস্থিতিতে তাদের অসুস্থ বানিয়ে ফেলতো। শোনা যায়, ঐ উদ্ভিদগুলো বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিত। উচ্চ হিমালয়ের লতাগুল্ম বা ফুলের গন্ধ শুঁকলে বা পাতা হাত দিয়ে রগড়ালেই দ্রুত অসুস্থ হত তারা। এক ধরনের পেঁয়াজ জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় উচ্চ হিমালয়ে। সেই বন্য পেঁয়াজ জাতীয় উদ্ভিদই নাকি পথচারীদের দ্রুত অসুস্থতার কারণ বলে উল্লেখ করা হত। এই উদ্ভিদ থাকলে অন্য কোন উদ্ভিদ নাকি সেখানে থাকতে পারে না। আন্দ্রে মানা গ্রাম ত্যাগ করবার পূর্বে এ ধরনের কাহিনী শুনেছিলেন। উচ্চ হিমালয়ে যাবার কোন অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তাই এ ধরনের আশঙ্কা তাঁকে বেশ কিছুটা বিব্রত করেছিল হয়তো।

তিব্বতে প্রবেশ করবার পূর্বে আন্দ্রে মানাগ্রামে অবস্থান করেছিলেন যাত্রীদের অপেক্ষায়। অবশ্য শ্রীনগরের মহারাজা তাঁকে মানাগ্রাম ত্যাগ করে তিব্বতে প্রবেশ করতে নিষেধ জানিয়েছিলেন, কারণ, হয়তো ভেবে-ছিলেন—বছরের শুরুতেই দালাই লামার পবিত্র ভূমিতে অবিশ্বাসী বিধর্মী মানুষের প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। পর্তুগীজ মিশনারীদের অবশ্য আগেভাগেই এ ধরনের ধারণা হয়েছিল। এ ব্যাপারে যাত্রার পূর্বেই পথ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন আন্দ্রে। সে জন্য বছরের শুরুতেই যাত্রা করেছিলেন সেই দুর্গম পথে যাবার জন্য। তিব্বতে

যাবার পথ এ সময় খোলে না। গিরিপথগুলো শীতের বরফে ঢাকা থাকে। ব্যবসায়ীরা তাই এ পথে যাতায়াত করতে শুরু করে না। আন্দ্রে তাঁর সঙ্গীসহ মানা গ্রাম ত্যাগ করবার আগে স্থানীয় পথ-প্রদর্শক স্থির করে নিয়েছিলেন। তারপর যথারীতি যাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রথম দুদিন যতদূর সম্ভব দ্রুত পথ চলে যতটা সম্ভব পথ অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই তিনজন সরকারী কর্মচারী, তারা দ্রুতবেগে পথ চলে আন্দ্রের দলকে ধরে ফেলেছিল। এই লোকগুলি সীমান্ত বরাবর টহল দিয়ে বেড়ায়। পথ যাত্রীদের ও ব্যবসায়ীদের পথ দেখিয়ে দেয় তিব্বত সীমান্তে প্রবেশের সময়। আন্দ্রের সঙ্গে মানা গ্রামের পথ-প্রদর্শককে তিব্বত সীমান্তে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। প্রথমতঃ পথ-প্রদর্শককে ভীতি প্রদর্শন করেছিল। এই অসময়ে এমন দুর্গম পথ পেরিয়ে কাউকে পথ দেখিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করা নিষেধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে স্থানীয় শাসন-কর্তার কাছে। বিচারে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে। পথ প্রদর্শকের স্ত্রী পুত্রকে ধরে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। তিব্বতে যাবার সংকল্প ত্যাগ না করলে ভীষণ বিপদ ঘটবে, লোক তিন জন মানা গ্রামের পথ-প্রদর্শককে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, আন্দ্রেকেও ভয় দেখিয়েছিল। মানা গ্রামে ফিরে না গেলে চরম শাস্তি ঘটবে। কিন্তু আন্দ্রে ও তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল। লোক তিনজন আবার সাবধান করেছিল। এই সময় আবহাওয়া সাংঘাতিক খারাপ। পথ খুবই দুর্গম। চারদিকে শুধু বরফ, এমনি অসময়ে সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় আরো এগিয়ে গেলে জমে যেতে হবে। মিছামিছি এই মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই। মানা গ্রামের পথ-প্রদর্শক সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে মানা গ্রামে ফিরে যেতে মনস্থ করেছিল। আন্দ্রে কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল। তিনি তাঁর সঙ্গী নিয়ে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের কাছে সামান্য শীতবস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য অপ্রচুর। রাত্রিবাসের জন্য কোন আশ্রয় তাঁদের ছিল না। তবু তাঁরা এই দুর্গম পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

পথ অবশ্য সত্যই মারাত্মক, যত দূর দৃষ্টি চলে, শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও বা কয়েক ফুট গভীর কোথাও বা বেশী গভীর নরম বরফ। কোন কোন স্থানে বরফ খুবই নরম। পায়ের চাপে কোমর অবধি ডুবে যাচ্ছিল সবার। কোন কোন অঞ্চলে নরম বরফের ওপর দিয়ে শুয়ে দুহাত আর পা চালিয়ে সাঁতার কাটার মতো এগিয়ে গিয়েছিল।

সারাদিন চলতো একটানা ; সন্ধ্যা হতেই শুরু হত প্রচণ্ড তুষার ঝড়। একে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, তার ওপরে তুষার ঝড়, তখন পথ চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুষার ঝড়ের মধ্যে এমন সাংঘাতিক তুষারপাত হত যে পরস্পর পরস্পরকে যেন দেখতে পেতেন না। তাঁরা তখন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতেন দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করবার জন্য। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আন্দ্রে ও তাঁর সঙ্গীদের হাত পা মুখ সবই যেন অসাড় হয়ে এসেছিল। আন্দ্রে তখন আঙুল দিয়ে আঘাত করতেন দেহের অসাড় ভাবটা দূর করবার জন্য। আন্দ্রের বর্ণনায়—শরীরের অংশগুলোর যন্ত্রণা বোধ না থাকায় আমার বিশ্বাস হচ্ছিল যে শরীরের অংশগুলোর রক্ত সঞ্চালন বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পা জমে ফুলে গিয়েছিল। সেখানে কোন সাড় ছিল না। পরে সেখানে গরম লাল টুকটুকে লোহা দিয়ে ছুঁয়ে দিলেও হয়তো কোন বেদনা বোধ বা গরম লাগতো না। এই অবস্থায় ক্ষুধা বোধ ছিল না। শুধু অসম্ভব তৃষ্ণা বোধ। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মুঠো মুঠো বরফ খেতাম কিন্তু বরফ খেলেও তৃষ্ণা কমতো না। বিন্দুমাত্র জল অবশ্য ছিল, বরফের গভীরে—নীচের স্তরে জলের প্রবাহ ছিল। সেই জল গঙ্গার ধারা।

এমন করেই আন্দ্রে গিরিশিরার শীর্ষে পেঁীছে গিয়েছিলেন। সেখানে বিশাল হ্রদ, সেই হ্রদের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে পবিত্র গঙ্গার ধারা। সেই হ্রদ থেকে আরও একটি নদীর সৃষ্টি হয়ে তিব্বতেই প্রবাহিত হয়েছে।

আন্দ্রের এই অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ও তাঁর উক্তির শেষ অংশটুকুতেই অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর উক্তির প্রথম পরিচ্ছেদের অর্থ করতে গিয়ে মারখম্ সাহেব বলতে চেয়েছিলেন যে—দুর্গম তুষারাবৃত পথ অতিক্রম করে আন্দ্রে মানস সরোবরে পেঁীছে গিয়েছিলেন। এই ভুল উক্তিকে যথার্থ ভেবে Cyclopaedea of India বইয়ে অকাট্য তথ্য বলে স্থান পেয়েছিল। আন্দ্রের বক্তব্য যে—গঙ্গা ও সিন্ধুর উৎস মানস সরোবর। এই উল্লেখযোগ্য তথ্য Cyclopaedea of India বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

এই পথের যাত্রা শুরু করেছিল আন্দ্রে ১৬২৪ সনে। তদানীন্তন ভূগোল বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল—মানস সরোবর থেকেই গঙ্গা উদ্ভূত হয়েছে। আন্দ্রের উক্তি অনুসারে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অবশ্য তাঁর ভ্রমণ কাহিনী মারখম্ সাহেব অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ ও নকল করবার সময় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নয়।

১৬২৬ সনে আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বইয়ে কিন্তু পবিত্র হ্রদ সম্পর্কে একটি শব্দও লেখা ছিল না, ফলে পবিত্র হ্রদই যে মানস সরোবর এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। আন্দ্রের পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি পবিত্র বদ্রীনাথের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এমন সুপরিচিত পবিত্র হ্রদের নাম যাকে তিব্বতীয়রা সোমাভাঙ বলে থাকে, সে বিষয়ে নীরব। মারখমের বক্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে আয়েফার বলেছেন—প্রথম দিকটায় আন্দ্রে তাঁর ভ্রমণ বর্ণনায় কোন হ্রদের কথা উল্লেখ করেন নি, তবে ছোট হ্রদের কথা উল্লেখ করেছিলেন বর্ণনা প্রসঙ্গে। সেই হ্রদ মানা গিরিপথের ওপরে হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত। সেই হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে সরস্বতী নদী। আন্দ্রে সেই হ্রদের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন হ্রদটি তুষারাবৃত পর্বতে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের উপত্যকার ওপারে নয়, অর্থাৎ মানস সরোবরের যে পাশটায় অবস্থিত সে পাশটায় নয়। মারখম্ সাহেবের বর্ণনা তাই গ্রহণযোগ্য নয়। আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী পর্তুগীজ ভাষায় জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল ১৬২৬ সনে। তাই বাস্তব দৃষ্টিতে লেখা বর্ণনা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী অনুবাদ করেছিলেন মারখম্, সেই অনুবাদ নকল করেছিলেন হোলডিচ্ সাহেব। হোলডিচের কাছে তাই অনুবাদ বাস্তবানুগ বলে মনে হয়েছে।

আন্তনিও দ্য আন্দ্রের পর গঙ্গার পথ অনুসরণ করে উৎসের দিকে এগিয়ে ছিলেন আজেভেদো। ১৬৩১ সনের জুন মাসের আটাশ তারিখে আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিলেন গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। আগ্রা থেকে কানপুর, হরিদ্বার, ঋষিকেশ হয়ে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে আজেভেদো পেঁছে গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ। সেখান থেকে অলকানন্দার প্রবাহ লক্ষ্য করে হাজির হয়েছিলেন শ্রীনগর। পেঁছেই দেখেছিলেন শ্রীনগরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, কারণ শ্রীনগরের রাজা আকস্মিক দেহত্যাগ করেছেন। মহারাজার একমাত্র পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। নিয়ম অনুসারে সদ্য বিধবা রানীর মৃত রাজার সঙ্গে সহমরণে যাওয়া উচিত। সমস্ত শহরে তাই থমথমে আবহাওয়া। আজেভেদো ভারতীয় হিন্দুদের শবানুগমণ ও পারলৌকিক কার্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য আগ্রহ সহকারে হাজির হয়েছিলেন। আজেভেদোর হিমালয় ভ্রমণের আগ্রহ ছিল প্রচুর। বিশেষ করে গঙ্গার ধারা প্রত্যক্ষ করে উচ্চ হিমালয়ের ভ্রমণ করবার

উৎসাহ নিয়ে সুদূর আগ্রা থেকে এসেছিলেন শ্রীনগর। শ্রীনগর পেরিয়ে অলকানন্দার পথ ধরে এগুতে গেলে রাজার অনুমতি ও সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আন্দ্রে শ্রীনগরের মহারাজার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবু তাঁকে মানা গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে যাবার পথে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই আকস্মিক রাজার মৃত্যুতে আজেভেদো বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন। নতুন যুবরাজ, বিদেশী ভ্রমণকারীদের পূর্বে সুযোগ সুবিধাগুলো দেবেন কিনা সন্দেহ ছিল। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার কাহিনী আজেভেদো শুনেছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার লোভ সামলাতে পারছিলেন না। শ্মশানের কাছে গিয়ে দেখেছিলেন—চিতার স্থানে দর্শকের ভিড়। আগে থাকতেই বহু লোক জড়ো হয়েছিল। অলকানন্দার নীলাভ জলধারার তীরে মস্ত বড় চিতা সাজানো হয়েছিল। মহারাজার ষাটজন মহিষী, সবাই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবেন। স্তূপীকৃত চন্দনকাঠ ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু জড়ো করা হয়েছিল। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ করছিলেন উচ্চৈঃস্বরে। চিতার পাশেই ষাটজন মহিষী উপবিষ্টা। তাঁদের দেহ ও মুখ মলিন, চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন বর্তমান। পাশেই বিশাল রাজকীয় বাদ্য ভাণ্ডার। সেই বাদ্য ভাণ্ডারের মধ্যে ঢাক, ঢোল, জগঝম্প, বাঁশী, শিঙ্গা। বেশ শক্তিশালী পুরোহিতগণ মহিষীদের মন্ত্রপাঠ করাচ্ছিলেন। ভীতা, সন্ত্রস্তা, মহিষীদের অনেকেরই কান্নার রোল চাপা পড়ে যাচ্ছিল বাদ্য ভাণ্ডারের শব্দে। আজেভেদো ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্দ হয়ে দেখেছিলেন—ষাটজন মহিষীদের মধ্যে মাত্র গুটি কয়েক স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর দেহ প্রদক্ষিণ করে চিতায় আরোহণ করেছিলেন, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটছট করেছিলেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ-কারিণী গুটি কয়েক মহিষী। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অন্যান্য মহিষীরা তারস্বরে আর্তনাদ করছিলেন। তাঁদের তখন জোর করে, শেষটায় হাত পা বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে। ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা—বাদ্যযন্ত্রের শব্দের মধ্যে সমবেত দর্শকদের আর পুরোহিতদের পৈশাচিক উল্লাস অলকানন্দার কলোচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে উঠেছিল। চিতার আগুনের শিখা যেন আকাশ স্পর্শ করেছিল। আজেভেদো দু'চোখ বন্ধ করে দু'কান ঢেকে দারুণ ত্রাসে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন।

এই পৈশাচিক ঘটনার সাতদিন অতিবাহিত হবার পর মৃত রাজার সাত বৎসর বয়স্ক নাবালক রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষেক করবার সময়

এসেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ ও সৈন্য দলের অনেকেই বিদ্রোহী হয়েছিল। বিদ্রোহীদের দলপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আজেভেদোকে বাধ্য হয়েই শ্রীনগরে অবস্থান করতে হয়েছিল দিন কয়েক। রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা. ঠিক এমনি সময়ে মানাগ্রাম থেকে ম্যানুয়েল মার্কুইস্ শ্রীনগরে এসে হাজির হয়েছিলেন রসদ সংগ্রহ করবার আশায়। আজেভেদোর কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে দ্রুত শ্রীনগর ত্যাগ করা স্থির করে-ছিলেন। মার্কুইসকে সঙ্গী পেয়ে ৩১শে জুলাই শ্রীনগর ত্যাগ করে অলকানন্দার তীর ধরে পেঁছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ। সেখান থেকে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ থেকে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন মানা গ্রামে। সেই গ্রামের অবস্থা দৈন্যদুর্দশাযুক্ত। ছোটখাটো ভাঙাচোরা কুটির, গ্রামবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মেষ পালন করতে হয়। ছাগল ও মেষের পিঠে চাল নিয়ে আসতো তিব্বত থেকে। এদিক থেকে নিয়ে যেতো লবণ। নিম্ন উপত্যকার জঙ্গলে কস্তুরী মৃগ দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর, গ্রামবাসীরা কস্তুরী সংগ্রহ করে অর্থোপার্জন করতো। মানাগ্রামে মার্কুইস পিছিয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তাঁর মালবাহী ছাগল-গুলো একসঙ্গে জড়ো করতে হয়েছিল মানা গিরিপথ অতিক্রম করবার আগে। আজেভেদো নিজেই মানা গিরিপথ পেরুবার পর প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন বিশাল পর্বত শিখর-দ্য সেরা-দ্য কান্তা অর্থাৎ কামেট শিখর। আজেভেদো লিখেছিলেন—আমি একটি অপরূপ সরোবর দেখতে পেলাম ; সেই সরোবর থেকেই গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে। এই সংবাদ আমি স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। গঙ্গা উৎস থেকে বেরিয়েই দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সিন্ধু নদ অবশ্য উৎস থেকে বেরিয়েই উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীদুটির ধারা পরস্পর থেকে বহুদূরে প্রবাহিত। নদী দুটির জলধারা বাহ্যত দৃশ্যমান নয়, পাথরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ; ধারা না দেখা গেলেও জলকল্লোলের শব্দ শোনা যায়। গঙ্গার ধারা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হবার পর দেখা যায় ছোট বড় জলধারা। এইসব ছোট বড় জলধারা পুষ্ট করেছে মুখ্য ধারাকে। এমনি করেই গঙ্গা উচ্চভূমি হতে অবতরণ করে হিন্দুস্থানে প্রবাহিত হয়ে সমতলে এসেছে। তখন গঙ্গা পূর্ববাহিনী—এই ভাবে গঙ্গা এসে বাঙলা দেশে প্রবেশ করে সাগরে মিলিত হয়েছে।

আজেভেদোর পর গঙ্গার উৎস পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ফাদার দেসদেরী

১৭১৫ সনে। তিব্বতের উচ্চ মালভূমির উপর দিয়ে পথের রেখা ধরে রসদ নিয়ে সহযাত্রীসহ তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন টোকচেন। অদ্ভুত সমতল জায়গা, সে স্থানটি বালুকাপূর্ণ। মাঝে মাঝে সামান্য ঘাসের চিহ্ন। সেখান চরে বেড়াচ্ছিল কতকগুলো ইয়াক আর ঘোড়া। ওগুলোর সবই নাকি দালাই লামার। টোকচেনে দুদিন অবস্থান করবার পর দেসদেরী ও তাঁর সহযাত্রীরা এক পবিত্র হ্রদের কাছে এসে পেঁছে ছিলেন। হ্রদটির নাম মানস সরোবর, হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, তাঁদের পুরাণে এই স্থানের মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ করে লেখা রয়েছে। ডিসেম্বরের শুরু। দেসদেরী লিখেছিলেন—আরো কিছু পথ অতিক্রম করবার পর একটি সমতল স্থানে পেঁছে গেলাম। শুনলাম, স্থানটির নাম বেতোয়া। সেখানে আরও একটি বড় হ্রদ দেখতে পেলাম, সে হ্রদ প্রদক্ষিণ করতে কয়েকদিন লেগেছিল। সেখান থেকেই সম্ভবত গঙ্গা নদী আত্মপ্রকাশ করেছে। দেসদেরী লিখেছেন—এ সম্পর্কে যদি আমার মতামত নেওয়া হয়, তাহলে বলবো আমার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে, আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞ কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল সামনের এই পর্বতমালার নাম ভানারি-জিওন-গারা। এখান থেকে শুধু যে গঙ্গানদী উৎপন্ন হয়েছে তাই নয়, সিন্ধু নদও এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কারণ, এই স্থানটিই সব চাইতে উচ্চ, যার দু পাশটা ঢালু। জল বৃষ্টিরই হোক বা অন্য কিছুরই হোক, গড়িয়ে পশ্চিম দিকের ঢালে প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় তিব্বতে (লাডাক)। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে বালতিস্থানে ও কাশ্মীরে। সর্বশেষে জলের ধারা প্রবাহিত হয়েছে ছোট্ট গুজরাটে। সেখান থেকে নদী প্রশস্ত ও নৌচলাচল উপযোগী। এই জলধারার নাম সিন্ধু। তেমনি ভানারি-জিওন-গারা পূর্ব দিকের ঢাল থেকে যে নদী নির্গত হয়েছে, সে জলধারা প্রথম রেটন হ্রদে প্রবেশ করেছে। তারপর সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে নিম্ন ঢালু পথে এগিয়ে গঙ্গা নামে পরিচিত হয়েছে। গঙ্গার ধারা সম্পর্কে আমার এই ধারণা। আমাদের পূর্ব পুরুষদের লেখা থেকে জানা যায় যে গঙ্গার বালুকাময় তটভূমিতে সোনা রয়েছে ছড়ানো। ধরা যাক, নদীর উৎসে যদি সত্যিই সোনা থাকে, তাহলে গঙ্গার উৎস দেখতে ভানারি-জিওন-গারা পর্বতমালার দিকে যাওয়া যায়, তাহলে রেটন হ্রদে বা রেভকে যথার্থ তথ্য পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সর্বত্র গল্প আছে যে, হ্রদের তীরে বালুর মধ্যে সোনার গুঁড়ো রয়েছে, সেই সোনা পর্বতের গিরিশিরার ওপর থেকে বাহিত হয়। তিব্বতী ও অন্য ব্যবসায়ীরা হ্রদের কাছ থেকে সোনা সংগ্রহ করে

প্রচুর লাভবান হয়। এই হ্রদের কাছাকাছি লোকেরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই হ্রদ পরিক্রমা করলে তীর্থযাত্রীরা মনে করে, তাঁরা পুণ্য লাভ করেছেন।

॥ ৮ ॥

সর্বেং পুণ্যং হিমবতো গঙ্গা পুণ্যা চ সর্বতঃ।

গঙ্গার উৎস সন্ধানে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পরিক্রমা করেছিলেন তিনজন বিদেশী মিশনারী অভিযাত্রী সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে। যদিও তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিষিদ্ধ রাজ্য তিব্বতে প্রবেশ করে খৃস্টধর্ম প্রচার করা, তবু গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎসে পেঁীছে যাবার কল্পনা হয়তো করেছিলেন। তিব্বতে প্রবেশ করবার জন্য যে পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল সে পথ নদীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়েছে। যে পথ দুর্গম হলেও সম্ভব, সেই পথই হয়তো বা সুদূর অতীতের প্রচলিত পথ।

প্রথম অভিযাত্রী—আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী তথ্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভ্রমণ বার্তায় ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখার ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। সুদূর অতীত যুগ থেকে গঙ্গার উৎস নিয়ে অনেক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী গঙ্গা হিমালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবার পূর্বে মূল উৎস বিন্দুসরোবর থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। মূল উৎসের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ভাবে আলোচনা করেছেন। এই সরোবরের অস্তিত্ব নিয়ে অবশ্য বিদেশী ভূগোল বিজ্ঞানীগণ সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু সুদূর অতীতকালের তীর্থযাত্রীদের মনে অবশ্য এই বিন্দুসরোবরের অবস্থান নানাভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রোপদী বদ্রীনাথধাম দর্শন করবার পর অন্য তীর্থস্থানের মধ্যে বিন্দু সরোবর দর্শন করেছিলেন। বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব যে ছিল না একথা বলা যায় না।

কারো কারো ধারণা, বিন্দুসরোবর আসলে মানস সরোবর। কেউ কেউ ভাবেন রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদ। এ ধরনের ধারণার পেছনে হয়তো বা কোন যুক্তি ছিল না। অতীতের তীর্থযাত্রীরা মানস সরোবর

পরিক্রমায় আসতেন। রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদও তাঁদের অপরিচিত ছিল ছিল না। তাই মানস সরোবর পরিক্রমার সময় এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত জলধারা অতিক্রম করতে হত তাঁদের। এমনি নানা যুগের দুঃসাহসী তীর্থযাত্রীদের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রভাবান্বিত হতেন ভ্রমণকারীরা। আন্দ্রের ভ্রমণকাহিনীর ভেতর থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসরণ করে কেউ মানচিত্র রচনা করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে সে যুগে গঙ্গার গতি-পথ চিহ্নিত করে এশিয়া ও ভারতবর্ষে যে কয়েকটি মানচিত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল তার মধ্যে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে।

আজ থেকে আড়াই শ বৎসর পূর্বের কথা। একটি চীনা সামরিক দলের সহযাত্রী ১৭১১ সনে তিব্বতে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন বিশেষ প্রয়োজন বোধেই। তিব্বতের এই প্রথম মানচিত্রটিকে পরীক্ষা করাবার জন্য পিকিং-এ অবস্থানরত ফাদার রেগিজের কাছে পাঠানো হয়েছিল সত্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। প্রথম মানচিত্র সাধারণ ভাবেই অঙ্কিত হয়েছিল। রেগিজ এই ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, মানচিত্রটি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভাবে অঙ্কন করা হয়েছিল। অঙ্কন কার্যের সময় কোন তথ্য, যথা—স্থানীয় অঞ্চলগুলির দূরত্ব. ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ কোন কিছুই অনুসরণ করা হয় নি। ফলে মানচিত্রটি হয়েছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্র লক্ষ্য করে তদানীন্তন চীন সম্রাট কাঙ্হি একটি নিখুঁত মানচিত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুজন অভিজ্ঞ লামাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিব্বতে। তাঁরা অবশ্য চীনা কলেজে অধ্যয়ন করে জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তিব্বতে যাত্রা করবার পূর্বেই। এই অভিযানে চীন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সাহায্য করেছিলেন নানা ভাবে। মানচিত্র রচনা সম্পর্কে সম্রাট নির্দেশ দিয়েছিলেন লামা দুজনকে। নির্দেশ ছিল তাঁরা সি-নিন্ থেকে লাসা, সেখান থেকে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে পরিভ্রমণ করবে। সেই অঞ্চলগুলো জরিপ করতে হবে। পরিভ্রমণের সময় গঙ্গার উৎসস্থলে পৌঁছে পর্যবেক্ষণ করবে। ফেরবার সময় উৎস থেকে গঙ্গার জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে পিকিং। সম্রাট কাঙ্হির সামনে উপস্থাপিত করতে হবে সংগৃহীত গঙ্গার জল সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ।

সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে লামা দুজন পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৭১৭ সনে সেই বহু প্রত্যাশিত মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু মানচিত্রটির

সত্যতা যাচাই করবার জন্য মিশনারীদের হাতে পেঁছে দেওয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত মিশনারী দ্য হ্যালডেন মানচিত্রটি নির্মাণ করবার জন্য সংগৃহীত তথ্য, জরিপের স্থান, যাত্রাপথের পথপঞ্জী পরীক্ষা করেছিলেন। তদনুসারে হ্যালডেন তিব্বতের মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। লামা দুজন সম্রাটের নির্দেশে যখন তিব্বতে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন জরিপ করবার উদ্দেশ্যে, ঠিক সেই সময় তিব্বতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। লাসার সমস্ত মঠ, প্রাসাদ লুণ্ঠন হয়েছিল নির্বিচারে। লামাদের বস্তাবন্দী করে উটের পিঠে চাপিয়ে তাতারে পাচার করা হয়েছিল। এই সব বন্দী লামাদের ভেতর থেকে জরিপকারী দুজন লামা কোনক্রমে পালিয়ে এসেছিলেন। বিদ্রোহের পূর্বে লাসার মঠের প্রধান লামার কাছ থেকে মোটামুটি স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব সংবাদের ভিত্তিতে নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্য নির্দেশিত হয়েছিল মানচিত্রে। ফলে গঙ্গার গতিপথ সরজমিনে জরিপ করা সম্ভব হয় নি। জরিপ করবার সময় লামারা কেনু[১] টেইসে পর্বত বা কানেৎ[২] সেসান পর্বতের অক্ষাংশ নির্ণয় করতে পারেন নি। তারা গঙ্গার উৎস[৩] মাপা-বার ভৌগোলিক অবস্থানও নির্ধারণ করতে পারেন নি। যথাযথভাবে, এমন কি পদযাত্রার সময় তাঁরা যেসব মঠে অবস্থান করেছিলেন সেগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সংগ্রহ করেন নি। বিশেষ করে যে মঠে অবস্থানকালে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সে মঠের ভৌগোলিক অবস্থানও নির্দেশিত হয় নি। গঙ্গা যে কেনটেইসে পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে উৎসারিত হয়েছে, প্রামাণ্য তথ্যস্বরূপ সেখানকার অক্ষাংশও নির্ধারিত হয় নি। লামাদের অঙ্কিত মানচিত্র প্রকাশিত হবার পর অন্যান্য মিশনারীরা এইসব তথ্যগত ত্রুটি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করে মানচিত্রটির সত্যতা নতুন করে নির্ধারিত করবার প্রয়োজনীতা অনুভব করেছিলেন। তাঁরা এই মানচিত্রটি কোন প্রখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানীর সামনে পেশ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তদনুযায়ী দ্য অ্যানভেলিসের ওপরে লামাদের মানচিত্র পরীক্ষা করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। মানচিত্রটি পরীক্ষা করে অ্যানভেলিস লক্ষ্য করেছিলেন যে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গার উৎস স্থানকে ২৯½° অক্ষাংশ উত্তর হিসাবে চিহ্নিত ছিল। লামাদের অঙ্কিত মানচিত্র সংস্কার সাধন করে দ্য হ্যালডেন যেটি প্রকাশ করেছিলেন—সে মানচিত্রে গঙ্গার উৎসস্থান ৩২° অক্ষাংশ উত্তর দেখানো হয়েছিল। কিন্তু অ্যানভেলিস মনে করেছিলেন—গঙ্গার উৎস স্থান

---

১. ২. কৈলাস পর্বত।

৩. মানস সরোবর

আরো উত্তরাংশে হওয়া উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ৩৬° উত্তর দেখানো হয়েছিল। সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করে দ্য অ্যানভেলিস ১৭৩৩ সনে একটি মানচিত্র রচনা করে গঙ্গায় গতিপথ নির্দেশিত করেছিলেন।

লামা অভিযাত্রী দুজন তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরা নদীর উৎসে অর্থাৎ মানস সরোবরে পেঁছে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেই হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তুষারমণ্ডিত কৈলাসপর্বত। সাঙপো[4] নদী উৎপন্ন হয়েছে তার পূর্বদিক থেকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা মানস সরোবরে উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে সব কিছু পরীক্ষা করতে পারেন নি, ফলে অভিযাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য অনু-সারেই রচিত হয়েছিল প্রথম মানচিত্র। মানচিত্রটির সত্যতার উপর নির্ভর করা যায় নি বলেই দ্য হ্যালডেন, পরে দ্য অ্যানভেলিস যে মানচিত্র দুটি প্রকাশ করেছিল তাতে মূল তথ্যের পরিবর্তন কিছু ছিল না। শুধু গঙ্গার উৎস স্হানকে উত্তর দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ফলে ১৭১১ সন থেকে শুরু করে ১৭৩৩ সন পর্যন্ত যে চারটি মানচিত্র অঙ্কিত হয়ে-ছিল তাতে গঙ্গার উৎস স্থান—মানস সরোবর। কৈলাস পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্হিত সেই উৎস স্হান। উৎস সম্পর্কে মূল তথ্য থেকে এইসব মানচিত্র রচয়িতারা বিচ্যুত হন নি।

১৭৩৩ সনের পর গঙ্গার উৎস ও গঙ্গার ধারা নির্দেশিত করে আর একটি মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল ১৮৮৪ সনে। এই মানচিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন অ্যাংকুইটিল দ্য প্যারন। অ্যাংকুইটিল দ্য প্যারন ১৭৭৬ সনে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রটিকে ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই মানচিত্র অঙ্কনকে আদৌ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বেশ জোরালো সমালোচনা করেছিলেন। লামাদের জরিপ সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছিলেন সবার সমক্ষে। তাঁর আলোচনা তাই যুক্তিপূর্ণ ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় নদীর উৎস ও ধারা চিহ্নিত করবার জন্য কোন উপযুক্ত ভূগোল বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় নি। নদী যে বিখ্যাত পর্বত বা পর্বতশ্রেণীর বিপরীত দিক থেকে উৎসারিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলির নির্ভরশীলতা পরীক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ভূগোল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সে সবগুলো অনুপযুক্ত ভূগোলতত্ত্ববিদ্ তড়িঘড়ি করে সংগ্রহ করেছিলেন। কারণ, লামারা এ বিষয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করেন নি। তাঁরা যা কিছু পর্যবেক্ষণ

৪. ব্রহ্মপুত্র।

করেছিলেন সেইগুলিই, জরিপ করবার সময় কোন অঞ্চল দেখেছিলেন বলে দাবি করেন নি। তাঁদের বর্ণিত পথ ও জরিপ অবশ্য দ্য হ্যালডেনের মানচিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। লামারা বলেন নি যে তাঁরা বিখ্যাত মা-পামা হ্রদের কাছে গিয়েছিলেন বা কেনুটেইসে পর্বতের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য পূর্বে লামারা এই বিখ্যাত পর্বতকে পর্বতশ্রেণী বলেছিলেন; সেই পর্বতশ্রেণীই চীনারা তিব্বতের পশ্চিমদিকের পর্বতশ্রেণী বলে উল্লেখ করেছে ; এই পর্বতশ্রেণীই দ্য হ্যালডেনের মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছিল। লামাদের আসল মানচিত্র অবশ্য প্রকাশ করেছিলেন স্যুচেত্। সেই মানচিত্রে লামাদের জরিপের শেষ স্থানটি ও হ্রদের কথা লেখা ছিল। লামাদের মানচিত্রে যেসব নির্ভরশীল তথ্য ছিল—সেগুলি যে পর্বতশ্রেণীতে লামা দুজন পৌঁছেছিলেন, সেই পর্বতশ্রেণী তিব্বতকে দক্ষিণ পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে। এই পর্বতশ্রেণীর বিপরীত দিক থেকে গঙ্গা নদী নির্গত হয়েছে। কিন্তু নদীর গতিপথ মানচিত্রে চিহ্নিত করবার সময় দেখা গিয়েছে যে—সেখানকার দ্রাঘিমাংশ ৩৬° (পিকিং থেকে হিসেব করে), নদীর ধারা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ৪২°, সেখানে নদীর দুটি ধারা দেখানো হয়েছে। সেখানে নদী দক্ষিণে অগ্রসর হবার পর প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম দিকে। অ্যাংকুইটিল দ্য প্যারিনই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। তিনিই লামাদের সংগৃহীত গঙ্গার উৎস সম্পর্কে সমস্ত তথ্য বাতিল করবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। লামা-দের সংগৃহীত গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সম্পর্কিত ভৌগোলিক গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় মিশনারী যোশেফ টিয়েফেনথালার ১৭৮৪ সনে। সেই গবেষণা গ্রন্থের নাম হিস্টরিক্যাল জিওগ্র্যাফিক বিয়েচারিবাং ডন্ হিন্দুস্থান। টিয়েফেনথালারের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্যারন একটি নির্ভরশীল মানচিত্র রচনা করেছিলেন। টিয়েফেনথালার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করেন নি। যে সরযূ নদী মানস সরোবর থেকে উৎসারিত হয়ে হিন্দুস্থানের সমতলে প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহও মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল। দেবপ্রয়াগ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত গঙ্গার ধারাও চিহ্নিত হয়েছিল। লামাদের মানচিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ রেখে দ্য হ্যালডেন ও অ্যানভেলিসের মানচিত্রের কথা ভেবেই প্যারন হয়তো নির্ভুল মানচিত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মানচিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উডেসু বনিন বলেছিলেন যে—মানচিত্রে মানস সরোবর ও রাক্ষস তাল, এই দুটি হ্রদ একটি জলধারার সঙ্গে যুক্ত। ১৯০৪ সনে রায়ডর স্বচক্ষে এই ধারা লক্ষ্য করে এসেছিলেন। এই জলধারা স্থানীয়

তিব্বতীয়রা গঙ্গা চ্যু বলে উল্লেখ করেছিল। রায়ডর বেশ জোরের সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন গঙ্গা সম্পর্কে। তাঁর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মিশনারী দেশদেরীর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দেখা যায়—গঙ্গার উৎস সম্পর্কে মানস সরোবর ছাড়া অন্য কোন হ্রদের কথা বলতে চান নি। তাঁর রচনায় মানস সরোবরের জল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া রয়েছে। অতীত যুগের মানুষদের বিশ্বাস ছিল যে জলধারার নাম গঙ্গা চ্যু। 'চ্যু' শব্দের তিব্বতীয় ভাষায় অর্থ—নদী। সুতরাং গঙ্গা চ্যুর অর্থ গঙ্গা নদী। দেসদেরী স্থানীয় অধিবাসীদের বদ্ধমূল ধারণার বিরোধিতা করতে চান নি। মানস সরোবর রাক্ষসতালের সংযোগ স্থলে যে জলধারা রয়েছে তার নাম গঙ্গা চ্যু। দেসদেরী তাঁর ভ্রমণ বিবরণে উল্লেখ করলেও গঙ্গার উৎস নিয়ে কোন বিতর্কের সম্মুখীন হতে চান নি। রায়ডর কিন্তু গঙ্গা সম্পর্কে প্রকাশ করে প্যারনের মানচিত্রকে সঠিক বলে নির্দেশিত করেছিলেন। কিন্তু এই উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের লেখকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভুল তথ্য, তারও পূর্বে আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনীতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তথ্য, এইসব মিলে গঙ্গার সত্যিকারের উৎস সম্পর্কে নানা সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছিল। ১৬৬৭ সনে আথানা সিয়ার্স কির্চার এস্. জেঃ চীনের একটি জার্নালে আন্দ্রের ভ্রমণ বার্তায় একই ভুলের উল্লেখ দেখা গিয়েছিল, সেখানে আরও ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণকারী লাহোর থেকে রওনা হয়ে চলতে চলতে গঙ্গা অতিক্রম করে আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীনগর ও ছিয়াফারাঙ্ (সার্পারাঙ্)। বেশ বড় ও জনবহুল শহর দুটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনি করেই এগুতে এগুতে উচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করে পেঁৗছেছিলেন বিশাল হ্রদের সামনে, সেই হ্রদের সামনে, সেই হ্রদ থেকে বেরিয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ভারতের আরো সুদীর্ঘ নদীগুলি। কির্চারের বইয়ের শুরুতেই কয়েক পাতা নদীগুলোর উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে গঙ্গার উৎস যে ঐ হ্রদ, সেটি চিহ্নিত হয়েছিল। এই তথ্য সম্পর্কে কির্চার বলেছিলেন যে, এই তথ্যটি হিন্দু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। আন্দ্রের দলের একজন সঙ্গী যোশেফ তখন ছিলেন রোমে, তখন তাঁর বয়স প্রায় ছিয়াশী বৎসর। আন্দ্রের সামনেই বসে তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বের স্মৃতি, দীর্ঘদিন পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, খুঁটিনাটি ঘটনার কতটাই বা মনে থাকতে পারে? আন্দ্রে, আর্জেভেদো ও দেসদেরীর সংগৃহীত তথ্য বিচার করে মারখম্ সাহেব বলেছিলেন যে সম্ভবতঃ প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গঙ্গার উৎস হিন্দুদের

নানা স্মৃতিতে ভরা, নানা অপরূপ চিত্রে চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে। প্রখ্যাত অভিযাত্রী স্বেন হেডিনের বিশ্বাস যে কির্চারের হয়তো বা মানস সরোবর সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হিন্দু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে আহরিত। ফাদার রফ. এস. জে. ফাদার গ্রোবারের সঙ্গী। আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী তাঁরা সযত্নে পড়েছিলেন। সে থেকে মনে হয় কির্চারের ধ্যান ধারণা আন্দ্রের বিশ্বাসকে পুরোপুরিভাবেই অনুসরণ করেছে। তিনি অবশ্য নিজেই ঐ সম্পর্কে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায় নি। বরং আন্দ্রের বক্তব্যকে বিশ্বাস করে তিনি আরো নতুন করে ভুল করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে। কারণ আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী রায়-ডরের মারফৎ চীনে তাঙ্গুত্ ও তাতার থেকে এসেছিল। আন্দ্রের বইয়ের স্বল্প প্রচার আর কির্চারের বইয়ের বহুল প্রচারের ফলে, লেখায় বহুবার পুনরুক্তি করা হয়েছে অনেক তথ্য সম্পর্কে। তার অর্থ, ভুল তথ্য বার বার লেখা, বার বার বহু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা। তাই পাঠক-দের মনে সেই ভুল তথ্যই গেঁথে রয়েছে। আন্দ্রের ভ্রমণ বর্ণনার সমর্থন-যোগ্য তথ্যগুলো অনুধাবন করা যেতে পারে।

গঙ্গার মূল প্রবাহ হিমালয়ের অনেকগুলো জলধারায় পুষ্ট। বুরার্ড বলেছেন—গঙ্গার বিভিন্ন ধারা বড় বড় হিমবাহ থেকে এসেছে। ১৮১৭ সনে জে. হার্বার্ট ও ক্যাহজবসন্ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে এসেছিলেন। ভাগীরথী নদী গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফ গলে জন্মলাভ করেছিল। সেই স্থানটিই ভাগীরথীর উৎস। ১৮৫২ সনে হার্বার্টের তথ্যটির প্রতিবাদ করেছিলেন রিচার্ড স্ট্র্যাচী, তাঁর ভাই জন স্ট্র্যাচী এই সম্পর্কে লিখেছিলেন—ভারতবর্ষের ভূগোলের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একই কথা বলা হয়েছে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে, গঙ্গা হিমবাহের বরফ থেকে উদ্ভূত। হিন্দুদের পবিত্র পুঁথিতে গোমুখ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পৌরাণিক তথ্য, হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর সাধারণের ধারণা, গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গা উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু যথার্থ ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, গঙ্গোত্রী কখনই গঙ্গার উৎস হওয়া উচিত নয়। গঙ্গার অন্যান্য ধারার মধ্যে মুখ্য ধারা অলকানন্দা। এই ধারাই সব চাইতে দীর্ঘ। ভাগীরথীর তুলনায় অলকানন্দা সবচাইতে বেশী পরিমাণ জল বহন করে। অলকানন্দার শেষ প্রান্তে উৎস স্থান তিব্বত সীমানায় নিতি ও মানা গিরিপথের দক্ষিণে জল-বিভাজিকার সন্নিকটে, নদীর সমস্ত জল গাড়োয়াল কুমায়ুনের নন্দাদেবী, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, শিখর ও হিমবাহগুলি থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সুতরাং আন্দ্রে মানা গিরিপথে বিষ্ণু গঙ্গার উৎসে পেঁৗছেছিলেন। তাঁর

বর্ণনায় সেখানে তিনি একটি বড় জলাশয় দেখেছিলেন। সেই জলাশয়ের একপাশ দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করেছিল তিব্বতের দিকে। জন ওয়াকার ১৮২৭ সনে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, সেই মানচিত্রে দেবতাল বলে একটি হ্রদের অবস্থান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেই হ্রদ থেকে উৎসারিত কোন জলধারা তিব্বতে প্রবাহিত হয়েছে এমন ভাবে চিহ্নিত করেন নি। ওয়াকারকে অনুসরণ করে ১৮৩২ সনে ব্রিটার হিমালয় পর্বতমালার একটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। পরবর্তীকালে মানচিত্রে দেবতাল হ্রদটি আর দেখা যায় নি। মনে হয়েছিল, ওয়াকারের মানচিত্রটি যথার্থ সত্য বলে স্বীকৃত হয় নি। ওয়াকার হয়তো বা ভুল করেছিলেন। অবশ্য ডঃ হার্ম্ হক্ অফ্‌গথারের কাছে এই রহস্য সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। হার্ম্ অবশ্য কষ্ট করে তাঁর সংগৃহীত মানচিত্রগুলি পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন।

দেবতাল সরকারী মানচিত্রে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। পরে হ্রদটি অদৃশ্য হতে চলেছিল মানচিত্র থেকে। সেই সময় হ্রদটি অদৃশ্য হলেও মানচিত্রে চিহ্নিত ছিল। পরে অবশ্য হ্রদের অবস্থানের উল্লেখ পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল। এতেও রহস্যের সুরাহা না হওয়ায় সন্দেহ ছিল পুরোপুরিভাবে। পরে অবশ্য সমস্যা সমাধান করেছিলেন স্যার এস্. ডি. বুরার্ড। তখন তিনি ভারত সরকারের সার্ভেয়র জেনারেল। বুরার্ড সাহেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত সংশয় নিরসন করেছিলেন।

সরস্বতী নদী মানা গিরিপথের কুড়ি মাইল দূরে কামেট গিরিশৃঙ্গের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মানা গিরিপথ থেকে নেমে আসা হিমবাহ গিরিপথের দক্ষিণ দিকে এসেছে। সেইখানেই সরস্বতী বা বিষ্ণুগঙ্গার উৎস। এই হিমবাহ নেমে গিয়ে একটি হ্রদে এসে মিলিয়ে গেছে। হ্রদটির নাম দেবতাল। মানচিত্রে এই নামে চিহ্নিত হয়েছিল। এই হ্রদ প্রায় চারশ গজ দীর্ঘ। হ্রদের এক অংশ পার্শ্বগ্রাবরেখা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে একটি হিমবাহ নেমে এসেছে পশ্চিম প্রান্ত থেকে। দেবতালের উচ্চতা ১৭২০০ ফুট। ঠিক সামান্য ঢালু দিকটায় দেবতালের কাছেই অপর একটি ছোট হ্রদ রয়েছে। সেই হ্রদটির নাম রাক্ষসতাল। দেবতাল ও রাক্ষসতাল দুটোই ভারতীয় মানচিত্রে (১″ = ৪ মাইল) রয়েছে। হ্রদ দুটি এত ছোট যে মানচিত্রে সাধারণ ভাবে চিহ্নিত। এই তথ্য অনেক সময় বিভ্রান্ত করতে পারে ভ্রমণকারীদের। এ থেকে প্রমাণ হয়, ওয়াকারের মানচিত্রে সত্যতা কতটুকু? দেবতাল ও রাক্ষসতালের

রহস্য সমাধানের পর একটি তথ্য খুঁজে বার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে হচ্ছে—আন্দ্রে বলতে চেয়েছিলেন যে—দেবতাল থেকে একটি নদী নেমে গিয়েছে তিব্বতের মালভূমির দিকে। কিন্তু এ ব্যাপার হতেই পারে না। কারণ, হ্রদটি মানা গিরিপথের দক্ষিণ ঢালের দিকটায় অবস্থিত। নীচের দিকটায় অবস্থিত জলধারা উঁচু ঢাল বেয়ে অপর প্রান্তে তিব্বতে প্রবাহিত হবে কেমন করে? আন্দ্রের বর্ণনার ব্যাখ্যা করা তাই মুশকিল। তাঁর লেখা পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষান্তরকালে দেখা যায়:—"এইভাবে যাত্রা অব্যাহত ছিল। সামনে গিরিশিরার কাছে পেঁছেই দেখা গেল গঙ্গার জলধারা। সেই জলধারা গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত বড় হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হ্রদের অপর প্রান্তে আর একটি ধারা নেমে গিয়েছে তিব্বতের ঢালু ভূমিতে। যদি একই অর্থাৎ এক গিরি-শিরার শীর্ষের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে সব সমস্যা সুরাহা হয়। কারণ মানা গিরিপথের ঢালের উত্তরের দিকটায় একটি ছোট্ট নদী রয়েছে। সেই নদী প্রবাহিত হয়ে টটলিঙ্ পর্যন্ত এগিয়ে পরে সাটলেজের ধারায় এসে মিলিত হয়েছে।"

আন্দ্রের বর্ণনার অর্থ ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর লেখায় অনেক ব্যাকরণগত ভুল ছিল। তিনি এমন কতগুলো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে অর্থ ঠিক পরিষ্কার হয় নি। মনে হয়, তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর লেখায় ঠিক তা প্রকাশিত হয় নি। ফলে, এমন অর্থ ভাবা যেতে পারে, যাতে আন্দ্রের লেখার অসামঞ্জস্যতা দূর হতে পারে। আন্দ্রে যে অবস্থায় ভ্রমণ করেছিলেন সে পরিবেশ এবং যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে এই দুর্গম পথ পেরিয়েছিলেন তার মধ্যে সব সময়ই সব কথা যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন নি। আবহাওয়া, পরিবেশ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তথ্যগত সামঞ্জস্যের অভাব থাকলেও তাঁর বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চিত বিষ্ণুগঙ্গার উৎসে পেঁছে গিয়েছিলেন। মানা গিরিপথ অতিক্রম করে ছোট্ট জলধারা যা টটলিঙে প্রবাহিত হয়েছে সেইটিই দেখেছিলেন। সেই জলধারা হ্রদ থেকে উৎসারিত হয়ে কোথাও পাথর, কোথাও বা বরফের ভেতর দিয়ে লুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। বরং ধারাটি প্রকাশ্যে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল টটলিঙে। মানা গিরিপথের দু পাশের ধারা দুটির অবস্থান সম্বন্ধে হেডিন্ অবশ্য বলেছিলেন যে জলধারার উৎস মানা গিরিপথ বা

তার নিকটবর্তী অঞ্চল। সেটি তিব্বতে প্রবেশ করেছে, পরে সাটলেজে এসে মিলিত হয়েছে টটলিঙের কাছে।

কিন্তু যিনি যত বড় ব্যাখ্যাই করুন না কেন, একথা মেনে নেওয়া মুশকিল যে আন্দ্রে এই অভিযানে যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে মানস সরোবর দর্শন অন্যতম। তাঁর ভ্রমণ পথ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মানা গিরিপথ পেরিয়ে যাবার পর তিব্বতের বিশাল ভূখণ্ড দেখতে পেয়েছিলেন। তার পেছনে সামনে বড় বড় পর্বতশৃঙ্গ, সেগুলো তাঁর এগিয়ে যাবার পথে বিশাল বাধা।

আন্দ্রে লিখেছিলেন—

"আমাদের চোখের সামনে শুভ্রতার বিস্ময়কর ঝলক। বরফের সামনে আস্তে আস্তে আমাদের চোখের জ্যোতি যেন ক্ষীণ হতে থাকলো। এক সময় আমরা তুষার শুভ্রতার ঔজ্জ্বল্যে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি হারিয়ে ফেললাম। চারদিক যেন অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে, রাস্তা দেখে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হতে শুরু হয়েছিল। সবচাইতে সাংঘাতিক বিপদ—আমার সঙ্গী দুজনের জন্য। তাঁদের চোখের দুর্বলতা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলায় স্থির করলাম, ওঁদের দুজনকে যেমন করেই হোক, মানা গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেব। এতে প্রায় দু দিন সময় লাগবে। আমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিছু খাদ্যবস্তু নিয়ে অপেক্ষা করবো। কারণ, মানা গ্রাম থেকে আমার পেছনে পড়ে থাকা সঙ্গীরা খাদ্যবস্তু নিয়ে আসবার কথা। কিন্তু পরদিন ভোরে সঙ্গী দুজন আমার সাহায্য ছাড়া এগিয়ে যেতে সাহস পেলো না। কারণ, ওঁদের ধারণা, আমি ওঁদের দুজনকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে চাইছি মানা গ্রামে। এর অর্থ—আমি ওঁদের দুজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি। ওঁদের পা দুটো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল।" এমনি সাংঘাতিক পরিবেশে আন্দ্রের পক্ষে সর্বকিছু সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ বা সমীক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তাঁর ভ্রমণ বিবরণের তথ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। আজেভেদোর ভ্রমণ বর্ণনায় কামেট পর্বত শিখরের কাছে সরোবর দেখেছিলেন। সেই সরোবর থেকে গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে। আজেভেদো এই তথ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সরোবরের সঙ্গে দেবতালের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে কামেট ও মানা গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে একটি অপরূপ সরোবর রয়েছে। সেই হ্রদের নাম বসুধারা তাল। বসুধারা তাল থেকে একটি ধারা নির্গত

হয়ে ধৌলীগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মানা গিরিপথের কাছ থেকে বসুধারা ভাল দেখা না যাওয়াই সম্ভব। তবে আজেভেদোর বর্ণনা অনুসারে হ্রদের উল্লেখ অস্বীকার করা যায় না। তাই সমস্ত তথ্যের সত্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য ভূগোল বিজ্ঞানীরা হ্রদটির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেবতাল বলেই মনে করেন। সেখান থেকে উৎসারিত সরস্বতী নদী আজেভেদো মানাগ্রাম থেকে দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আন্দ্রে, আজেভেদো ও দেসদেরীর ভ্রমণ বর্ণনায় গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে—গঙ্গা একটি সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেই সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয় নি। অথচ সেই আনুমানিক তথ্যের ভিত্তিতে হয়ত বা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন অ্যানভেলিস ও প্যারন। তাঁদের অঙ্কিত মানচিত্র মূলতঃ লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রের পরিমার্জিত সংস্করণ। তাই গঙ্গার উৎস স্থান মানস সরোবর বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এই তথ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

॥ ৯ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনী মাত—
স্তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যলিপ্সা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছিল বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর। ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অছিলায় এসেছিল ইংরেজ বণিক সাত সমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে। বাণিজ্য অর্থ—সম্পদ আহরণ। সেই সম্পদ আহরণের সুষ্ঠ কার্য সম্পন্ন করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার কথা ভাবতে হয়েছিল তাদের। যোগাযোগ স্থাপনের অর্থ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যানবাহনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা। যোগাযোগের সহজ ও সম্ভাব্য একটি পথই ছিল—নৌ-পরিবহন। কলকাতা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তর। সেখান থেকে ভাগীরথী ও গঙ্গার প্রবাহ অনুসরণ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে, এমন ধারণা তাদের হয়েছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা। তার

তীরে তীরে প্রাচীন বর্ধিষ্ণু শহর গড়ে উঠেছিল অতীত যুগ থেকেই। সেই শহরগুলিতে উপচে পড়েছিল সম্পদ। সেখানে অসংখ্য প্রাচীন মন্দির। যুগ যুগ ধরে সেই মন্দিরে সঞ্চিত হতো সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীদের সংগৃহীত ধন সম্পদ।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সেই গঙ্গার গতিপথ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার কথা ভেবেছিল গভীরভাবে। বাংলার তদানীন্তন বড়লাট ভ্যান্সিটার্ট। তাঁরই সুপারিশে বাংলার প্রথম সার্ভেয়র জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন জেমস্ রেনেল (৯ই এপ্রিল, ১৭৬৪ সন)। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, গঙ্গার প্রবাহ পথ জরিপ করার কার্য সম্পন্ন করতে হবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই।

ভারতবর্ষের ভূগোলের জনক বলা চলে জেমস্ রেনেলকে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৪২ সতে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, ইংল্যান্ডে—আপকটে। ১৭৪৭ সনে যুদ্ধে যোগদান করে রেনেলের পিতা ক্যাপ্টেন জন রেনেল প্রাণ হারিয়েছিলেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে রেনেলের জীবনযাত্রা দুঃখময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর মা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করে ভাশুরের সংসারে আশ্রয় নিয়েছিলেন পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে। সেখানে নানা দুঃখ কষ্টের পরে মিসেস্ রেনেল বাধ্য হয়েছিলেন একজন বিপত্নীককে বিবাহ করতে। এই অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে রেনেল আশ্রয় পেয়েছিলেন বেইলী নামে একজন ধর্মযাজকের কাছে। সেই সময় রেনেলের বয়স মাত্র দশ বৎসর। তিনি তখন চ্যাড্‌লির একটি স্কুলে পড়াশুনা করতে শুরু করেছিলেন। স্কুল জীবনের স্বল্প সময় তাঁর খুবই সুখের ছিল। কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিনের জন্য স্থায়ী হয় নি। সেই সময় বেইলীর আকস্মিক মৃত্যুতে রেনেল যেন দ্বিতীয়বার পিতৃহারা অনাথ হয়েছিলেন। ব্যারিংটনের গির্জায় নতুন ধর্মযাজক রেভারেন্ড গিলক্রাইস্ট এসেছিলেন বেইলীর মৃত্যুর পর। গির্জার দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসহায় জেমস্ রেনেলকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন চ্যাড্‌লির স্কুলে—রেনেলের পড়াশুনার অগ্রগতি হয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার ফলেই তাঁর মনে ভূগোল বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল। চ্যাড্‌লিতে খাড়া পাহাড়, সবুজ বনানী, বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁর মন ভরে রেখেছিল। বারো বৎসর বয়সে রেনেল চ্যাড্‌লির চারপাশটা ভালভাবে ভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভূগোল বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষ্য করে রেভারেন্ড গিলক্রাইস্ট রেনেলকে চ্যাড্‌লির প্লিমাউথে নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় রেনেল

আরো সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ভূগোল বিজ্ঞান সম্পর্কে। বালকের জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য করে গিলক্রাইস্ট তাঁর শ্যালক মিঃ স্যাফিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্যাফিরের বন্ধু নৌ-সেনাপতি ক্যাপ্টেন হাইড্ পার্ক। ১৭৫৬ সনের জানুয়ারিতে রেনেল ক্যাপ্টেন হাইড্ পার্কের পরিচারক হিসাবে স্পেনের উপকূলে দু বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। এরপর ক্যাপ্টেন হ্যাল্ডেনের সঙ্গে 'আমেরিকা' জাহাজে মাদ্রাজে এসে পেঁছৌছিলেন ১৭৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। পরের মাসে তিনি যুদ্ধে যোগদান করে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন তিনি অবস্থান করছিলেন ত্রিঙ্কোমালীতে।

ত্রিঙ্কোমালীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল রেনেলকে। দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ভাগের সমুদ্র হয়তো তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল। তিনি পার্কারের উৎসাহে মেরিন সার্ভে শিক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বোম্বাই সমুদ্রে সাঁতার শিক্ষা লাভ করবার পর মেরিন সার্ভে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। ১৭৬৩ সনে রেনেল পুরনো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যোগদান করেছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন চাকরিতে। তখন তাঁর বাৎসরিক বেতন হয়েছিল ৩০০ পাউণ্ড। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশ অনুযায়ী রেনেল নেপচুন জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে মহম্মদ ইউসুফের হাত থেকে মাদুরী দখল করেছিলেন। তাঁর অদম্য সাহস ও দক্ষতা—কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপর থেকেই রেনেলের নতুন জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল।

ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন রেনেল। ভারতের সমুদ্র, নদনদী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভূগোল বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, মেরিন সার্ভের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন রেনেলের দেহমণ আকর্ষণ করেছিল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা। সেই গঙ্গা নদীর ধারা জরিপ করবার স্বপ্ন জেগেছিল তাঁর। পলাশীর যুদ্ধের সমাপ্তির পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রথম সার্ভেয়র জেনারেলের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। একমাস ধরে গঙ্গার ধারা জরিপকার্যের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল নিখুঁতভাবে। একজন দুঃসাহসী তরুণ নৌ-সেনাপতি, অভিজ্ঞ ভূগোল বিজ্ঞানী ও মেরিন সার্ভের অভিজ্ঞ হিসাবে জরিপকার্য শুরু করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। প্রথমত তিনি গঙ্গার গতিপথের বিভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করবার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৭৬৪ সনের পুরো বর্ষাকাল তিনি বড় বজরায় বসবাস করতেন।

জরিপের প্রাথমিক পর্ব হিসাবে গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে গভর্নরের কাছ থেকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ চাওয়ায়, গভর্নরের তরফ থেকে সামান্য অসহযোগিতার আভাস লক্ষ্য করায় বিস্মিত হয়েছিলেন জেমস্ রেনেল। তিনি তাই বাধ্য হয়ে নদী বক্ষে জরিপকার্য স্থগিত রেখে সার্ভে অফিসের সদর দপ্তরে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। সমস্ত সময়টা তিনি তখন বাংলাদেশের নির্ভুল ভূগোল রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বৎসরের শেষে তিনি গভর্নরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন লণ্ডনে। যাবার পূর্বে সার্ভেয়র জেনা-রেলের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। পরে ভ্যান্সিটার্ট রেনেলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে চিঠি দিয়েছিলেন লণ্ডনে। চিঠিতে রেনেলকে অনুরোধ করে লিখেছিলেন—"আপনি স্বেচ্ছায় যে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, সে কাজ যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। আমার তরফ থেকে আপনার সমস্ত কাজের জন্য পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে। কোম্পানী আপনার কার্যে কোনরূপ বাধা দেবে না। আপনার নিঃস্বার্থ কাজের জন্য সহানুভূতির বিন্দুমাত্র অভাব হবে না।"

রেনেলের তখন বাৎসরিক বেতন ৯০০ পাউণ্ড হয়েছিল। সেই সঙ্গে অন্যান্য ভাতা মিলিয়ে বেতন এসে দাঁড়িয়েছিল এক হাজার পাউণ্ডে। ১৭৬৫ সনে ১৪ই জানুয়ারিতে রেনেল ইঞ্জিনীয়ায়ের পদে উন্নীত হয়ে-ছিলেন। পর বৎসরই করেছিলেন জরিপকার্যের পূর্ণ পরিকল্পনার সর্বশেষ অংশটুকু। মানচিত্রে বাংলার সমতলভূমি ও হিমালয়ের উচ্চভূমির দ্বারা পৃথক করা তিব্বত পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই সময় হিমালয় পর্বতমালার সঠিক পরিচয় জানা ছিল না রেনেলের। তাই বিশাল হিমালয় পর্বতমালাকে টাটারিয়ান বলে উল্লেখ করেছিলেন মান-চিত্রে। অবসরকালে রেনেল ঢাকায় এসে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করতেন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমের সন্নিকটে ঢাকা শহর ছিল সুন্দর। পূর্ব দিকে মেঘনা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে পদ্মা বা গঙ্গার ধারার এক অংশ, পশ্চিমে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র। ১৭৬৬ সনে রেনেল ভুটান সীমান্তে জরিপ কার্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে একদল সন্ন্যাসী তাঁকে আক্রমণ করেছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। রেনেলের সঙ্গী ছিল নব্বইজন সিপাহী ও লেফ্টন্যান্ট মরিসন। নিকটবর্তী গ্রামে রেনেল ও তাঁর দলবলকে ঘিরে ফেলেছিল সন্ন্যাসী দল। অন্যান্য সবাই দ্রুত পলায়ন করতে পারলেও রেনেল কিন্তু পারলেন না। তিনি আক্রান্ত হয়ে গুরুতর-রূপে আহত হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের তরবারির আঘাতে রেনেলের ডান

হাত পঙ্গু হয়েছিল চিরতরের জন্য। বাম হাতের আঙুলও অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

গংগার জরিপকার্য রেনেল শুরু করেছিলেন ১৭৬৩ সন থেকে। ১৭৬৭ সন পর্যন্ত চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গংগার ধারার ঐতিহাসিক জরিপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। গংগার জলধারা যে অংশে প্রবাহিত হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করে সুদূর আগ্রা পর্যন্ত চিহ্নিত অঞ্চল জরিপকার্য করবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই দীর্ঘ অঞ্চলের মধ্যে ছিল—বাংলা, বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লীর কিছু অংশ ও উড়িষ্যার পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। বংগীয় উপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব, বালাসোর, দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে কাল্পনিক রেখা উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে টেনে পশ্চিম আগ্রা, সেখান থেকে হরিদ্বার (যেখানে গংগা প্রথম হিন্দুস্থানের সমভূমিতে প্রবেশ করেছে), সেখান থেকে সোজা উত্তরে ভুটানের উচ্চ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত টেনে নিয়ে মোটামুটি অঞ্চলের দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশ নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই সব সংগৃহীত তথ্য অনুসারে দেখা যায়—

আগ্রা থেকে বাংলার পূর্ব অংশের দূরত্ব ৯০০ মাইল।

ক্লড্ বউডুর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে—আগ্রার দ্রাঘিমাংশ ৭৮/২৯'
কলকাতার দ্রাঘিমাংশ ৮৮/২৮'

দুই স্থানের দ্রাঘিমান্তর (পর্যবেক্ষণের ফলে) ৯/৫৬'
জরিপ করবার ফলে ৯/৫৮'

ক্ল্যাম্পির পর্যবেক্ষণ অনুসারে দেখা যায়—যমুনার দ্রাঘিমাংশ ৮০/৪'

রে. এম্. স্মিথের পর্যবেক্ষণ অনুসারে যমুনার দ্রাঘিমাংশ ৮০/০'

জরিপকার্যের সুবিধার জন্য রেনেল কতকগুলো বিখ্যাত শহরের অবস্থান নির্বাচন করেছিলেন।

মেগাস্থিনিসের সময়কালে বিখ্যাত শহর পোলিবোথ্রার নাম, কাল পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়েছিল। তদনুযায়ী :

পোলিবোথ্রা—পলিয়ম্বথ্রা—পাটলিপুত্র—পাটনা।

জরিপের কার্যের জন্য রেনেলের চিহ্নিত স্থানগুলি ছিল—পাটনা, কনৌজ, গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাও বা সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ও সোনার গাঁ। পোলিবোথ্রা বাদে আর সব স্থানগুলোর নাম উল্লিখিত রয়েছে আইন ই-আকবরী বা ফিরিস্তির বর্ণনায়। প্লিনি পোলিবোথ্রার যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারিত করেছিলেন। (রেনেলের অবশ্য এইরূপ ধারণাই ছিল)। অন্যান্য ভূগোলতত্ত্ববিদ সাধারণভাবে পোলিবোথ্রার ভৌগোলিক

অবস্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন। অবশ্য তাঁরা স্বীকার করতেন যে পোলিবোথ্রা গঙ্গার ডান পারে অবস্থিত। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল গাঙ্গোয়ম্। পোলিবোথ্রা সম্পর্কে প্লিনি লিখেছিলেন যে—এই শহর একটি বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নদীটির নাম ছিল এড়োনোবোয়াস্। এড়োনোবোয়াস্ নদীর প্রথম উল্লেখ করেছিলেন এরিয়ান। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। গঙ্গা ও সিন্ধুর পরে এই নদীর স্থান। প্লিনি নিশ্চিত হয়েই লিখেছিলেন যে, যমুনার ধারা এসে গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল মথুরায়। সেই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল পলিবোথ্রার পাশ দিয়ে। অপর একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম থেকে পোলিবোথ্রার দূরত্ব ৪২৫ মাইল। স্ট্র্যাবো অবশ্য নিকটস্থ কোন নদীর অবস্থানের উল্লেখ করেন নি। মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণে পোলিবোথ্রার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন সেই নগরে। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়—পোলিবোথ্রার দৈর্ঘ্য ৮০ স্টাডিয়া, প্রস্থে ১৫ স্টাডিয়া। হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, শহরের দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, প্রস্থ ২ মাইল। ইউরোপের যে কোন শহরের আয়তন, ঘনবসতির সঙ্গে পোলিবোথ্রাকে তুলনা করা চলে। অবশ্য ভারতের সব শহরই একরূপ নয়। বাংলার গৌড় পোলিবোথ্রার চাইতে বিশাল। প্লিনির ভারতীয় বইয়ে সিন্ধু ও গঙ্গার মুখ পর্যন্ত দূরত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করে-ছিলেন। পোলিবোথ্রার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কেও উল্লেখ ছিল। প্লিনি, স্ট্র্যাবোর বর্ণনা ও বিস্তৃত বিবরণ অনুসারে নানা সংশয় জাগে। মনে হয়—পোলিবোথ্রা ছাড়া সেইস্থানে আর কোন শহর অবস্থিত ছিল কিনা? মেগাস্থিনিস সে যুগে যথার্থই রাজধানী হিসাবে পোলিবোথ্রা দেখেছিলেন কিনা? গঙ্গার ধারা জরিপ করবার সময় প্রাচীন পোলি-বোথ্রার অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রেনেলকে বেশ বিভ্রান্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে অবশ্য স্থানীয় অঞ্চল ভালভাবে পর্য-বেক্ষণ করা হয়েছিল। তার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি বিশাল শহর, যা প্রাচীন যুগের স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমান পাটনা বা পাটলি-পুত্র বা পোলিবোথ্রা—এই নামে একটি বিশাল শহর ছিল। উইলিয়াম জোন্স আবিষ্কার করেছিলেন এই শহরটি। জোন্স আরো আবিষ্কার করেছিলেন যে—শোন নদী গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছিল মনিয়ার কাছে। সেখান থেকে বর্তমান পাটনার দূরত্ব বাইশ মাইল। শোন ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলেই অবস্থিত ছিল পোলিবোথ্রা। বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল সেই

প্রাচীন শহর। রেনেল অবশ্য সেই শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। পোলিবোথ্রার ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে প্লিনির তথ্যগুলি যথার্থই গঙ্গার ধারা জরিপ করবার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।[১] সেকালের ভূগোলতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছিল যে প্রাচীন পোলিবোথ্রা শহর থেকে পাটনা শহরের দূরত্ব প্রায় ৪৪ মাইল।[২] কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, পাটনা পোলিবোথ্রার অতি নিকটবর্তী। গংগা যমুনার সংগম স্থলের নিকটেই এই শহর অবস্থিত ছিল। নানা নৈসর্গিক পরিবর্তনের সংগে সংগে হয়তো বা পোলিবোথ্রা, গংগা যমুনার সংগম স্থলের কোথাও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জরিপ কার্যের সময় রেনেলকে সব তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তাঁর জরিপ কার্যের বিবরণ আজ থেকে দুশো বৎসর পূর্বের। গংগা যমুনার সংগম স্থলের নাম প্রয়াগ। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়াগতীর্থের কথা প্রচলিত ছিল। রেনেল হয়তো বা প্রয়াগ অথবা এলাহাবাদ সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানতেন না। গংগা ও অন্য কোন নদীর সংগম স্থলে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শোন নদী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত প্রাচীন পাটলিপুত্রও ছিল প্রাচীন তীর্থ। পরবর্তীকালে সেই শহর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শোন নদী সে যুগে বেশ প্রশস্ত নদী ছিল। পরে, নদীর গতিপথ হয়তো বা পরিবর্তিত হবার ফলে গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গম স্থলও পরিবর্তিত হয়েছিল। নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হবার ফলস্বরূপ পোলিবোথ্রা বা পাটলিপুত্র শহর লুপ্ত হবার অন্যতম কারণ হিসাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অতীতকালের সময়ের ব্যবধানে নদীর প্রকৃতি, নদীর জলোচ্ছ্বাস, ভয়াবহ বন্যা, নানা নৈসর্গিক ঘটনা নদী উপত্যকার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ ও শহর লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

জরিপকার্যের বিবরণে রেনেল লিখেছিলেন—"আমি নিজে গঙ্গা সম্পর্কে যে তথ্য আহরণ করতে পেরেছিলাম, তাতে জেনেছিলাম যে—কোশা নদীর সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম স্থল পরিবর্তিত হয়েছিল। পাটনার দক্ষিণ দিকে প্রাচীন যুগের নদীর গতিপথের নিশানা দেখতে পাওয়া যায়। সে স্থানটি গঙ্গার তীরে—ফতোয়াবাদ। এরিয়ান যমুনা নদীর উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর বইয়ে শোন নদীর উল্লেখ করেছিলেন। আর যদি অন্য কোন তথ্যানুসন্ধানীর তথ্য না মানা হয়, তাহলে প্লিনির তথ্যগুলো পুনরালোচনা করা যায়। প্লিনি বলেছিলেন—যমুনা নদী মথুরার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পোলিবোথ্রাতে মিলিত হয়েছে গঙ্গায়। এতে মনে

হয়, পোলিবোথ্রা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অপর বিবরণ অনুসারে দেখা যায় পোলিবোথ্রা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে ৪২৫ মাইল ঢালের দিকে। তাহলে এই শহরের সন্নিকটে সে সঙ্গম সেখানে গঙ্গাও অপর একটি নদী।

স্ট্র্যাবোর মতে পোলিবোথ্রা থেকে গঙ্গার মুখ ৬০০০ স্টাডিয়া।
প্লিনির মতে পোলিবোথ্রা ও পাটনা একই স্থানে অবস্থিত।
স্ট্র্যাবোর মতে পোলিবোথ্রা ও পাটনা একই স্থানে অবস্থিত।
অর্থাৎ শহর থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব প্লিনি ও স্ট্র্যাবোর মতে এক।

পোলিবোথ্রার মতো আরো একটি শহর ছিল গঙ্গার তীরে। সেই শহরের নাম কনৌজ। কনৌজের দ্রাঘিমাংশ ৮১°১০′, অক্ষাংশ ২৭°৩′। হিন্দুস্থানের রাজধানী কনৌজের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই শহরটি সমৃদ্ধ সম্পন্ন ছিল খৃস্টপূর্ব যুগে। গঙ্গার তীরে এই বিখ্যাত শহর রেনেল দেখেছিলেন। শহরটির অর্ধেক অংশ দেখা যাচ্ছিল তখনকার যুগে। গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল কনৌজের দক্ষিণ তীর ঘেঁষে। সেখানে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল কালিন্দী নদী। প্লিনি তাঁর বইয়ে কালিনিপ্লাক্সি বলে উল্লেখ করেছিলেন কালিন্দী নদীকে। (ফেরিস্তির মতে) কথিত আছে, কনৌজ এক হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুস্থানের রাজধানী ছিল। সেখানে পুরু রাজার পরবর্তী বংশধর বসবাস করতেন। পুরু খৃস্টপূর্ব ৩২৬ সনে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ঐ শহরে দেখা যেতো তিরিশ হাজার পানের দোকান। কারণ, ভারতীয়রা সাংঘাতিকভাবে পান খেতো।

আইন-ই-আকবরী পুঁথিতে লেখা আছে, ব্রহ্মপুত্র চীন দেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু গঙ্গার উৎস সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। যার ফলে তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করবার সময় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। লামাদের সহায়তায় অঙ্কিত মানচিত্রে দ্য হ্যালডেন্ কিন্তু সাঙ্পো ও গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। গঙ্গা যে স্থানে হিন্দুস্থানের সমতলভূমিতে অবতরণ করেছে, সে স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ২৮° অক্ষাংশ। কিন্তু পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গিয়েছিল যে—সেই অবস্থান চিহ্নিত হয়েছিল ৩০° অক্ষাংশে। অক্ষাংশ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে হরিদ্বার তিব্বতের রাজধানী লাসার ২° অক্ষাংশ নিকটবর্তী। ফলে লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রে পিকিঙ্কে হরিদ্বারের কাছেই

১. প্লিনির তথ্য এইরূপ ঃ তক্ষশীলা—সিন্ধুর নিকটবর্তী আটকের কাছাকাছি আটকের সন্নিকটেই অবস্থিত হিদাস্পাস নদী।

আটক থেকে হিদাস্পাস বা ঝিলাম নদীর দূরত্ব—১২০ রোমান মাইল
ঝিলাম নদী থেকে হাইফোফিস বা বোয়াবের দূরত্ব—৩৯০ ,,
হাইফোফিস থেকে হিসুদ্রাস বা সাটলেজের দূরত্ব—১৬৮ ,,
সাটলেজ থেকে যোমনাস বা যমুনার দূরত্ব ১১২ ,,
যমুনা থেকে গঙ্গার দূরত্ব— ১১৯ ,,
গঙ্গা থেকে রোদাপার দূরত্ব— ১১৯ ,,
রোদাপা থেকে কালি প্লাক্সা বা কালিন্দী নদীর দূরত্ব— ১৬৭ ,,
কালিন্দী নদী থেকে যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ২২৫ ,,
যমুনার সঙ্গম স্থল থেকে পোলিবোথ্রার দূরত্ব— ৪২৫ ,,
সেখান থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব— ৬৩৮ ,,

এ স্থলে—মাইল শব্দের অর্থ প্লিনির মাইল। এম্. ভি. অ্যানভেলিসের ধারণা প্লিনি গ্রীক স্টাডিয়াকে মাইলে রূপান্তরিত করেছিলেন। তদনুযায়ী ১ মাইল = ৮ স্টাড্।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় দূরত্ব মাপ করা হয়েছিল তাঁর জরিপকারীদের সাহায্যে। তদনুযায়ী পাঞ্জাব থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব নির্ধারিত হয়েছিল ১১৪০ ভৌগোলিক মাইল = ২০২৩ রোমান মাইল। সুতরাং প্লিনির বা রোমান মাইল = $\frac{৭}{১৬}$ ভৌগোলিক মাইল বা ব্রিটিশ মাইল।

২. মানচিত্রে (অ্যানভেলিসের) গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ৯৯০ প্লিনির মাইল
বোয়াব থেকে দূরত্ব ১০৬৩ ,,
পোলিবোথ্রা থেকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ৪২৫ ,,
প্লিনির মতে পাটনা থেকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের দূরত্ব ৩৪৫ ,,
দুইটি স্থানের দূরত্বের পার্থক্য ৪২৫—৩৪৫ ৮০ ,,
৮০ প্লিনির মাইল = ৪৪ বৃটিশ মাইল।

দেখানো হয়েছিল। পর্যালোচনা করার ফলে দেখা গিয়েছিল যে—মানচিত্রের পশ্চিম দিকটা ত্রুটিপূর্ণ। রেনেল তাই গঙ্গা ও সাঙ্‌পোর উৎসের অবস্থান ২৯° বা ৩৮° অক্ষাংশের পূর্বে ২° উত্তরে বা ৩১° বা ৩২° অক্ষাংশ হওয়াই সম্ভব। সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচনা করে রেনেল মন্তব্য করেছিলেন যে দ্য অ্যানভেলিসকে গঙ্গা-সাঙ্‌পোর উৎস স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানকে আরো ২° অক্ষাংশ বাড়ানো উচিত ছিল। অবশ্য দ্রাঘিমাংশ একই থাকবে। অ্যানভেলিসের বাংলাদেশ ও লাসার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তাই লাসার অক্ষাংশ লামাদের মানচিত্রে চিহ্নিত ২৯°৫′ অক্ষাংশ হিসাবেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার জর্জের মতে লাসার অক্ষাংশ ৩০°৩০′ অক্ষাংশের তারতম্যের ফলে লাসার ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তিত হতে চলেছিল। এই জটিলতার সমাধান করবার জন্য পরে বড়লাট হেস্টিংস ১৭৭৪ সনে জর্জ বোগেনকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন দালাই লামার দরবারে রাষ্ট্রদূত হিসাবে। তিনি কুচবিহার থেকে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন ফারিজঙ্, সেখান থেকে চামোলিঙ্। চামোলিঙ্ থেকে বোগেন পৌঁছে গিয়েছিলেন লাসায়। তিনি একই দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ অনুসরণ করেছিলেন লাসায় পৌঁছবার জন্য। কিন্তু তাঁর ভ্রমণবার্তায় কোনরূপ ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। শুধু দীর্ঘ পদযাত্রায় কতদিন অতিবাহিত হয়েছিল অর্থাৎ ভ্রমণের দিনপঞ্জী লিখে রেখেছিলেন। তাঁর পদযাত্রা থেকে একটি তথ্যই পাওয়া গিয়েছিলো যে—ভুটানের রাজধানী থেকে লাখিদুয়ারের সোজাসুজি দূরত্ব মাত্র ৪৬ মাইল। বোগেনের এই ভ্রমণবার্তা থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়—

লাখিদুয়ারের অক্ষাংশ	২৬° ৫৬′
ভুটানের রাজধানীর অক্ষাংশ	২৭° ৪৩′
ফারিজঙের অক্ষাংশ	২৮°

কিন্তু লামাদের অঙ্কিত মানচিত্রে ফারিজঙের অক্ষাংশ ২৭° রূপে চিহ্নিত ছিল। এই অক্ষরেখা পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীমাবদ্ধ। কারণ, এই পর্বতশ্রেণী বাংলা ও তিব্বতের সীমারেখা চিহ্নিত হয়েছিল। এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করবার জন্য বোগেন চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে—ফারিজঙ তিব্বত বাংলার সীমান্ত শহর। অর্থাৎ ফারিজঙ ভুটানের শহর বাংলার নয়। বোগেনের এই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ জটিলতাকে সহজ করতে সাহায্য করেছিল মাত্র।

গঙ্গা ও সাঙ্‌পোর মুখোমুখী বা উৎসের দিকটায় লামারা পর্যবেক্ষণ

করেছিলেন বলে সবার ধারণা ছিল। পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা হয়েছিল চীন সম্রাট কাঙ্হির সামনে। সেই বিবরণে অনেকগুলো ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবেশিত ছিল। প্যারনের মানচিত্রে গঙ্গা ও গোগরার উৎস ও ধারা চিহ্নিত হয়েছিল। প্যারনের মানচিত্র রচনার তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তিয়েন্‌ফেনথালারের কাছ থেকে। মানচিত্রটি চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল রেনেলের। কারণ, এই মানচিত্রে গঙ্গার ধারা গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এমন কি হিন্দুদের তীর্থস্থান গোমুখ পর্যন্ত চিহ্নিত ছিল। গোমুখ থেকে গঙ্গার সমতল যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য ৩০০ মাইল। মানচিত্রে গোগরার উৎস থেকে শুরু করে পশ্চিম তিব্বত পর্যন্ত চিহ্নিত ছিল। তিয়েন্‌ফেন্‌থালার অবশ্য গোগরার উৎস স্বচক্ষে দেখেন নি। কিন্তু রেনেলের বিশ্বাস, তিয়েন্‌ফেন্‌থালার গঙ্গোত্রী দর্শন করেছিলেন। মানচিত্রে গোগরার উৎপত্তিস্থলে একটি হ্রদ চিহ্নিত ছিল। হ্রদটির নাম ল্যাংকেন[৩]। ঠিক তার পূর্বে বিশাল হ্রদ মানস সরোবরকেও দেখানো হয়েছিল মানচিত্রে। অবশ্য ল্যাংকেন ও মানস সরোবর কোন জলধারার দ্বারা যুক্ত দেখানো হয় নি। মানস সরোবর থেকে দুটি জলধারার চিহ্ন দেখানো হয়েছিল মানচিত্রে। একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্বে বা দক্ষিণ-পূর্বে। দুটি হ্রদই তিব্বতে অবস্থিত। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেরই ধারণা, গোগরার ধারা আরো দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। এম. অ্যাংকুইটিলের মানচিত্রে দুইটি হ্রদের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হয়েছে ৩৬° অক্ষাংশে। লামাদের সাহায্যে অংকিত তিব্বতের মানচিত্রে গংগা ও সাঙপোর উৎসমুখ একটি গিরিশিরার দ্বারা আড়াল করা রয়েছে। সেখানে একটি গিরিশিখর চিহ্নিত আছে। গিরিশিখরটির নাম কেন্‌টেইসে[৪]। গঙ্গার উৎসমুখ দু'ভাগে বিভক্ত। তার একটি ধারা পশ্চিমে, অপরটি দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। এই ধারা দুটি হ্রদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এই হ্রদ দুটির নাম মাপামা ও ল্যাংকেন। পরবর্তীকালে হ্রদ দুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল—মানস সরোবর ও ল্যাংকেন নামে। দ্য হ্যাল্‌ডেনের মতে গোগরা নদী ল্যাংকেন হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু তিয়েন্‌ফেন্‌থালারের মতে সাট্‌লেজ উৎসারিত হয়েছে মানস সরোবর থেকে। রেনেল মনে করতেন, গঙ্গার দুটি ধারা সার্‌পারাঙ্‌ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হ্রদের পশ্চিম দিক থেকে।

গঙ্গা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করবার সময় রেনেলের মনে একটি

৩. ল্যাংকেন—সম্ভবত রাক্ষস তাল।

৪। কেন্‌টেইসে—সম্ভবত কৈলাসপতি।

৭

প্রশ্নই জেগেছিল। সে প্রশ্ন—গঙ্গা যদি সত্যই বিখ্যাত নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে গঙ্গার উৎসের খবর সবাই জানতো। মানস সরোবরের পরিধি ৬০ মাইল (ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী)। বৃটিশ হিসাব অনুসারে ১১৪ মাইল। সুতরাং যাঁরা গঙ্গার উৎস সন্ধানে গিয়েছিলেন, উৎসের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, অথবা লামারা চীন সম্রাট কাঙ্‌হির আদেশে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন সম্রাটের সামনে, সে অবশ্য জানা যায় নি। রেনেল লিখেছিলেন—এই সমস্ত আলোচনা শুনে ও বিচার বিবেচনা করে আমি মোটামুটিভাবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, গঙ্গা মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে উৎপন্ন সাঙ্‌পো নদীর সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি না। কারণ, লামাদের সংগৃহীত তথ্য যথার্থ বোধ করি না। কেন্‌টেইসে (রেনেল লিখেছেন কৌনিৎসে) পর্বত মানস সরোবর থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে আমার মন্তব্যকে যদি ভুল বলে অনুমান করে থাকি অপরকেও ভুল পথে পরিচালিত করতে পারি না।[৫]

গঙ্গার উচ্চ গতিপথ সম্পর্কে রেনেল লিখেছিলেন—কেন্‌টেইসে পর্বতের পশ্চিম ঢালের প্রস্রবণ থেকে দুটি ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে বেশ কিছুটা উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়েছে প্রায় ৩০০ মাইল পথ। তারপর সেই

৫. গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্য ঃ

দ্য হ্যালডেনের মতে গঙ্গার উৎস স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ২৯°৩০′ অক্ষাংশ

এম্‌. অ্যানভেলিসের মতে ,, ৩২° ,,

রেনেলের মানচিত্র অনুসারে ৩৩° ,,

গোমুখ ও গঙ্গোত্রী থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব ২৮০ মাইল বা ৩০০ মাইল।

তিয়েনফেনথালারের মানচিত্রে গঙ্গা আরো ১২° পশ্চিম উত্তরে দেখানো হয়েছিল।

গঙ্গোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান

তিয়েনফেনথালারের মতে গঙ্গোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩° অক্ষাংশ

গঙ্গোত্রী থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব ২৪০ বা ২২৭ মাইল।

পর্যবেক্ষণের ফলে গঙ্গোত্রীর ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে ৩৭°৩০′ অক্ষাংশ।

জলধারা হিমালয় পর্বতের পাশ দিয়ে এগিয়ে কাবুল পর্যন্ত গিয়েছে তিব্বত মালভূমির ওপর দিয়ে হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে। সেখান থেকেই জলধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হবার পথ বার করে অবতরণ করেছে। তারপর অনেকগুলো জলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা নামে। গঙ্গা—সম্মিলিত ছোট বড় ধারার জলরাশি নিয়ে হিমালয়ের গিরিশিরার ভেতর দিয়ে পথ বানিয়েছে। এমন করে ১০০ মাইল পথ পেরিয়ে গিরিখাদ, খাড়া পাহাড়ের ঢালের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেমে এসেছে কঠিন অমসৃণ উপলখণ্ড ক্ষয় করে ও মসৃণ করে। গঙ্গার এই অপরূপ ধারা অসংখ্য দর্শনার্থীদের সামনে এসেছে পর্বতমালার অন্তর্গত কোন প্রস্রবণ থেকে। তীর্থযাত্রীরা পাথরের গুহা-মুখকে গরুর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টিতে এই পবিত্র গঙ্গা (উৎস গোমুখ থেকে নির্গত গঙ্গার ধারা) মোটামুটি পূর্বাভিমুখী হয়ে পার্বত্য প্রদেশ দিয়ে অবতরণ করেছিল শ্রীনগর তারপর হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গা তার পার্বত্য পথ পরিহার করে মুক্তিলাভ করেছে। এই দীর্ঘ গতিপথের দূরত্ব ৮০০ মাইল।

একথা সত্য, গঙ্গার উৎস সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে, সে ধারণা ১৭১৭ সনের সংগৃহীত তথ্য থেকে। সেই সময় চীন সম্রাট কাঙ্হি কয়েকজন দুঃসাহসী লামাকে গঙ্গার উৎস সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন তিব্বতে। গঙ্গার উৎস স্থান তিব্বতের মালভূমিতে। সেখানকার জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই হয়তো বা লামারা গিয়েছিলেন এগিয়ে। তাঁদের উদ্দেশ্য গঙ্গার উৎস আবিষ্কার করা। উৎস স্হান থেকে জল বহন করে নিয়ে আসতে হবে পিকিঙ্। প্রমাণ হিসাবে সেই জল সম্রাট কাহ্ঙির সামনে উপস্হাপিত করবার কথা ছিল। পিকিঙ্ থেকে গঙ্গার স্হানের দূরত্ব তাঁদের মতে ২৫০০ মাইল। এই অভিযানের পূর্বে ইউরোপীয়রা জানতেন যে, হিন্দুদের বিশ্বাস, গঙ্গা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নির্গত হয়েছে। গঙ্গা সমতলে প্রবাহিত হবার সময় এগারোটি নদীর জলে পুষ্ট হয়েছে। এইসব নদীগুলোর মধ্যে কতকগুলো রাইন নদীর মতো বড়। অবশ্য জলধারার দৈর্ঘ্য হিসাবে গঙ্গা মিশরের নীল নদের মতো দীর্ঘ নয়। সে দিক দিয়ে অবশ্য গঙ্গা উত্তর এশিয়ার নদীগুলোর তুলনায় ছোট। তবে উত্তর এশিয়ার নদীগুলোর তুলনায় বেশী পরিমাণ জল বহন করে। কারণ, এইসব নদীগুলোতে বর্ষায় জলস্ফীতি দেখা দেয় না। রেনেলের তথ্য অনুসারে পৃথিবীর অনেকগুলো নদী গঙ্গার

তুলনায় দীর্ঘ হলেও বৈচিত্র্যময় নয়।[৬] গুরুত্বপূর্ণ নদী হিসাবে গংগার ধারা, জলপ্রবাহের পরিমাণ ও নদী উপত্যকার বৈচিত্র্য। গংগার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না।

॥ ১০ ॥

সুখদা মোক্ষদা গংগা গংগৈব পরমাগতি ॥

জেমস রেনেলের মানচিত্র আত্মপ্রকাশ লাভ করবার পর ভূগোল বিজ্ঞানীদের ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছিল যে গংগা মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে। রেনেল গংগার ধারা জরিপ কার্য শুরু করে-

৬. পৃথিবীর নদীগুলোর সংগে গংগার ধারার তুলনা ঃ

টেমস নদীর ধারাকে ১ সূচক হিসাবে মেনে নিলে অন্যান্য নদীগুলো টেমসের তুলনায় কতগুণ বড় এই তথ্য ঃ

ইউরোপের নদী	টেমস নদী	১
	রাইন নদী	৫½
	ডানিয়ুব নদী	৭
	ভল্‌গা নদী	৯¼
এশিয়ার নদী	সিন্ধু নদ	৬¾
	ইউফেটিস নদী	৮½
	গংগা নদী	৯½
	ব্রহ্মপুত্র নদ	৯½
	এনিসি নদী	১০
	ওবি নদী	১০½
	আমুর নদী	১১
	লেনা নদী	১১¼
	হোয়াংহো নদী	১[illegible]½
	ইয়াংসিকিয়াং নদী	১৫½
আফ্রিকার নদী	নীল নদ	১২½
আমেরিকার নদী	মিশৌরী নদী	৮
	আমাজান নদী	১৫¾

ছিলেন ১৭৬৩ সনের শেষের দিকে, জরিপ কার্য সমাপ্ত হয়েছিল ১৭৭৭ সনে। এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর সময়ে জরিপ কার্য সম্পন্ন ও মানচিত্র অংকন কার্যও সমাপ্ত হয়েছিল। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে দ্য অ্যানভেলিসের বক্তব্য রেনেল কিন্তু পুরোপুরিভাবে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। ১৭৫৭ সনে ভারতবর্ষের মানচিত্র অংকিত ও প্রকাশিত করেছিলেন দ্য অ্যানভেলিস। মানচিত্রে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সমালোচনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছিল। পরে অ্যানভেলিস ও রেনেলের মানচিত্র দুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করা হয়েছিল।

দুটি মানচিত্র নিয়ে আলোচনার ধারা প্রায় একই রকমের বলা যেতে পারে। মানচিত্র অংকন পদ্ধতিতে রেনেল অনেক বেশী সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, যে অঞ্চলের মানচিত্র অংকন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সম্ভবমতো সেই অঞ্চলগুলোয় নিজে গিয়ে সরেজমিনে উপস্থিত হয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ফলে মানচিত্র অংকন মোটামুটি নির্ভুল হয়েছিল। অ্যানভেলিসের মানচিত্রের একটি বিশেষ অংশ নিয়েই রেনেলের আপত্তি শুরু হয়েছিল। সে আপত্তি ছিল—গাঙ্গেয় উপত্যকায় বৌদ্ধ যুগের রাজধানী পোলিবোথ্রার অবস্থান নিয়ে। অ্যানভেলিসের মতে পোলিবোথ্রার অবস্থান ছিল গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল, বর্তমান এলাহাবাদের সন্নিকটে। রেনেল অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতার আলোকে পোলিবোথ্রার অবস্থান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন প্লিনির তথ্য অনুসরণ করে। তদনুযায়ী পোলিবোথ্রা গংগা যমুনার সংগমস্থলে নয় এবং পোলিবোথ্রা গংগার আরো নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত। তাঁর মতে পোলিবোথ্রা কনৌজের অন্তর্গত পাটনার সন্নিকটে।

অ্যানভেলিস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লিখেছিলেন যে পোলিবোথ্রা গঙ্গা ও অপর একটি বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেই বড় নদীটিকে প্লিনি যোমানেস্ বলে উল্লেখ করেছিলেন। যোমানেস্ পোলিবোথ্রার সন্নিকটে প্রবাহিত হয়েছিল। (যোমানেস—যমুনা) রেনেল অবশ্য এইসব যুক্তিতর্ক অগ্রাহ্য করেছিলেন। কারণ প্লিনি তাঁর বই-এর এক স্থানে পোলিবোথ্রার অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে লিখেছিলেন যে—পোলিবোথ্রা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল থেকে ৪২৪ রোমান মাইল দূরে। সেই প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গা ও সিন্ধুর দূরত্বও উল্লেখ করেছিলেন। তদনুযায়ী রেনেল পোলিবোথ্রাকে কনৌজ কালিনী বা কাল্লীনাথ ও গঙ্গার সঙ্গম

স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত বলে মনে করতেন। তিনি তাই সন্দেহ করেছিলেন যে একটি বিশাল শহর সেখানে অবস্থিত ছিল, যা প্লিনি পোলিবোথ্রা বলে উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং প্লিনির তথ্য অনুসারে এই প্রাচীন শহরটি পাটনার অতি সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। রেনেল বিশ্বাস করতেন—পোলিবোথ্রা গঙ্গার ডান তীরে অবস্থিত। পরবর্তী সমীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে—দ্য অ্যানভেলিসের সংগৃহীত তথ্য ভুল। বরং রেনেলের মতবাদ অনেকাংশে সত্য। মিঃ ওয়াভেল শেষে বছর কয়েক পর পাটলিপুত্রের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মতে অশোকের সময়কালের রাজধানী পাটলিপুত্র ও বর্তমান পাটনা শহর প্রায় একই স্থানে অবস্থিত।

রেনেলই প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন যে—শোন ও গঙ্গা নদী যে স্থানে মিলিত হয়েছিল তার সামান্য নিম্নেই অবস্থিত বিখ্যাত বর্তমান পাটনা শহর। ওয়াভেল দেখিয়েছিলেন যে—গঙ্গা ও শোন নদীর পুরনো গতি পথের মধ্যবর্তী স্থানে পাটলিপুত্র শহর স্থাপিত হয়েছিল সুদূর অতীত যুগে। মেগাস্থিনিসের (সেলুকাসের রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস) বা ষ্ট্র্যাবোর উল্লেখ থেকে দেখা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব ৩১২ সনে পোলিবোথ্রা পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে পোলিবোথ্রা শহর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অপর একটি বৃহৎ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল, সেই বৃহৎ নদীটির নাম ছিল—এরান্নো বোয়াস। স্যার উইলিয়ম জোন্স্ শোন নদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

অশোকের রাজত্বকালের পাঁচশ বৎসর অতিবাহিত হবার পর মগধের রাজধানী আর ছিল না। চীন দেশীয় পর্যটক ও তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েনের সময় পোলিবোথ্রা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। কিন্তু ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ্ বিশাল নগরী পোলিবোথ্রা আর দেখতে পান নি। তার পরিবর্তে প্রাচীন সৌধগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন মাত্র। কালক্রমে পোলিবোথ্রার অস্তিত্ব লুপ্ত হতে চলেছিল। আকবরের সময় পাটনা শহর বৃহৎ প্রদেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। সঙ্গম স্থল ও স্থান পরিবর্তন হয়েছিল দীর্ঘকালের ব্যবধানে। তাই নতুন করে পাটনা শহর গড়ে উঠেছিল। সুদূর অতীত যুগের শহর পোলিবোথ্রার অস্তিত্ব আজ চিহ্নিত হয়েছে ইতিহাসে। দ্য অ্যানভেলিসের ভুল হবার কারণ হিসাবে বলা যায়—গঙ্গা ও বৃহৎ নদীর সঙ্গমস্থলে পোলিবোথ্রা শহর অবস্থিত ছিল—এই তথ্যকে অনুসরণ করা। বৃহৎ নদীটি মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী এরান্নো বোয়াস বলা হয়েছিল।

অ্যানভেলিস এরান্নো বোয়াসকে যমুনা নদী বলে অনুমান করেছিলেন। অ্যানভেলিস যে সময় মানচিত্র অংকন করেছিলেন তার বহু বৎসর পূর্বেই পোলিবোথ্রার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই মানচিত্রে প্রাচীন শহর নির্দেশ করেছিলেন আরো পুরনো কালের তথ্য অনুসরণ করে। অ্যানভেলিসের তথ্য সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ভুল সংশোধন করেছিলেন রেনেল।

দ্য অ্যানভেলিস ও রেনেলের মানচিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তিব্বতের নদী লাঙ্পোর কথা উল্লেখ করতে হয়েছে। কারণ, গঙ্গা ও সাঙ্পো তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মানচিত্রে দেখানো হয়েছিল। তিব্বতের মানচিত্র জেসুটস ও মিশনারীরা অংকন করেছিলেন জরিপ করবার পর। সেই মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৭৪ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস দূত হিসাবে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন বোগেনকে—লাসায় তদানীন্তন দালাই লামা—তাসী লামার দরবারে। তিনি দুবার সাঙ্পো নদী অতিক্রম করেছিলেন। বোগেন সার্ভেয়র ছিলেন না, কম্পাসের সাহায্যে বিয়ারিং নিতেও জানতেন না। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ পর্যবেক্ষণ করতে জানতেন না তিনি। তবু তাঁর ভ্রমণ পথে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সাঙ্পো ও গঙ্গার উপত্যকা দুটিকে পৃথক করে রেখেছিল বিশাল হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত টার্টারিয়ান পর্বতমালা। রেনেল জরিপ করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে এমোদাস ও প্যারো প্যামিসাস পর্বতমালা দুটো মূলতঃ একই পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। এই পর্বতমালার নাম তিব্বতীয়রা বলতো রিমোলা। তখনকার যুগের মানচিত্রে হিমালয়ের উল্লেখ ছিল। ঐ পর্বতশ্রেণীর নাম ছিল হেমিস্ফিয়ার। হ্যালডেনের মানচিত্রে সাঙ্পোর নাম দেখেছিলেন রেনেন। বোগেল ও টার্নারের মতে ঐ নদী পূর্বমুখী হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। দ্য অ্যানভেলিসের মতে সাঙ্পো ইরাবতীর উপনদী। কিন্তু রেনেল জরিপ করে ভৌগোলিক অবস্থান খুঁজে বার করেছিলেন যে সাঙ্পো হিমালয়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে নিম্ন উপত্যকায় ডিহাঙ্ নাম নিয়ে সমতলে এসেছে। সমতলে এই নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। পরে অবশ্য গর্ডন ইরাবতীর উৎসদেশ জরিপ করে দ্য অ্যানভেলিসের মত পোষণ করতেন। পরে দেখা গিয়েছে—রেনেলের মতই সত্য। সাঙ্পো মূলতঃ ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

১৭৯০ সনে রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রেনেল মনে করতেন যে হরিদ্বারেরও পরে গঙ্গার জলধারার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০

মাইল। এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে কাশ্মীরে লাডাকের মালভূমির ওপর দিয়ে। মানচিত্রে তাঁর এই দৃঢ় ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছিল। গঙ্গা উৎস স্থল থেকে নির্গত হয়ে তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হিমালয়ের গিরিশিরা অতিক্রম করেছিল হিন্দুস্থানে—গিরিশিরার অভ্যন্তরের সুড়ঙ্গ পথে।

তিনি তাঁর The Map of Hindustan বইয়ে লিখেছিলেন—

The great body of water, forces a passage through the ridge of Mount Himalaya and sapping its very foundations, rushes through a cavern and precipitates itself into a vast basin which it has worn in the rock at the hither foot of the mountain.

এই বিশাল জলধারা হিমালয়ে গিরিশিরার ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে নির্গমনের পথ খুঁজে বার করে নিয়েছে। সেই জলধারা কঠিন প্রস্তর সিক্ত করে প্রবেশ করেছে গহন গিরির কন্দরে। সেখান থেকে জলপ্রবাহ কঠিন অসমতলে প্রস্তরভূমিকে ক্ষয়ে মসৃণ করে বিশাল আধারে সঞ্চিত হয়েছে পর্বতের পাদদেশে।

রেনেল অবশ্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা ও সত্য বিশ্বাস করেছিলেন। তাই মনে করতেন হিমালয়ের গুহার অর্থ বরফের গুহা। সেই বরফের গুহার নাম গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই গুহামুখ থেকেই নিঃসারিত হয়েছে ভাগীরথীর জলধারা।

রেনেলের তথ্য সম্বলিত মানচিত্র প্রায় দশ বৎসর যথার্থ ও প্রামাণিক তথ্য হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই গঙ্গার উৎস নিয়ে রেনেলের তথ্যকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। তাই ভূগোল বিজ্ঞানীরা এই মানচিত্রের সহিত নিহিত তথ্য সমালোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মানচিত্রের অনেক তথ্যই ভিত্তিহীন, বিশ্বাস-যোগ্য ও নির্ভরশীল নয়। এমন ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্রকে অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত নয় চিন্তা করেই ১৮০৮ সনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাই জরিপবিভাগকে দিয়ে গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে উৎস পর্যন্ত দীর্ঘ নদীর ধারা জরিপ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় সার্ভেয়র জেনারেল ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল কোলব্রুক। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাই কোলব্রুকের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত করেছিল। গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে সমতল থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত দীর্ঘ নদী পথ জরিপকার্য সম্পন্ন করবার জন্য

সুদক্ষ জরিপকারী, দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, ভূগোল বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে কোলব্রুকের পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরই কোলব্রুক আকস্মিক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে দুর্গম পথের জরিপের কার্য সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাই তিনি দুজন বিশ্বাসী দুঃসাহসী কর্মচারী লেফ্‌টন্যাণ্ট ওয়েব ও ক্যাপ্টেন র‍্যাপারকে নির্বাচিত করেছিলেন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করবার জন্য। কোলব্রুক দুজনকে সমস্ত কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্য মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেফ্‌টন্যাণ্ট ওয়েবের ওপর।

লেফ্‌টন্যাণ্ট ওয়েব ও ক্যাপ্টেন র‍্যাপার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে যখন যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রাক্তন মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার অধীনস্থ সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন হিয়ারসে যোগদান করেছিলেন এই অভিযানে। ১৮০৮ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা পেঁছে গিয়েছিলেন হরিদ্বার। হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা চলছিল। কুম্ভমেলা সমাপ্ত হতে না হতেই তীর্থযাত্রীরা হিমালয়ের দুর্গম তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। কোলব্রুকের নির্দেশ ছিল—ওয়েব দলবল নিয়ে প্রথমে গঙ্গোত্রী যাবেন—দীর্ঘ পথ অনুসরণ করে হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে। পদযাত্রার সময় তাঁরা লক্ষ্য করবেন নদীর গতিপথ, কোথাও জলপ্রবাহ চলতে চলতে হারিয়ে গিয়ে অন্তঃশীলার সৃষ্টি করেছে কিনা? পার্বত্য নদীপথ পর্যবেক্ষণ করতে করতে দেখতে হবে নদীর ধারা উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় কোন স্থানে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে কিনা? অথবা পাহাড়ের ঢালু পথে অবতরণের সময় ধাপে ধাপে বিচিত্র ভঙ্গিমায় জলধারা নেমে এসেছে কিনা লক্ষ্য করা। ওয়েব নদীর এমনি বিচিত্র ধারা পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থান, দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশ নির্ণয় করবেন। ওয়েবের ওপরে দায়িত্ব ছিল গঙ্গার প্রকৃত ও নিশ্চিত উৎসের সন্ধান খুঁজে বার করা। অন্ততপক্ষে যথার্থ উৎসের পথে অগ্রসর হয়ে সঠিক ভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন করতে হবে তাঁদের। রেনেলের বর্ণিত গঙ্গার উৎস মানস সরোবর। এ তথ্যের প্রমাণ সাপেক্ষ যুক্তিতর্ক সংগ্রহ করতে না পারলে, সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ না করলে রেনেল তথ্যকে খণ্ডন করা সম্ভব হবে না। ওয়েবকে তাই গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীতে

পৌঁছতে হবে···সেখানকার গিরিশ্রেণীর ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। গঙ্গোত্রী অভিযান সমাপ্তির পর ওয়েবকে দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বদ্রীনাথে অলকানন্দার উৎসের সন্ধানে। সেখান থেকে কেদারনাথে নদীর উৎস দর্শন ও পরিচয় সংগ্রহ করা। এ অঞ্চলের অভিযান সম্পন্ন করে তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে যমুনার উৎস খুঁজে বার করতে। গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ ও জরিপকার্যের জন্য এই সব অঞ্চলের পর্বত শৃঙ্গের অবস্থান নির্ণয়, উচ্চতা, ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। দীর্ঘ অভিযানে যে পথ অনুসরণ করা হবে—সে পথ, সেখানকার শহর, হিন্দুদের মন্দির, ধর্মশালা যাতায়াতের সম্ভাব্য পথঘাট সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে উচ্চ পর্বত শৃঙ্গের ট্রিগনোম্যাট্রিক্যাল সার্ভে, ব্যারোমিটারের সাহায্যে উচ্চতা নির্ধারণ করে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ওয়েবকে। সর্বশেষে ওয়েবকে হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর অথবা দেবপ্রয়াগ, সেখান থেকে গঙ্গোত্রীর পথ জরিপ কার্য সম্পন্ন করবার পর ফিরতি পথে আসতে হবে আলমোড়ায়।

১৮০৮ সনের ১২ই এপ্রিল। ওয়েব, র‍্যাপার, হিয়ারসে দলবল নিয়ে হরিদ্বার থেকে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রায় বারো মাইল পথ অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার পথ অনুসরণ করে। এমনি করে ১৬ই এপ্রিল পৌঁছেছিলেন ভৈরোতাপা নামে একটি গ্রামে। সেখান থেকে ভুণ্ডা গ্রামে পৌঁছেছিলেন ২২শে এপ্রিল। পরদিনই রাত্রিবাস করেছিলেন বারহাট। এমনি করে ভাগীরথীর তটভূমি অনুসরণ করে ২৬শে এপ্রিল পৌঁছেছিলেন মনোরি গ্রামে। পরদিন ওয়েব দলবল নিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পৌঁছেছিলেন ভাটোয়ারী। হরিদ্বার থেকে এ পর্যন্ত পথ মোটামুটি সাধারণত চড়াই আর উতরাই। এপ্রিল মাসে নিম্ন হিমালয়ে প্রচণ্ড গরমে পরিশ্রান্ত হলেও তাঁদের অগ্রগতি ভালই ছিল। কিন্তু ভাটোয়ারী পৌঁছেই সামনের দিকের সাংঘাতিক পথ দেখে ভীত হয়েছিলেন। পনের দিন একটানা পদযাত্রায় ক্লান্ত অভিযাত্রীরা সামনের দিকের পথে এগিয়ে যাবার পূর্বে বিশ্রাম নিলেন ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত।

সামনেই বিপজ্জনক চড়াই। সংকীর্ণ খাড়া পথ, পাহাড়ের ধার কেটে কেটে যেন কোন রকমে পা রাখবার মতো সামান্য জায়গা ছিল। তার ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের। মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে পাথর যেন ঝুঁকে পড়েছে, সেখাম দিয়ে যাত্রীদের ঝুঁকে

পড়ে কোন রকমে এগিয়ে যেতে হয়। পাশেই পাহাড়ের খাড়া ধার, আর তার বহু নিচে ভাগীরথীর জলপ্রবাহ দেখা যায়। সেই জলপ্রবাহ যেন বিক্ষুব্ধ গিরিখাতের পাথরে পাথরে আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধ। অত উঁচু থেকেও যেন ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসতে চায়। তীর্থযাত্রীরা যদি কোন রকমে পা হড়কে যায় বা টাল সামলাতে না পারে, তাহলে অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যাবে ভাগীরথীর জলধারার মধ্যে। চল্লিশ মিনিট সাংঘাতিক পরিশ্রম করে কোন রকমে ওয়েব, র‍্যাপার হিয়ারসে তাঁদের দলবল নিয়ে পাহাড়ের শীর্ষদেশে পেঁৗছে গিয়েছিলেন। সেখানে সালাঙ নামে বেশ বড় গ্রাম দেখা গিয়েছিল প্রায় পথের মাঝখানে। সামনে দুটি ঝরণা দেখা গেল দূরে। পাহাড়ের ওপর থেকে জলধারা যেন ত্রস্ত পদে নেমে আসছিল নিচে। সেখানে শেষটায় দুটি জলধারা ভাগীরথীতে মিলিত হয়েছে। তারপর পনের মিনিট ধরে একটানা অবতরণ। যেন হুড়মুড় করে নেমে আসা। অবতরণের শেষে কাজলী নামে ছোট্ট নদী পেরিয়ে থেমেছিলেন ওয়েব বিশ্রাম নেবার জন্য; এই দুর্গম বিপজ্জনক পথ ও সাংঘাতিক চড়াই অতিক্রম করবার পর সবাই সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণ ধরে চলবার পর তাঁরা মাত্র তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। পথ যে শুধু দুর্গম তাই নয়, কষ্টসাধ্য অথচ বিপজ্জনক। এমনি দুর্গম পথের সামনে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে লক্ষ্য স্থলে পেঁৗছে যেতে পারবেন কিনা ওয়েব বুঝতে পারছিলেন না। সামনের দিকটা ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন। এইস্থান থেকে গঙ্গোত্রী পেঁৗছুতে আরো ছ-সাতদিন সময় লাগবে। এই পথ ধরে আরো এগিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও গঙ্গোত্রী যাবার কথা ভাবতে হয়েছিল। ওয়েব, র‍্যাপার ও হিয়ারসে এই পথ সম্পর্কে নানা সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। ভাগীরথীর উৎস সম্পর্কে ও গোমুখের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা সন্দেহ জেগেছিল তাঁদের মনে। নদীর গতিপথ লক্ষ্য করে সামনের সুউচ্চ গিরিশিরার দিকে তাকালে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে নদীর উৎস তুষারাবৃত পর্বত শিখরের সন্নিকটে তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে। এই পথের তীর্থযাত্রী ও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকেই ওয়েব শুনেছিলেন যে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাগীরথীর উৎস থেকে জল সংগ্রহ করে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতো। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পথ দুর্গম, সেখানে গঙ্গার জলধারা ক্ষীণ হয়ে স্তূপীকৃত বরফের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে এই ধারণা সংগ্রহ করবার পর ওয়েব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছিলেন যে গোমুখের অস্তিত্ব আসলে বইয়ের কাহিনীতেউ লিপিবদ্ধ। বইয়ে লেখা এই কাহিনীর সত্যতা নেই বিন্দুমাত্র। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়েব দলবল নিয়ে আরও অগ্রসর হবার পরিকল্পনা বাতিল করা স্থির করেছিলেন। ১৮০৮ সনের ১৫ই মে তারিখে ওয়েব এই প্রসঙ্গে কোলব্রুককে বিস্তারিত পত্রে জানিয়েছিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত।

কোলব্রুককে লেখা পত্রের সারাংশ, ওয়েব লিখেছিলেন—

১৫ই মে, ১৮০৮ সন।

"আমাদের পুনরায় যাত্রা পথের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবার পূর্বে আমিদু রুহ ও বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম। যাই হোক ২৭শে এপ্রিল ভাটোয়ারী পৌঁছেই গঙ্গোত্রী যাত্রার প্রায় সমস্ত বন্দোবস্তই করে ফেলেছিলাম। সামনের দিকের পথ অনুমান করে আমরা আমাদের ভারী মালপত্র একজন প্রহরীর তত্ত্বাবধানে ভাটোয়ারীতে রেখেই ২৮শে এপ্রিল তারিখে ভোরবেলায় এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করবার পর দেখে-ছিলাম—সাংঘাতিক চড়াই, সংকীর্ণ অথচ বিপজ্জনক পথে এগুতে যাবার চেষ্টা করে বুঝেছিলাম, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হবে। আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়েছিলাম ঐ সামান্য পথ অতিক্রম করবার পরই। অবশেষে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রাকৃতিক প্রতি-বন্ধকতা যদি আমাদের সার্থকতার পক্ষে অনিশ্চয়তা না আনতো, যদি আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকতো তাহলে এমনি মারাত্মক বিপজ্জনক পথ বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা যেতো। আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তন, যথা সকালে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, দুপুরে অসম্ভব গরম, এমনি অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে আমার সহযাত্রীরা যদি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়তো, তাহলে সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেতো। বিশেষ করে পক্ষকালের মধ্যেই অনেকের শরীর দুর্বল ও অশক্ত হতে চলেছে। এমন অবস্থায় সামনের আরো দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারি না।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান যাত্রী, ভাটোয়ারীর অধিবাসী, যে প্রায়ই গঙ্গার জল নিয়ে আসে উৎস থেকে, সে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল যে আমরা যে উদ্দেশ্যে এমন বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছি, সেখানে যাবার কোন সার্থকতাই নেই। কারণ, গঙ্গোত্রী থেকে উৎসের দূরত্ব অনেক বেশী। উচ্চহিমালয়ের একটি স্থান দিয়ে নদীর ধারা প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গোত্রীতে। সেখান থেকে নদীর উৎসে

গুহা বা গোমুখের কোন যোগাযোগ নেই। কারণ সেই উৎসের সঙ্গে গরুর মুখের কোন সাদৃশ্য নেই। এই তথ্য সংগ্রহ করেই আমরা গবেষণা থেকে বিরত থাকা স্থির করেছি। আমি যদি এই পথ ধরে আরো তিন চার দিন অগ্রসর হতাম, তাহলে আমার গবেষণার পরবর্তী অংশ সম্পূর্ণ করতে বিলম্ব হবে। এবং বিলম্ব হলেই অলকানন্দার উৎস স্থানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বিলম্ব হলেই হয়তো বা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাবে। আর বৃষ্টি শুরু হলে কোন কাজই সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে যদি ব্যর্থ হই, তাহলে সমস্ত জরিপের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। যদিও আমি গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করেছি, গঙ্গোত্রী পর্যন্ত জলের ধারা লক্ষ্য করা হয়েছে। যে দূরত্ব ষোল/আঠারো মাইল (সোজাসুজি ভাবে দূরত্ব অনুমান করলে), তাতে নদীর ধারা সম্পর্কে সন্তোষজনক পরিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আমরা বদ্রীনাথ যেতে পারবো।

আমার বক্তব্য পেশ করলাম। যে কাজের গুরুদায়িত্ব আমি নিয়েছি, সে দিক দিয়ে এই সব প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করলাম। যে কারণে প্রধান উদ্দেশ্য থেকে আমাকে সরে আসতে হয়েছে, সে কারণগুলি প্রকাশ করলাম। আশা করি এই সবগুলো যথেষ্ট হবে। আমি যদিও নিজে গঙ্গোত্রী গিয়ে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারি নি বলে, আমি একজন দায়িত্ব সম্পন্ন, বিশ্বস্ত স্থানীয় অধিবাসিকে গংগোত্রী পাঠাবার নির্দেশ দিলাম। তাকে মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে দিলাম কি কি তথ্য আমাদের প্রয়োজন হবে। তার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেলে যথা সময়ে জানানো হবে।"

ওয়েব তারপর দলবল নিয়ে মানোরি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন ১লা মে তারিখে। সেখান থেকে দ্রুত দলবল নিয়ে ১২ মে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ। ১৩ই মে তারিখে ওয়েব শ্রীনগরে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে চারদিন অবস্থান করবার পর ওয়েব, র‍্যাপার, হিয়ারসে কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছেছিলেন। পরদিন রাত্রি বাস করেছিলেন নন্দপ্রয়াগে। ২৭শে মে তারিখে দলবলসহ ওয়েব পৌঁছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ। ২৯শে মে তারিখে তাঁরা বদ্রীনাথ পৌঁছেছিলেন।

ওয়েব ও র‍্যাপারের গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ সনে এশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায়। পত্রিকার সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সভাপতি এইচ. টি. কোলব্রুক ওয়েবের প্রবন্ধের মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। গঙ্গার উৎস সন্ধান ও গঙ্গার গতিপথ

সম্পর্কে জরিপকার্য সম্পন্ন করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল কোলব্রুক। গুরুতর অসুস্থতার জন্য তিনি ওয়েব, র‍্যাপার ও হিয়ারসেকে নির্বাচিত করেছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে। কার্যস্থল থেকে ফিরে ওয়েব বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। ওয়েবের প্রবন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। সেই আলোচনায় অসুস্থ লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল কোলব্রুকও উপস্থিত ছিলেন ১৮১০ সনে। সেই বৎসরই লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল কোলব্রুক দেহত্যাগ করেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে জরিপ বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

এইচ. টি. কোলব্রুকের সমালোচনার সারাংশ ঃ

প্রাচীনকালে গঙ্গার গতিপথ Maps of Asia and India তে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে লামাদের অংকিত মানচিত্র দ্য অ্যানভেলিস ত্রুটিপূর্ন্য করে অংকিত করেছিলেন। দ্য অ্যানভেলিসের মানচিত্রটিকে ত্রুটিমুক্ত করে নির্ভুলভাবে অংকিত করেছিলেন জেমস রেনেল। সেই ঐতিহাসিক মানচিত্রের নাম ছিল The Maps of Hindusthan। এই মানচিত্র অংকনের জন্য মিশনারী তিয়েফেনথালারের সাহায্য নিয়েছিলেন। অবশ্য তিয়েফেনথালার চিহ্নিত করেছিলেন যে সরযূ নদী মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়ে হিন্দুস্থানে প্রবাহিত হয়েছে। তিনি গঙ্গার গতিপথ দেবপ্রয়াগ থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত চিহ্নিত করেছিলেন। এইচ. টি. কোলব্রুক লিখেছিলেন—"আমি অবশ্য দ্বিতীয় অংশটুকু প্রমাণসাপেক্ষ মনে করি, প্রথমটুকু অবিশ্বাসের বিষয় নয়।"

তিয়েফেনথালার কিন্তু কোন কিছুই ব্যক্তিগতভাবে জরিপ করেন নি। রেনেল ভুল করেই হয়তো ধারণা পোষণ করতেন যে, তিয়েফেনথালার গঙ্গোত্রী দর্শন করেছেন, তাই সেখানকার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সন্দেহের বিষয় এই যে তিনি গঙ্গোত্রীর অক্ষাংশ ও ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করতে পারেন নি। জেমস্ রেনেল অবশ্য অক্ষাংশ পরিবর্তিত করতে সাহস পান নি। তিনি গঙ্গোত্রীর অক্ষাংশ দেখিয়েছিলেন ৩৩°, যদিও তিনি মনে করতেন স্থানটি আরো উত্তরে হওয়া উচিত। লামাদের বর্ণিত গঙ্গার উৎস স্থান মাপামা হ্রদকে অনুমান করা হয়েছিল মানস-সরোবর। মানস-সরোবর থেকে আসা জলধারা গঙ্গোত্রীতে এসে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়েছিল নিম্ন অঞ্চলে। তিয়েফেনথালার এই ধরনের বর্ণনাই দিয়েছিলেন। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে রেনেল কখনো হয়তো ভাবতেই পারেন নি যে মিশনারী তিয়েফেনথালার গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যান নি।

অ্যাংকুইটিল দ্য প্যায়নের কাছে পত্রালাপ করেছিলেন রেনেল। প্যায়ন অবশ্য পত্রোত্তরে জানিয়েছিলেন যে তিনিও গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যান নি। তিয়েফেনথালারের নিজস্ব বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তিনি হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত কম্পাস নিয়ে জরিপ করেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত কম্পাসের ব্যবহার করেন নি। বদ্রীনাথ ও মানাগ্রাম—এই পথ দিয়ে তিনি হয়তো গিয়েছিলেন। শ্রীনগর থেকে গোমুখ পর্যন্ত পথের কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছিলেন। সেজন্য মনে হয়েছে, এই সব স্থানের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লিখেছিলেন। অবশ্য রেনেলের ধারণা, এই পথে তিয়েফেনথালার নিজেই গিয়েছিলেন। রেনেলের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৭৯২) শ্রীনগরের অবস্থান ত্রুটিশূন্যভাবে দেখানো হয়েছে। ১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন গুথেরু (Guthrie) ও মিঃ ড্যানিয়েল শ্রীনগর গিয়েছিলেন। তাঁরাই তিয়েফেনথালারের ত্রুটি উল্লেখ করেছিলেন। পরে অবশ্য সেই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল। তিয়েফেনথালার হরিদ্বার থেকে শ্রীনগরের কথায়—শ্রীনগরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লিখেছিলেন--শ্রীনগর উত্তর, উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সংশোধিত হয়ে সেটি হয়েছিল—পূর্ব, উত্তর-পূর্বে। সর্বশেষে রেনেল মন্তব্য করেছেন—ভাগীরথী ও অলকানন্দা এই দুটি ধারার একটি উত্তরে, অপরটি উত্তর-পূর্ব থেকে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে। তারপর এই দুটি ধারার জলরাশি মূল গঙ্গা হয়ে হিন্দুস্থানে শিবালিকা পর্বতমালা পেরিয়ে এসেছে হরিদ্বারে। অলকানন্দা সব চাইতে বড় ধারা। সেই ধারার উৎস ভারতবর্ষের উত্তরে তিব্বত, যে উৎস স্থান বদ্রীনাথ থেকে দেখা যায়। সেই বদ্রীনাথ শ্রীনগর থেকে নয় দিনের পায়ে চলা পথ। এই অলকানন্দাই সম্ভবত দ্য হালদার বইয়ে মেন চৌ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগীরথীর উৎস স্থান অলকানন্দার উৎস স্থানের চাইতে বহুদূরে। রেনেল বলেছেন—এইটি গঙ্গার শীর্ষভাগ। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে—সম্রাট কাঙহি লামাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। সে তথ্য যত ত্রুটিপূর্ণই হোক না কেন। ওতে জরিপের ত্রুটি রয়েছে, ভুলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সাধারণ বিষয়কে অন্যভাবে প্রচার করা হয়েছে। গঙ্গা মাপামা হ্রদ থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে পশ্চিমে, পরে দক্ষিণে এবং সর্বশেষে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রেনেল হয়তো বলতে চেয়েছেন—লামাদের বর্ণিত গঙ্গার উৎস-মাপামা হ্রদ বা মানস-সরোবর।

গঙ্গার গতিপথ বর্ণনায় ত্রুটি থাকুক, উৎস সম্পর্কে দ্বিমত হওয়া চলে না।

তিয়েফেনথালার অবশ্য দূত পাঠিয়েছিলেন লামাদের তথ্যের সত্যতা যাচাই করবার জন্য কিন্তু তাঁর নিজের বিবরণ ও লামাদের বিবরণে মিল দেখা গিয়েছে।

সমস্ত আলোচনা সমালোচনা বিচার করে কর্নেল কোলব্রুক ও এইচ. টি. কোলব্রুকের মনে হয়েছে ঃ

সমস্ত বিবরণ ও মানচিত্রগুলিতে গঙ্গা ও তুষারাবৃত পর্বতশিখরগুলি দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্রগুলি—রো স্মিথ কর্তৃক প্রকাশিত ১৮০১ সনের এশিয়া ও ভারতবর্ষের মানচিত্র, ১৮০৪ সনের এশিয়া ও ভারতবর্ষের মানচিত্র। লামাদের মানচিত্রে গঙ্গা মাপামা হ্রদ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে কয়েকশ মাইল। এই ধারণার যথার্থতা অত্যন্ত ক্ষীণ। আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, এই ধারা অলকানন্দার চাইতেও ক্ষীণ; যেটি ভাগীরথী বলে পরিচিত। এই ধারার উৎস বড় জলধারার উৎস থেকে অনেক দূরে এবং যা শত শত মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করবার পথে পার্বত্য ধারাগুলি থেকে কোন কিছুই পায় নি। এইচ. টি. কোলব্রুক বলেছেন—আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে যে মিশনারীরা দেসদেরী ও ফেয়ার লাডাকে গিয়েছিলেন জুন মাসে, সেখানে তাঁরা দু'মাস (২৬শে জুন থেকে ১৭ই আগস্ট ১৭১৫ সন) অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে ২৬ দিনে তুষারমণ্ডিত পর্বতমালা অতিক্রম করে কাণ্টেল পর্বতে পেঁছে আবার ফিরে এসেছিলেন লাডাকে। তাঁরা সে দেশের ভীতিপ্রদ অবস্থা দেখেছিলেন। সেখানে শীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন কিছুই দেখতে পান নি। এমন কি, তাঁরা গঙ্গার ধারা শহরের কাছ দিয়ে দেখতে পান নি এই পথের সমতল অংশ অতিক্রম করবার পর। কিন্তু লামাদের মানচিত্রে এ ধরনের উল্লেখ ও চিহ্ন রয়েছে। লামাদের বিবৃতিতে ত্রুটিপূর্ণ কিছু না থাকাই সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন রেনেল। অ্যাঙ্কুইটিল দ্য প্যারন কিন্তু লামাদের মানচিত্রে তথ্যের ত্রুটি, বর্ণনার বৈষম্য লক্ষ্য করে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। এই ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্র সবাইকে বিভ্রান্ত করবে। পূর্ব প্রান্তে পর্বতশ্রেণী, নদীর উৎস প্রত্যক্ষ না করা, নদীর গতিপথ চিহ্নিত না করা, এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও লামারা বলেছিলেন যে নদীটি পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত। এই ত্রুটিপূর্ণ ভৌগোলিক তথ্যের ওপরে বিশ্বাস করা যায় না। লামাদের মানচিত্রের ত্রুটি রেনেল জানতেন। তিনি শুধু সম্রাট কাঙহির প্রেরিত এই

অভিযানের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস হিমালয় পর্বতের পাদদেশের একটি প্রস্রবণ থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করলে পুরাণের কাহিনীর উল্লেখ করেন। তাতে লেখা আছে, গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে, অথবা অপর একটি হ্রদ—বিন্দু-সরোবর থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে হিমালয়ে প্রবেশ করবার পূর্বেই। কিন্তু এই দুটি হ্রদই মিলে-মিশে একাকার হয়ে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যেও বৈষম্য বর্তমান। এই অদ্ভুত জটিলতার সমস্যা সমাধান করে ভৌগোলিক তথ্য উদ্ধার করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোন হিন্দুই প্রমাণ করতে পারবেন না যে নদীর ধারা গোমুখ থেকে হ্রদ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

যিনি সেকালে মানস-সরেবের দর্শন করেছিলেন বলে দাবি করেন—তিনি কৈলাস পর্বত ও ব্রহ্মদণ্ডের অবস্থানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে ভাগীরথী ও অলকানন্দার উৎসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি কাশ্মীর থেকে ফিরবার সময় গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন। সেখানে নদীর ক্ষীণ ধারার কথা উল্লেখ করেছিলেন। নদীর ধারা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে—নদীর ধারা এত ক্ষীণ যে লাফ দিয়ে ধারা ডিঙিয়ে পেরুনো সম্ভব। মানস-সরোবর তীর্থযাত্রার সময় তিনি পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন। তখন মুখ্য প্রশ্নগুলির উত্তরে মেনে নিয়েছিলেন যে—সরযূ ও শতদ্রু নদী মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয়েছে। গঙ্গা কৈলাস পর্বতের কাছেই প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রাণপুরী হয়তো পুরাণের কাহিনী অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। গঙ্গোত্রী দর্শন করে প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীর বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে গঙ্গার ধারা এত ক্ষীণ যে নদীর এপার থেকে লাফ দিয়েই ওপারে যেতে পেরেছিলেন অক্লেশে।

প্রাণপুরীর এই উক্তিকে যথার্থ মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই ক্ষীণ জলধারাকে কোন ক্রমেই নদী বলা চলে না; বরং ক্ষীণ ধারাই বলা চলে। সেই ধারাই বহু দূরের কোন ঝরণা থেকে নিঃসারিত হয়েছে। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে গঙ্গার দীর্ঘ ধারা হ্রদ থেকে হ্রদে, পর্বত থেকে পর্বতে, হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বত অতিক্রম করে নেমে আসা ধারা। পুরাণে লেখা আছে, গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মেরু পর্বতের ওপরে, সেখান থেকে চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পর্বত শিখর থেকে নেমে এসে পতিত হয়েছে চারটি হ্রদে।

যদি এই কাহিনীকে সত্য বলে মনে করা হয়, এই সত্যের যাচাই করে

আর যে সব তথ্য রয়েছে তার মূল বিষয় নির্ধারণ করা উচিত। এই সব-কিছু করবার পরই বলতে হবে, এই কাহিনী সত্য, না সত্যই কোন গল্প? কোন প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে অনুমান করে সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছুই বলা চলে না। সম্ভাব্য সব কিছুই বাতিল করলে আর কি অবশিষ্ট থাকবে, শুধু মাত্র অসম্ভাব্য। তখন কিন্তু সত্যের চাইতে মিথ্যারই বেশী অংশ অবশিষ্ট থাকে।

সর্বশেষে আমাদের ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের আনুমানিক ভিত্তির ওপরে নির্ভর করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য খুব সামান্যই নির্ভরশীলতা থাকবে, সেই সামান্য নির্ভরশীলতাকে যাচাই করবার জন্য এই ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, গবেষণালব্ধ ফল, অনিশ্চয়তাকে দূর করতে পারবে। তাই আমাদের কিছু কিছু তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে—(১) এমন কোন হ্রদের অস্তিত্ব আছে কিনা, যা তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গের সন্নিকটে অবস্থিত রয়েছে। কারণ, হিন্দু ঋষি-গণের বর্ণিত বিন্দু সরোবরের ও মানস-সরোবরের অস্তিত্ব শুধু মাত্র পুরাণেই আছে কিনা? (২) লামাদের বর্ণিত মাপামা ও ল্যাঙকোডা হ্রদ দুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে কারণ সেখান থেকেই একটি নদী নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেই নদীই কি অলকানন্দা? এ প্রশ্ন, এ তথ্যের প্রামাণিক যথার্থতা স্থির করতে হবে। এমন একটি নদীর কথা পুরাণে আছে, জ্যোতির্বিদ ভাস্করও এমন ধরনের উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের তথ্য যেমন পুরাণে আছে, প্রাণপুরী ও তিয়েফেনথালারও মেনে নিয়েছেন। এইচ. টি. কোলব্রুক লিখেছেন:

সমস্ত বিষয় পুঙখানুপুঙখভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, হিন্দু-স্থানের হিন্দু তীর্থযাত্রীরা গঙ্গার ধারা চিহ্নিত করেছেন ভারতবর্ষের শেষ সীমান্ত উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে প্রসারিত তুষারাবৃত পর্বতমালায়। সেই নদীর উৎসের সন্ধানে অগ্রসর হতে গেলে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে তুষারাবৃত গিরিশিরা পেরিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে হবে। তিব্বতে লামা জরিপকারীরা পথ নির্দেশ করেছিলেন কেনটেইসে পর্বতমালায়। তুষারা-বৃত পর্বতমালা পশ্চিম-দক্ষিণে প্রসারিত।

এবার এর মাঝখানের অঞ্চল রূপকথা ও রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরা। সেখানকার রূপকথায় ভরা অঞ্চল কি উচ্চ পার্বত্য উপত্যকা? সে স্থান কি সুউচ্চ তুষারাবৃত গিরিশিরার দ্বারা ঘিরে রাখা অঞ্চল? এইসব প্রশ্নের উত্তর কি করে পাওয়া যাবে। এ অবস্থায় বিচার করা দুঃসাধ্য

ব্যাপার। কারণ, এমন অনিশ্চিত কাহিনীভরা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় খুঁজে বার করা অসম্ভব। সে দেশে পেঁছিবার জন্য পথ কোথায়? সেখানে পেঁছিবার জন্য সূক্ষ্ম ভৌগোলিক নির্দেশই বা কোথায়? এমন অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত ভৌগোলিক পরিবেশের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। যাই হোক, শেষোক্ত অবস্থান নিয়েই ভাবা যাক, যা নিয়ে মোটামুটি সম্ভাব্য অনুমান করা যেতে পারে। বদ্রীনাথ থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ৫৭ মাইল। এই দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলেন তিয়েফেনথালার। কর্নেল হার্ডউইক এই দূরত্বকে নয় দিনের পদযাত্রা বলে উল্লেখ করেছিলেন। রেনেল বদ্রী-নাথের অবস্থান নির্দেশ করেছিলেন—৩০°১৪ উত্তর ও ৭৯° পূর্ব। কিন্তু লামাদের জরিপের শেষ প্রান্তের অবস্থান ছিল পিকিঙের ৩৬° পশ্চিমে। পিকিঙের অবস্থান ২৯°৩০′ ও ৮১°। এই ভৌগোলিক অবস্থান দ্য হালদের মানচিত্রে নির্দেশিত ছিল তর্থাৎ বদ্রীনাথের দক্ষিণে পিকিঙের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তথ্যগত ভুল থাকলেও অনুমান করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে হ্রদের অবস্থান নিয়ে, যে হ্রদ থেকে অলকানন্দা সত্যই নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এইচ. টি. কোলব্রুক বৃটিশ অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে বলেছেন—এখনো আরো কঠোর সাধনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে সত্যিকারের জরিপের কাজ, উৎস সন্ধান, হরিদ্বার থেকে গঙ্গার শেষ প্রান্ত অবধি পথের নিশানা চিহ্নিত করে এসেছেন সুদূর অতীত যুগের হিন্দু তীর্থযাত্রীরা। বর্তমান গবেষণার বিষয় শুধু—এই দীর্ঘ নদীর ধারা ও দুর্গম পথের সহজ সম্ভাব্য পথের নির্দেশই পুনরুদ্ধার করা। সুতরাং জাতীয় কৃতিত্ব নির্ভর করবে—অনিশ্চয়তা ও সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন পরিহার করা। এই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নদীর উৎস—যা কোন প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই উৎস মুখ অনুসন্ধান কার্য যে বিশাল নদী সুদূর অতীত যুগ থেকে জলভার বহন করে নিয়ে এসে বিশাল ভূ-ভাগকে সমৃদ্ধ ও শস্য শ্যামলা করেছে, সেই নদীর নাব্যতা অনুসন্ধান করা।

১৮০৮ সনে ওয়েবের সংগৃহীত হিমালয়ের দক্ষিণাংশে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য ঃ

এই অভিযানের ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সে অভিজ্ঞতা সর্বসম্মত বলে মনে করি। দীর্ঘ যাত্রাপথে দেখা প্রস্রবণ থেকে নির্গত ধারা অসংখ্য ধারায় মিলিত হয়ে আট থেকে দশ মাইল জলধারা স্ফীত হওয়াই সম্ভব। ভাগীরথী ও অলকানন্দার গতিপথ অনুসরণ করতে করতে ভাগীরথীকে ক্রমশ শান্ত ও প্রশান্ত, অলকানন্দাকে ক্রমে ক্ষীণ হতে

দেখেছি। তারপর আশেপাশের ধারা ও ঝরণা, ওপরের সঞ্চিত তুষার, সব কিছু থেকেই নদীর ধারা পুষ্ট হয়েছে। নদীর এইসব বিচিত্র ধারা লক্ষ্য করে উৎস কথাটার অর্থ আদৌ স্পষ্ট হয় নি। বড় নদীর ধারা সাধারণত পার্বত্য অঞ্চল থেকে ঢালু পথে অবতরণ করতে থাকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে। নদীর গতি পথের পাশ দিয়ে সাধারণ সম্ভাব্য পথ তৈরী হয়ে থাকে। নদী সেখানে উচ্চ স্থান থেকে হঠাৎ নিম্নভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। সেখানে পাহাড়ের খাড়া পাথরের ধার দিয়ে বিপুল বেগে জলধারা ঝাঁপিয়ে অবতরণ করতে থাকে; শুধু মাত্র সেই স্থানেই পথ বলে কিছু থাকে না। গঙ্গার গতিপথে অবশ্য এমন ধরনের জলপ্রপাত কোথায়ও দেখা যায় নি। ভাগীরথী ও অলকানন্দার ধারা যদি যথার্থই হিমালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে নদীর ধারা চিহ্নিত হবে। তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য অংশে নদীর অবতরণের পথে ঘাটির (গিরিপথ) সৃষ্টি করবে। নদীর সৃষ্টি থেকে প্রবহমানতার স্পষ্ট নিয়ম থাকবে। যেহেতু তুষারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করে নদীর উৎসের দিকে অগ্রসর অসম্ভব। কাজেই গঙ্গার উৎস সম্পর্কে সমস্ত কাহিনীই অবাস্তব।

॥ ১১ ॥

নাহং জানে তব মহিমানং

'The Himalaya mountains are standing between them and the sources of the Ganges ; explorers had only two courses open to them, they had either to climb over snows of the Himalayan crest or they had to pass through long narrow gorges of rocks through which torrents were raging. Their dangers and their deaths inspired to poetry of their nomenclature.'

Burrard,

হিমালয় পর্বতমালা, তার আর গঙ্গার উৎস, এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনুসন্ধানীদের সামনে মাত্র দুটি পথই রয়েছে খোলা। হয় তারা তুষারাচ্ছন্ন গিরিশিরার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে

যাবে, অথবা দীর্ঘ সংকীর্ণ প্রস্তরময় গিরিখাতের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে হবে। সেখান দিয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে গর্জন করতে করতে। তাদের ভয় ও মৃত্যু প্রেরণা জাগাবে কবিতা অলংকরণের জন্য।

কিন্তু ভয় ও মৃত্যুর প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি ওয়েব, র‍্যাপার ও হিয়ারসেকে। কারণ, তাঁরা গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন নি। ভাটোয়ারী থেকে তিন চার মাইল পথ পেরুবার পরই ফিরে আসতে হয়েছিল। গঙ্গোত্রী দর্শন হয় নি, গোমুখ তো আরো অনেক দূরে। সেখানে ভয় ছিল, মৃত্যু ভয়। দুর্গমের ভয়ে বিহ্বল হয়ে গবেষণা কার্যে আর এগুতে পারেন নি। গবেষণা স্থগিত রাখতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। সহযাত্রীরা, তীর্থযাত্রীর দল এগিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রীর পথে। ভয় ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করেছিলেন তাঁরা। সুদূর অতীত যুগের তীর্থ-যাত্রীদের দীর্ঘ পদযাত্রা—ভয় ও মৃত্যুকে জয় করবার ইতিহাস। তাঁরাই দুর্গম পথের নিশানা জানতেন বংশ-পরম্পরায়। মহারাজ ভগীরথের অদৃশ্য পদচিহ্ন পথের বুকে আঁকা রয়েছে। সে পথের চিহ্ন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা।

ভাটোয়ারী থেকে ফিরে এসে ওয়েব ব্যর্থতার হিসাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্নেল কোলব্রুকের কাছে। সামনের পথ আরো দুর্গম, সেখানে বিপদ ও অনিশ্চয়তা। ১৮০৮ সনের ২৯শে এপ্রিলের কথা, পথ তখনকার দিনে দুর্গম ছিল নিশ্চয়ই। সামনেই ছিল গাঙ্গানানী—তার আগের পথটুকু দুর্গম ছিল। সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করবার পর তীর্থযাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতেন ধর্মশালায়। গরম কুণ্ডে স্নান করে ক্লান্তি দূর করতেন। আবার নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতেন আরো দুর্গম ও খাড়া চড়াই পেরিয়ে সুখী। তারপর হারসিল বা হরিপ্রয়াগ, ধারালী, কঠিন চড়াই পেরিয়ে পৌঁছে যেতেন ভৈরব ঘাটি। চড়াইয়ের সমাপ্তি, ভয়, মৃত্যুর কাছ থেকে আশ্বাস নিয়ে পৌঁছে যেতেন গঙ্গোত্রী।

যতদূর মনে পড়ে, বাস রাস্তা ১৯৬০ সনেও উত্তরকাশী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। টিহরী থেকে ধরাসু, এই পথের মাঝখানের দূরত্ব-টুকুতে ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকতো। তীর্থযাত্রীরা তখন এগিয়ে চলতেন পায়ে হেঁটে। ধরাসু থেকে উত্তরকাশীর মাঝামাঝি স্থানেও ধস নেমে পথ বন্ধ হয়ে থাকতো। তেমনি, উত্তরকাশী থেকে মাল্লা পর্যন্ত পথ বর্ষার শুরুতেই বন্ধ হত ধস নামার ফলে। মাল্লা থেকে ভাটোয়ারী

আর সেখান থেকে গাঙ্‌নানী—এই পথের অনেক স্থানেই ধস নেমে তীর্থ-যাত্রীদের পথ চলায় বিরতি ঘটাতে চাইত। সে যুগের পথ ছিল দুর্গম, তবু পথ চলার বিরাম হত না। প্রকৃতির সব বাধা তীর্থযাত্রীদের যেন পথ ধরে নিয়ে যেতো ভয় ও মৃত্যুকে জয় করবার জন্য। ১৯৬০ সনে বাসে উত্তরকাশী থেকে গিয়েছিলাম ভাটোয়ারী। ১৯২৬ ও ১৯৬০ সনে বাস চালু হয়েছিল হারসিল অবধি। তারপরের বছরই বাস পথ এগিয়ে গিয়েছিল ধারালী। ১৯৬০ সনে বাস পথ এগিয়ে গিয়ে থেমেছিল লংকা চটিতে। জাহ্নবী গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে ভৈরবঘাটি। জাহ্নবী গঙ্গার এপারে লংকা চটি, ওপারে ভৈরবঘাটি। সেখান থেকেই গঙ্গোত্রীর পথ। জাহ্নবী গঙ্গার তীর ধরে পায়ে চলা পথ এগিয়ে গিয়েছে নেলাঙ্‌ গ্রামের দিকে। ভারত-তিব্বত সীমান্ত স্থানের সন্নিকটেই শেষ গ্রাম নেলাঙ্‌। গ্রাম পেরুতেই তিব্বত সীমান্তের গিরিপথ জেলুখাগা বা সাঙ্‌ চোক্‌লা (১৭৪৯০ ফুট)। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত পথের বিবর্তন দেখছি। ভাগীরথীর তটভূমিকে কখনো দেখেছি সহজ সরল রেখার মতো, কখনো বা সরীসৃপের মতো। গাঙ্‌নানী ছাড়বার পর দেখেছি ভাগীরথীর জলধারা উচ্চ স্থান থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দু-তিন শ ফুট নিচে। নদীর সে অদ্ভুত গর্জন, বিস্ময়কর জলোচ্ছ্বাস ওয়েব তাঁর দলবল নিয়ে এসে দেখতে পাবার সুযোগ পায় নি। পথের বিবর্তন ও ভাগীরথীর জলপ্রবাহের সৌন্দর্য সুখী থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত অপরূপ। ভৈরবঘাটি থেকে গঙ্গোত্রীর সামান্য পূর্বে পাটাঙ্গনায়—ভাগীরথীর গিরিখাতের সৌন্দর্য অতুলনীয়। পাটাঙ্গনা থেকে গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি গিরিখাতের পাথর, গ্লেসিয়াল পেভ্‌মেণ্টের চিহ্ন ওয়েবের নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। গঙ্গোত্রীর পথের সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়েছি নীলাভ জলধারার পাশ দিয়ে। পাইন, চীর আর দেওদার গাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভুলে গিয়েছি পথের কথা। দূরত্বের হিসেবে ভুলে গিয়ে কখন যেন পৌঁছে গিয়েছি গন্তব্য স্থলে। যান্ত্রিক যুগে হয়তো বা পথের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত হয়েছে, পথের সৌন্দর্য হারিয়ে গিয়েছে।

ভাটোয়ারীতে আমি কয়েকবার রাত্রিবাস করেছি। সেখান থেকে বহুদূরের দিকে তাকালে ভাগীরথীর ধারা সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। সুউচ্চ তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গও দেখা যায় না সেখান থেকে। এপ্রিল মাসে হয়তো বা শীতের বরফ চোদ্দ পনের হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপরে নির্ভর করে

গঙ্গার উৎস সম্পর্কে এমন চূড়ান্ত বিবরণ পেশ করেছিলেন ওয়েব এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে আলোচনার জন্য।

প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগীরথীর ধারাকে অত্যন্ত ক্ষীণধারা বলে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গোত্রীতে তিনি ক্ষীণ ধারা লাফ দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গোত্রী ভ্রমণের এই বিস্ময়কর তথ্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন এশিয়াটিক রিসার্চে একটি প্রবন্ধে। গঙ্গোত্রী মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথীর ধারা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই ধারার বিস্তার অনূ্যন পক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট। ভাগীরথী পেরুবার জন্য সাধারণ কাঠের সেতু ছিল। বর্তমানে সেতুটি মোটামুটি মজবুত করা হয়েছে। ভাগীরথীর তটভূমির দিকে লক্ষ্য করলে জলধারার বিস্তার ১৮০৮ সনে আরো বেশী ছিল বলেই মনে হয়। ভাগীরথীর ওপারে আরো একটি ছোট জলধারা রয়েছে। তার নাম কেদার গঙ্গা। এই কেদার গঙ্গা এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেদার গঙ্গার ক্ষীণ ধারাও কিন্তু লাফ দিয়ে পেরুনো সম্ভব নয়। প্রাণপুরী গঙ্গোত্রী দর্শন করেছিলেন কিনা সন্দেহ। দর্শন করলে এ ধরনের অবিশ্বাস্য তথ্য এশিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশ করেছিলেন কেমন করে? এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এইচ. টি. কোলব্রুক ভাগীরথী নদীকে আদৌ নদী বলে স্বীকার করতে চান নি। ভাগীরথীর উৎস স্থান অদূরেই কোন ঝরণা বলে অনুমান করেছিলেন। কোলব্রুক লিখেছিলেন—"From a stream so narrow that it may be crossed at a single leap, is a mere rivulet or brook whose remotest fountain can not be but few miles distant."

কোলব্রুক বর্ণিত ছোট্ট ধারাই হোক না কেন, রেনেল তাঁর বর্ণনায় বলেছেন গঙ্গার দুটি শাখা সম্পর্কে। তিনি বলেছেন—ভাগীরথী ও অলকানন্দা এই দুইয়ের মধ্যে ভাগীরথীই গঙ্গার মুখ্য ধারা—"as the head of the Ganges itself," বলে উল্লেখ করেছেন। ভূগোল বিজ্ঞানীরা রেনেলের এই ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেছেন। তাঁদের ধারণা রেনেল জনশ্রুতি ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের তথ্যগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে লেখা আছে বিন্দু সরোবরের তীরে দীর্ঘ তপস্যা করে ভগীরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করেছিলেন। গঙ্গার বরলাভে বলীয়ান হয়ে ভগীরথ পবিত্র ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্তে। ভগীরথ যে ধারা নিয়ে এসেছিলেন তার নাম ভাগীরথী।

ভাগীরথীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে গঙ্গা আনয়নের কাহিনী ওতঃ-

প্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু অলকানন্দার এমন কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নেই। গঙ্গার যে ধারা অলকাপুরী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার নাম অলকানন্দা। রেনেল লিখেছেন—ভাগীরথীর উৎস স্থান থেকে বহু দূরে। কোলব্রুক এই উক্তির বিরোধিতা করেছেন। রেনেল হয়তো তাঁর পূর্ব ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে বলেছেন—এই ধারাই মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। প্রাণপুরী মানস-সরোবরে গঙ্গার উৎস প্রত্যক্ষ করার দাবি করেছিলেন। রেনেলের জরিপ ও তার ফলশ্রুতি The Maps of Hindusthan ত্রুটিপূর্ণ হলেও ওয়েব ও র‍্যাপারের জরিপ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। রেনেলের মূল দাবি গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর, এ তথ্য ভিত্তিহীন বলে সোচ্চার হতে পারেন নি তাঁরা। ওয়েব লিখেছেন—"With respect to the cow's mouth, we had the most convincing testimony to confer us in the idea that its existence is entirely fabulous and that it is found only in the Hindu book of faith."

ভাগীরথীর উৎস সম্পর্কে ওয়েব লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্নেল কোলব্রুককে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায়ঃ "That the source of the river is more remote than the place, called Gangotri which is merely the point whence it issues from the Himalaya not is retated through a secret passage or cavern bearing any similitude to cow's mouth, but its current is perceptible beyond that place, although the acces be so obstructed as exclude all further researches."

রেনেল গঙ্গার ধারার সমস্ত অংশই সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। তাই তাঁকে অপরের সংগৃহীত তথ্য ও জনশ্রুতির ওপরে বেশী আস্থাশীল হতে হয়েছিল। ওয়েব ও র‍্যাপার অন্ততপক্ষে ভাটোয়ারী পর্যন্ত সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভাগীরথীর জলধারা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তাঁরা গঙ্গোত্রী যেতে না পারলেও লোক নিযুক্ত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়েছিলেন। এছাড়াও অলকানন্দার গতিপথ অনুসরণ করে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। তাই তুলনামূলকভাবে ওয়েব ও র‍্যাপারের গঙ্গার জরিপ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য রেনেলের তথ্যের চাইতেও বেশী নির্ভরশীল ছিল। গঙ্গার জরিপ সম্পর্কে ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন বুরার্ড—"The mistake of Raper and Webb is more instructive than that of Rennell, the latter was merely basing conclusions on hearsay evidence,

the former actually penetrated and passed the great Himalaya through stupendous defiles carved by the Ganges but so hemmed in were they by mountains that thay entirely failed to understand that they had crossed the snowy range.''

র‍্যাপার ও ওয়েবের ত্রুটি অন্তত রেনেলের তুলনায় আরো বেশী নির্দেশক। শেষার্ধজন শুধুমাত্র জনশ্রুতির সাক্ষ্য নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু প্রথমার্ধগণ যথার্থই প্রবহমানা গঙ্গার দ্বারা সৃষ্ট গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে হিমালয়ের গহনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু গিরিশিরার জটিলতার অভ্যন্তরে পেঁছেই অনুমান করতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছিলেন যে তাঁরা কেমন করে তুষারাবৃত গিরিশিরা অতিক্রম করেছিলেন।

বুরার্ড লিখেছিলেন—From the bed of the Ganges on the northern side of the Himalaya, Raper and Webb reported that they had found the source of the river on the southern side. হিমালয়ের উত্তরাংশে গঙ্গার ধারা থেকে র‍্যাপার ও ওয়েব বিবরণ দিয়েছিলেন যে তাঁরা নদীর উৎস দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্য করেছিলেন।

১৮০৮ সনে গঙ্গার উৎস সন্ধানের ফলশ্রুতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্য আরও বাড়িয়েছিল। তার পরোক্ষ ফল সম্ভবত ১৮১২ সনে মুরক্রফ্ট ও হিয়ারসের মানস-সরোবর অভিযান। গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে—এ তথ্যের স্মৃতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের মন থেকে মুছে যায় নি। মুরক্রফ্ট হয়তো মানস-সরোবর দর্শন করে এই সন্দেহ নিরসন করবার চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন।

১৮১২ সনের ২৬শে মে উইলিয়ম মুরক্রফ্ট ও ক্যাপ্টেন হিয়ারসেকে সঙ্গে নিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ। তাঁদের উদ্দেশ্য ধৌলীগঙ্গার ধারা অনুসরণ করে নিতি গিরিপথ পেরিয়ে পেঁছে যাবেন তিব্বত। সেখান থেকে পেঁছে যাবেন মানস-সরোবর, যাত্রা পথে ধৌলীগঙ্গার দীর্ঘ ধারা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই দুর্গম যাত্রাপথে হরখদেব পণ্ডিত নামে স্থানীয় বুদ্ধিমানকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। ২৭ মে তারিখে তাঁরা পেঁছে গিয়েছিলেন তপোবন। যাত্রা পথে জরিপ করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তপোবনে ৩১শে মে পর্যন্ত অবস্থান করার পর আবার তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। যোশীমঠ থেকে তপোবনের পথে পথে ধৌলীগঙ্গাকে দেখা গিয়েছিল প্রায় কুড়িগজ প্রশস্ত। মালারির কাছে নদীর বিস্তার দুগজেরও কম বলে মনে হয়েছিল। মালারি গ্রামের আশে-পাশে জরিপ সমাপ্ত করে মুরক্রফ্ট ৪ঠা জুন তারিখে পেঁছে গিয়েছিলেন

নিতি গ্রামে। সেখানে নদীর বিস্তার দশ গজ, জলের গভীরতা চার ফুট। নদীর উচ্ছল হিমশীতল জল উচ্চ পার্বত্য পথ বেয়ে দুর্বার বেগে নেমে আসছিল।

নিতিগ্রাম, তিব্বত সীমান্তে পৌঁছবার পূর্বের শেষ গ্রাম। এই গ্রাম থেকে এগিয়ে গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। মুরক্রফ্‌টকে প্রায় উনিশ দিন গ্রামে অবস্থান করতে হয়েছিল গাইড ও রসদ সংগ্রহ করবার জন্য। ২৯শে জুন তারিখে তাঁরা আবার অগ্রসর হয়েছিলেন নিতি গিরিপথের দিকে। পথিমধ্যে ধৌলীগঙ্গা ও অপর একটি ছোট্ট নদীর সঙ্গমস্থল লক্ষ্য করেছিলেন। সেই নদী উৎপন্ন হয়েছে নরনারায়ণ পর্বতের পাদদেশে থেকে। সঙ্গমস্থলে সম্মিলিত জলরাশির বিস্তার প্রায় পঁচিশ গজ। সেই স্থান থেকে এগিয়ে যেতেই নিতি গিরিপথের কাছেই ধৌলীগঙ্গায় উৎস স্থান।

পর্বত দেখেছিলেন। ১লা জুলাই তারিখ নিতি গিরিপথ অতিক্রম করতেই দেখতে পেয়েছিলেন কৈলাস পর্বত ও মানস-সরোবর। গিরিপথ পেরিয়ে মুরক্রফ্‌ট যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই ধৌলী উপত্যকার ওপারে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিব্বতের মালভূমিতে। এই সম্পর্কে বুরাড বলে-ছিলেন—র‍্যাপার ও ওয়েবের মতো মুরক্রফ্‌টও ভুল করেছিলেন। তাঁরা ধৌলীগঙ্গার গতিপথে অগ্রসর হয়ে যখন ২৯শে জুন এগিয়ে গিয়েছিলেন নিতি গিরিপথের দিকে, তখন থেকেই আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান হয়তো বা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। ১লা জুলাই গিরিপথ পেরিয়েই মুরক্রফ্‌ট যেন আকস্মিক দেখতে পেয়েছিলেন—কৈলাস ও মানস-সরোবর। অর্থাৎ তাঁরা ধৌলী উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও তিব্বতের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন নি।

হিমালয়ের বিশাল গিরিশ্রেণী সমস্ত তিব্বতকে প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখেছে। দুর্লঙ্ঘ্য সে প্রাচীর। সেই প্রাচীয়ের মধ্যে একমাত্র প্রবেশপথ হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিপথ। এই গিরিপথ অতিক্রম করেই সুদূর অতীত থেকে ভারতীয় মুনি ঋষিগণ, তীর্থযাত্রী ও পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীরা যাতায়ত করতেন। হিমালয়ের এই তুষারাবৃত গিরিসংকটে পৌঁছবার পথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিমালয়ের নদীর গতিপথ। এইসব নদীগুলির অধিকাংশই হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণগাত্র থেকেই উৎসারিত হয়েছে। রেনেলের মানচিত্র অনুসারে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের উত্তর গাত্র বেয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ

করেছে দক্ষিণে। অর্থাৎ গঙ্গা হিমালয়ের উত্তর গাত্র বেয়ে উঠে হিমালয়ের অপর প্রান্তে দক্ষিণ ঢাল দিয়ে অবতরণ করেছে। গঙ্গার গতিপথের এই বিচিত্র রেখা অঙ্কিত করেছিলেন রেনেল। রেনেল হয়তো বলতে চেয়েছিলেন—গঙ্গার ধারা হিমালয়ের বিশাল প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ কোন গহ্বর দিয়ে অতিক্রম করে গুহা মুখ দিয়ে উৎসারিত হয়েছিল। সেই গুহামুখই গোমুখ।

মুরক্রফ্‌ট নিতি গিরিপথে পৌঁছে বুঝতে পারেন নি যে তিনি কখন হিমালয়ের বিশাল গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। মুরক্রফ্‌ট অত্যন্ত সন্ধানী পর্যবেক্ষক। তিনি সমস্ত অংশ জরিপ করবার উদ্দেশ্যে হরখুদেব পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। যোশীমঠে ধৌলীগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। সেখান থেকেই ধৌলীগঙ্গার পথ ধরে তপোবন, মালারি, সর্বশেষ নিতিগ্রাম পেরিয়ে নিতি গিরিপথের সন্নিকটে উৎসমুখ পর্যন্ত সমস্ত পথই জরিপ করেছিলেন। কিন্তু নিতি গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করবার পর মানস সরোবর পর্যন্ত পথ হয়তো তেমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। সময়ের অভাব অথবা তিব্বতে প্রবেশ ও দ্রুত ভ্রমণ সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি মানস-সরোবর সম্পূর্ণভাবে পরিক্রমা করতে পারেন নি। তবু তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মানস সরোবর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে। মুরক্রফ্‌টের প্রবন্ধ আলোচনা করেছিলেন এইচ. টি. কোলব্রুক। প্রবন্ধের সব চাইতে মূল্যবান অংশ যা রেনেলের মানচিত্রে এতকাল ধরে অনড় হয়েছিল, সেই তথ্য ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল।

মিস্টার কোলব্রুক আলোচনার শুরুতেই বলেছিলেন আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সোসাইটির সম্মুখে আমাদের একজন সতীর্থ মিস্টার মুরক্রফ্‌টের লিখিত জার্নালের সারাংশ পেশ করছি। এই জার্নালে মানস-সরোবর সম্পর্কে তথ্য। যেখান থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে বলে প্রচলিত তথ্য মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে, সে সব সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন মুরক্রফ্‌ট। কোলব্রুক লিখেছিলেন "He has brought an interesting accession of knowledge of a country never before explored and has ascertained the existence and approximately determined the situation of Manasarovar verifying at the same time the fact that it gives origin neither to the Ganges nor to any other of the rivers reputed to flow from it."

তিনিই এমন একটি দেশ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক জ্ঞান সংযোজন করে—

ছিলেন, যে দেশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কেউই সমীক্ষা পরিচালনা করেন নি। তিনিই মানস-সরোবরের অস্তিত্ব অবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনিই প্রমাণ করেছিলেন যে সেখান থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয় না, অথবা অপর কোন নদীও উৎসারিত হয় না। মুরক্রফ্‌ট মানস-সরোবরের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সামান্য সময়ের জন্য। পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এই সরোবর থেকে কোন ধারাই বহির্গত হয় না। মুরক্রফ্‌ট অল্প সময়ের জন্য মানস-সরোবর দর্শন করতে পেরেছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে সরোবরের পূর্ণ পরিক্রমা সম্ভব হয় নি।

ভূগোল বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্নেল কোলব্রুক ১৮০৩ সনে কলকাতায় সার্ভেয়র জেনারেলের পদে যোগদান করেছিলেন। ১৮১০ সনে কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সংক্ষিপ্ত সাত বৎসর কর্মজীবনের মধ্যেই গঙ্গার জরিপ কার্যের উদ্দেশ্য প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করেছিলেন। ভারতবর্ষের এমন এক বিস্ময়কর নদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে দেয় নি। তবু তাঁর সেই স্বল্পকালীন কর্মজীবনে অক্লান্ত শ্রমের সাক্ষস্বরূপ তাঁর অংকিত একটি মানচিত্র আজও জিওগ্র্যাফিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের (ভারতীয়) দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। অবশ্য তাঁর নির্দেশিত ওয়েব ও র‍্যাপারের অভিযান তাঁর স্বপ্নের সামান্যতম অংশ বাস্তবায়িত হবার আভাস তিনি মৃত্যুর সামান্য কাল পূর্বে দেখতে পেয়েছিলেন।

ওয়েব ও র‍্যাপারের অভিযানের বিবরণ গঙ্গার ধারা জরিপ কার্যের মাত্র সাধারণ পদক্ষেপ। এর ফলে ভূগোল বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অংশের গুরুতর সমস্যার সমাধান হয় নি। অমীমাংসিত সমস্যা তখন সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্নেল উড ১৭৯৫ সনে ইরাবতী নদী জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যার জেমস্‌ ক্রেইগ্‌ K. B. এর নির্দেশ অনুসারে উড ১৮০০ সনে হরিদ্বার থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথ জরিপ করেছিলেন। তাঁরও পূর্বে কর্নেল হার্ডউইক ১৭৯৬ সনে হরিদ্বার থেকে ১৮০৮ সন পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে গঙ্গার ধারা হরিদ্বার থেকে এলাহাবাদ ও হরিদ্বার থেকে ভাটোয়ারী ও বদ্রীনাথ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এই বারো বৎসর সময়ের ব্যবধানে হিমালয়ে প্রবাহিত গঙ্গার দুটি ধারা ভাগীরথী ও অলকানন্দার গতিপথ, ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কার্যও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু নদীর উৎস সম্পর্কে জরিপ-

কারীগণ যেসব বিবরণ পেশ করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিল জনশ্রুতি ও অনুমানের ওপরে নির্ভর করে।

উইলিয়ম মুরক্রফ্‌ট কিন্তু জরিপ কার্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ছেড়ে আসেন নি। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন না পেয়ে মুরক্রফ্‌ট আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে এসেছিলেন যোশীমঠ। সেখান থেকে ধৌলী-গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে পৌঁছেছিলেন তিব্বতে। সেখানে পৌঁছে মানস-সরোবর পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন…সে তথ্য গঙ্গার উৎস সম্পর্কে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছিল। মানস-সরোবর থেকে কোন জলধারা প্রবাহিত হতে দেখেন নি মুরক্রফ্‌ট। গঙ্গা যে মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে...দীর্ঘ অতীতের এ তথ্য ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। উইলিয়ম মুরক্রফ্‌ট মানস-সরোবর পরিক্রমা করতে পারেন নি, তাই তাঁর সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি মানস-সরোবরের ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে মানস-সরোবর থেকে কোন জলধারা বহির্গত হতে পারে না। মানস সরোবরের সন্নিকটে আরো একটি হ্রদ রয়েছে। তার নাম রাক্ষসতাল বা রাবণ হ্রদ। মুরক্রফ্‌টের মানসসরোবর ভ্রমণের বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে এইচ. টি. কোলব্রুক বলেছিলেন—In his Map of India date 1788, Rennell the Surveyor General showed corrcetly that there were two lakes as draining into the river Ganges. Geographers were therefore, astonished when Moorcroft discovered that these lakes had no connection with the Ganges.

Asiatic Researches, Vol XX II. 1818.

১৭৮৮ সনের ভারতের মানচিত্রে সার্ভেয়র জেনারেল রেনেল নিশ্চিত-ভাবে চিহ্নিত করেছেন যে একটি নদী দুটি হ্রদের দ্বারা যুক্ত। কিন্তু রেনেলের মানচিত্র চিহ্নিত করেছে যে ঐ দুইটি হ্রদ থেকেই গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে। ভূগোল বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিস্মিত হয়েছিলেন যখন মুরক্রফ্‌ট আবিষ্কার করেছিলেন যে ঐ হ্রদ দুটির সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগাযোগ নেই।

১৮৪৬ সনে হেনরী স্ট্র্যাচে মানস-সরোবর পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি পরিক্রমার সময় সে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ বেশ ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মানসসরোবর পরিক্রমার সময় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানস-সরোবর থেকে একশ ফুট প্রশস্ত ও তিন ফুট গভীর একটি জলধারা নির্গত হয়ে পার্শ্ববর্তী রাবণ-হ্রদে পতিত

হয়েছে। স্ট্র্যাচে অবশ্য অন্য কোন জলধারা দেখতে পাননি। তিনি সাটলেজ নদীর ধারা লক্ষ্য করেছিলেন, মানস-সরোবর থেকে কোন ধারা এসে সাটলেজে যুক্ত হয়নি। স্ট্র্যাচে সেইবারই প্রথম হ্রদ দুটির জলের লবণাক্ততা পরীক্ষা করেছিলেন। কারণ তাঁর বক্তব্য—হ্রদ দুটির জল যদি লবণাক্ত হয়, তাহলে হ্রদের জল থেকে কোন ধারা বা নদী উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। হ্রদের জল যদি লবণশূন্য হয় তাহলে সেই হ্রদের সঙ্গে কোন না কোন নদী উৎসারিত হবে। মানস-সরোবরের জল পরীক্ষান্তে দেখা গিয়েছিল—জলের লবণাক্ততা নাই। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ জল। এর পরীক্ষার ফলে তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মানস-সরোবর থেকে কোন না কোন ধারা প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক।

১৯০৪ সনে সার্ভের্য়র জেনারেল কর্নেল রাইডর গিয়েছিলেন মানস-সরোবর অঞ্চলে জরিপ করবার উদ্দেশ্যে। মানস-সরোবর পরিক্রমা করে সেখানকার পাশ্ববর্তী অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে একটি সুন্দর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। মানচিত্রে মানস-সরোবর ও রাবণ-হ্রদকে একটি নদীর দ্বারা যুক্ত দেখানো হয়েছে। রাইডর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নদীটির গতি প্রকৃতি। নদীটির নাম শুনেছিলেন গঙ্গা চ্যু। তিব্বতীয় ভাষায় চ্যু শব্দটির অর্থ নদী। সে ক্ষেত্রে গঙ্গা চ্যুর অর্থ গঙ্গা নদী। ১৯০৭ সনে প্রখ্যাত অভিযাত্রী স্বেন হেডিন মানস-সরোবর অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি মানস-সরোবর ও রাবণ হ্রদ দ্বারা যুক্ত জলধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হেডিন এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে মানস-সরোবরের জল বর্ষায় স্ফীত হয়ে প্রবাহিত হয় গঙ্গা চ্যু। এই ধারা মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয়ে রাবণ-হ্রদে পতিত হয়। অন্য এই জলধারা শুকিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মুরক্রফট্ যে সময়ে এসেছিলেন মানস-সরোবরে, সেই সময়ে জলধারা হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিল। হেডিন অবশ্য গঙ্গা চ্যুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বইয়ে লিখেছেন।

১৯২৮ সনে স্বামী প্রণবানন্দজী মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সন পর্যন্ত বিভিন্ন গিরিপথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন মানস-সরোবরে। এই অঞ্চলে তিনি একাদিক্রমে ষোল মাস অবস্থান করে মানস-সরোবর ও রাক্ষস তাল সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সবশুদ্ধ ছেচল্লিশবার গঙ্গা চ্যু অতিক্রম করেছিলেন। গঙ্গা চ্যুর দৈর্ঘ্য ছয় মাইল। প্রশস্ত একশো ফুট, গভীরতা চল্লিশ ইঞ্চির মতো। স্বামী প্রাণবানন্দজীর ধারণা, সুদূর অতীতে মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ সরোবরের সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে ভূ-প্রকৃতির

ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে দুইটি হ্রদ পৃথক হয়েছিল। রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদের উচ্চতা ১৪৮৫০ ফুট, মানস-সরোবরের উচ্চতা ১৪৯০০ ফুট। তাই মানস-সরোবরে জলস্ফীতি দেখা দিলে সেখান থেকে জলধারা নির্গত হয়ে পার্শ্ববর্তী রাক্ষসতালে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। গঙ্গা চুর ধারা গ্রীষ্মে অন্তর্হিত হয়।

তিব্বতীয় উপত্যকায় গঙ্গা চু সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাক্ষসতালে রাক্ষসগণ অবস্থান করে। তাই সেই হ্রদের জল অপবিত্র ও ব্যবহারের অনুপযোগী। মানস-সরোবরে দুটি সোনার মাছ বসবাস করতো। মাছ দুটি মাঝে মাঝে পরস্পর যুদ্ধ করতে করতে একবার রাক্ষসতালে প্রবেশ করায় সেই হ্রদের জল পবিত্র ও পানযোগ্য হয়েছিল। তিব্বতীয় কাহিনীতে কিন্তু গঙ্গা চুর নামকরণ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। গঙ্গা চুর গতিপথ ছয় মাইল। গতিপথের স্হানে স্হানে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। সেই সব প্রস্রবণের জলের তাপমাত্রা ১২৫° ফারেনহাইট, ১৩৫° ফারেনহাইট ও ১৭০° ফারেনহাইট। প্রস্রবণ থেকে নিঃসারিত ধারা গঙ্গা চুতে পতিত হলেও কিন্তু ধারা সারা বৎসরই অব্যাহত থাকে না। গঙ্গা চুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর রেনেলের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন বলা যায় না।

পুরনো তথ্য অনুসারে তিয়েনফেনথালার গঙ্গা চু সম্পর্কে জানতেন। এই নদী সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন হিন্দুতীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে। মানস-সরোবর থেকে এই ধারা উৎসারিত হয়েছিল সুদূর অতীত থেকেই। এই ধারার সঙ্গে গঙ্গার ধারা যুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন হিন্দু তীর্থযাত্রীরা। এ ধরনের বিশ্বাস তিব্বতে প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই।

গঙ্গা চুকে গঙ্গা বলে ভুল করে প্রচার করার যৌক্তিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। মানস সরোবর থেকে নির্গত ধারার নাম গঙ্গা চুই বা হল কেন? প্রাচীন কালের তীর্থযাত্রীরা যদি এই ধারাকে গঙ্গা নদী বলে প্রচার করতেন, সেক্ষেত্রে গঙ্গা চু না বলে গঙ্গা বলেই প্রচারিত হত। এ সম্পর্কে স্বেন হেডিন বলেছিলেন যে—প্রখ্যাত অভিযাত্রী ও ভূগোলতত্ত্ব-বিদগণ এই ধরনের ভুল করে আসছেন। অবশ্য এ ধরনের ভুলের প্রচার হওয়ার কারণ রয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই এই ভুল প্রচারিত হয়ে এসেছে। তার পরেও বহু অভিজ্ঞ, গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ভারতীয় হিন্দুগণের বিশ্বাস গঙ্গা চু ও গঙ্গানদী এক। যেমন সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযু মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে, ঠিক তেমনি গঙ্গাও উৎসারিত হয়েছে মানস-সরোবর থেকে। স্বেন হেডিন অবশ্য বিশ্বাস করেছিলেন—

গঙ্গার সঙ্গে গঙ্গা ছুর কোন যোগাযোগ নেই।

ক্যাপ্টেন এফ্ উইলফোর্ড অবশ্য এই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে তিব্বতীয় ভাষায় লেখা পবিত্র নদীর সম্পর্কে পাঠোদ্ধার করেছিলেন। উইলফোর্ড লিখেছিলেন—The four sacred rivers, springing for the Manas-Sarovara according to the devines of Tibet, are the Brahma-Putra, the Ganges, the Indus and the Sita. The Ganges is the only one that really issues from that lake and if the three others do, it must be through subterranean channels ; and such communications, wheather real or imaginary are very common in the Purans.

(স্বেন হেডিনের বিখ্যাত বই—Trans-Himalaya Vol. III P. 209, এ উইলফোর্ডের উদ্ধৃতি।) পবিত্র তিব্বতের পুঁথি অনুসারে চারটি পবিত্র নদী মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেই নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু ও সীতা। এ সবের মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র সেই হ্রদ থেকে নিঃসারিত হয়েছে। অপর তিনটি নদী অন্তঃশীলা। এই তথ্য, সত্যই হোক অথবা কাল্পনিকই হোক, পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে।

স্বেন হেডিন তাঁর বিখ্যাত বই—Southern Tibet Vol. I. P. 127. এ লিখেছেন—There are to be found rocks or mountains with faces resembling an elephant, a garuda, a horse, a lion and from them rise the following rivers—Ganga, Sindhu, Pakshu and Sita.

সেখানে কতগুলি পাথর বা পর্বত রয়েছে তাদের একটা দিকের সঙ্গে হাতী, গরুড়, ঘোড়া ও সিংহের মুখের আদল রয়েছে। সেই সব মুখ থেকেই উৎসারিত হয়েছে বিখ্যাত নদীগুলি—গঙ্গা, সিন্ধু পক্ষু ও সীতা। তিব্বতের কৈলাস পুরাণে যার নাম কাঙ্ড়ি করচ্ছকে এই ধরনের বক্তব্যই দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানে শুধু গরুড়ের পরিবর্তে ময়ূর পাখীর কথা লেখা আছে। শরৎচন্দ্র দাস লিখেছেন—

The four great rivers, Ganga, Lohita, Pakshu and Sindhu are described as issuing from rocks having the appearance respectively of an elephant, an eagle, a horse and a lion.

বিখ্যাত চারটি নদী গঙ্গা, লোহিত, পক্ষু ও সিন্ধু পাথরের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। সেই পাথরের সঙ্গে হাতী, ঈগল, ঘোড়া ও সিংহের মুখের আদল রয়েছে। পালি ভাষায় পণ্ডিত বুদ্ধ ঘোষ বলেছেন.

—মানস-সরোবরের চারপাশে কৈলাস কূট, চিত্র কূট ও হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালা থেকে নির্গত চারটি ধারার পরিচয়—সিংহ মুখ, হস্তীমুখ, অশ্বমুখ ও উষ্ভ বা বৃষভ মুখ। উইলফোর্ড থেকে শুরু করে স্বেন হেডিন, তিব্বতীয় প্রাচীন পুঁথি থেকে গঙ্গা সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন—সেসব তথ্য ভারতীয় পুরাণগুলো লিপিবদ্ধ তথ্যের অনুরূপ। এইসব তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিব্বতের এই সব তথ্য কি পুরাণ থেকেই প্রচারিত হয়েছে ভারতবর্ষ পেরিয়ে? যদি ভারতীয় পুরাণ থেকে আহরিত এই সব তথ্য সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের সাহায্যে তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে, তাহলে তিব্বতের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ সুদূর অতীতের পুরাণকার জানতেন। কারণ, পুরাণের ভূগোল আজো বিস্ময়কর বলে মনে হয়। পৌরাণিক ভূগোলের অনেক তথ্যই আজ বর্তমান কালের ভূগোল তত্ত্ববিদদের অজ্ঞাত নয়।

স্বামী প্রণবানন্দজী দীর্ঘকাল তিব্বতে কৈলাস মানস-সরোবর অঞ্চলে অবস্থান করে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পর। স্বামীজী বলেছেন—গঙ্গা, সিন্ধু, পক্ষু বা ভক্ষু, সীতা—নদীগুলির নাম ভারতীয়। কাঙড়ি করচ্ছকে এই নদীগুলিকে 'লাঙচেন খাম্বাব, মাপ্চা খাম্বাব, তামচক খাম্বাব, ও সেনগে খাম্বাব' এই সব নামের অর্থ মনে করা যেতে পারে সাটলেজ বা শতদ্রু, সিন্ধু বা কার্ণালী বা সরয়ূর একটি মুখ্য ধারা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। হরিদ্বারের নদীর নাম চোমো গঙ্গা বা ছেমো গঙ্গা বা ছেম্বো গঙ্গা। তিব্বতীয় ভাষায় চেমো শব্দের অর্থ সন্ন্যাসিনী। ছেমো বা ছেম্বো শব্দের অর্থ বড়। সুতরাং চেমো গঙ্গার অর্থ গঙ্গা মাঈ বা গঙ্গা মাতা। ছেমো বা ছেম্বো গঙ্গার অর্থ বড় গঙ্গা, যাকে শতদ্রু বলে মনে করা হত। সাটলেজ বা শতদ্রু মানস-সরোবরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নির্গত হয়ে তিব্বতের পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে। সেখানে সেই নদী বুদ্ধগয়ার উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতিত হয়েছে পূর্ব সাগরে। কাঙুরি করচ্ছকে নদীর এই দীর্ঘ গতিপথ লক্ষ্য করে গঙ্গা চু এবং পরে লাঙচেন খাম্বাবের প্রবাহকে হরিদ্বারের গঙ্গা বলে মনে করা হয়েছে। স্বামীজী মনে করেন এই ভুল তথ্যকে যথার্থ মনে করে গঙ্গা চু—যে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ও যে গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে, এই প্রাচীন প্রচলিত তথ্যেই প্রচারিত হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় গঙ্গাকে কাঙুড়ি করচ্ছকের লাঙুচেন খাম্বাব বলে মনে করা হয়েছে।

এই ভুল তথ্যের প্রচার হবার ফলে তিব্বতীয়রা হরিদ্বারের গঙ্গা আর গঙ্গা চ্যু-র গঙ্গা এক ধারা বলে বিশ্বাস করেছিল। স্বামীজীর গঙ্গা চ্যু সম্পর্কে আলোচনায় অবশ্য মানস-সরোবর ও রাবণ হ্রদকে যুক্ত ছয় মাইল দীর্ঘ নদীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভূগোল বিজ্ঞানীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। সুদূর অতীত যুগ থেকেই হিন্দু তীর্থযাত্রীদের প্রলুব্ধ করেছে মানস-সরোবর। পুরাণ অনুসারে ঋষি মারীচ ও বশিষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন মানস-সরোবরের তীরে অবস্থান করে। রাবণ রাজা এই হ্রদের তীরে তপস্যা করেছিলেন মহেশ্বরকে তুষ্ট করবার জন্য। সম্ভবতঃ যে হ্রদের তীরে তপস্যা করেছিলেন, মানস-সরোবরের সন্নিকটে সেই হ্রদটির নাম হয়েছিল রাবণ হ্রদ। ঋষি দত্তাত্রেয়, ব্যাসদেব মানস-সরোবরের তীরে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীও এসেছিলেন মানস-সরোবরের তীর্থে মহাভারতের যুগে। রামায়ণেও মানস-সরোবরের কথা উল্লেখ করা রয়েছে।

১৭৭০ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে পুরণগিরি বোগেলের সংগে গিয়েছিলেন মানস-সরোবরে। পুরণগিরির বিবরণ অনুসারে গঙ্গা কৈলাস পর্বতের পাদদেশ থেকে নির্গত হয়েছে। এই ধারা এসে পতিত হয়েছে মানস-সরোবরে। ১৭৭০ সন থেকে ১৭৮০ সনের মধ্যে ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী পুরণপুরী বোখারা সমরখন্দ, চীন, লাসা পরিভ্রমণ সম্পন্ন করে এসেছিলেন মানস-সরোবর পরিক্রমায়। তিনি ছয় দিনে মানস-সরোবর পরিক্রমা করেছিলেন। পুরণপুরীর বিবৃতি অনুসারে গঙ্গা, কৈলাস পর্বতের পাদদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পুরণপুরীর ভ্রমণ বিবরণ অবশ্য এশিয়াটিক রিসার্চে Vol. V এ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৮০ সন থেকে শুরু করে ১৮১০ সন পর্যন্ত এই ত্রিশ বৎসরে বহু ভারতীয় তীর্থ-যাত্রী, সন্ন্যাসীরা মানস-সরোবর পরিক্রমা করেছেন। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত মানস-সরোবরের কথা—লোক গাথা বা প্রচলিত কাহিনী নয়। উইলিয়ম মুরক্রফ্‌টের মানস-সরোবর ভ্রমণ বিবরণের আলোচনা প্রসঙ্গে এইচ্. টি. কোলব্রুক লিখেছিলেন—"he has ascertained the existence and approximately determined the situation of Manasarovara"। মানস-সরোবর যেমন আজো আছে, তেমনি সুদূর অতীতেও ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে তার স্বাক্ষর রয়েছে। যে সব বিদগ্ধ পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদগণ এইসব প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত ভৌগোলিক পরিচয়, অবস্থান ও পরিবেশ অস্বীকার করে

সেগুলোকে ধর্মান্ধ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বানানো কাহিনী বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তার সবগুলোই যে কাহিনী নয়, বর্তমানে সে সব তথ্যের অনেকগুলোর অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে চলেছে। যেগুলো আজো কাহিনী—সেগুলো আবিষ্কারের যোগসূত্র আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অতীত যুগের অনেক প্রাচীন নগর. অনেক জনপদের ভৌগোলিক পরিচয় যা প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সেই প্রাচীন নিদর্শন পুনরুদ্ধার করেছেন। সেই সব প্রাচীন নিদর্শন, সে যুগের সভ্য মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু অতীত যুগের ভৌগোলিক পরিচয়, পরিবেশ, সব মানুষের সৃষ্ট নয়, যা প্রাকৃতিক, সেই সব পাহাড়, পর্বত, হিমবাহ, হ্রদ, উপত্যকা, নদী ভূ-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে। সেগুলোর প্রাচীন স্বাক্ষর পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য। বিশেষ করে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট হ্রদ, নদী, হিমবাহ, উপত্যকা। অতীতের প্রাচীন গ্রন্থে যেমন অনেক বর্ণনা ও ভৌগোলিক অবস্থান লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে কালের কবলে এইসব ভৌগোলিক পরিবেশের অস্তিত্ব না দেখতে পেয়ে সেগুলোকে এক কথায় অস্বীকার করা চলে না। সুদূর অতীতে অনেক নদীর বারবার গতি পরিবর্তিত হয়েছে, অনেক নদীর নামও পরিবর্তিত হয়ে নতুন নামের পরিচয় বহন করে রয়েছে। অনেক হ্রদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কাল যেন সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটায়, কালের বিবর্তনও ঘটায়, কালের বিবর্তনও তাই বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত। তাই সুদূর অতীত কালকে বর্তমানের কষ্টি-পাথরে যাচাই করা সম্ভব নয়।

বেদে মানস-সরোবরের উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতার আলো মানস-সরোবরে হয়তো পেঁছিতে পারেনি। অবশ্য সিন্ধুর উৎপত্তিস্থল নিয়ে সে যুগের মানুষ তেমন করে ভাবতে শুরু করলে ভূগোল বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হত। গাঙ্গেয় সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের ফলে গঙ্গার উৎস, গতিপথ প্রাচীন যুগের তীর্থযাত্রীদের কাছে পরিচিত হয়েছিল। গঙ্গা বৈদিক যুগের পূর্ব থেকেই হয়তো প্রচলিত ছিল। যেমন—বৃত্রাসুর, দধীচি, দধীচির অস্থি নির্মিত বজ্র, ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। পুরাণে অবশ্য বৃত্রাসুর বধের কাহিনী লেখা আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টাগণ এসব কাহিনী জানতেন। ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ থাকলেও ভগীরথের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু জাহ্নবীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। জাহ্নবী নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে যে কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে, সে কাহিনী রামায়ণের : গঙ্গার অস্তিত্বও যেমন

সত্য, তেমনি তার উৎসও। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। গঙ্গার উৎস ও গতিপথ রামায়ণে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে কাহিনীতে ভৌগোলিক তথ্য সন্ধান করলে দেখা যায়—গঙ্গার উৎসস্থান মানস-সরোবর নয়। গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে বিন্দু সরোবর থেকে। রামায়ণে মানস-সরোবরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিন্দু সরোবরও পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানেই মহারাজা ভগীরথ তপস্যার দ্বারা গঙ্গার দর্শন পেয়েছিলেন। বিন্দু সরোবর ও মানস-সরোবর দুটির পৃথক অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতের বন পর্বে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বদরিকা আশ্রম দর্শন লাভের পর মানস-সরোবর ও বিন্দু সরোবরে গিয়েছিলেন তীর্থ মানসে। বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে বিন্দু সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে গঙ্গার উৎসকে মানস-সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে প্রাচীন তথ্য রামায়ণ মহাভারতে নিহিত আছে। পরবর্তী কালে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারতকে অনুসরণ করেছে।

বর্তমান কালের ভূগোল তত্ত্ববিদগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর নয়। মানস-সরোবর অঞ্চলে বিন্দু সরোবর নামে কোন হ্রদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রীরা মানস-সরোবর ও বিন্দু সরোবরে গিয়েছিলেন তীর্থ যাত্রায়। সেখানে তাঁরা গঙ্গার দর্শন পেয়েছেন, সেই হারিয়ে যাওয়া যুগের আবিষ্কার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতো।

এইচ. টি. কোলব্রুক ওয়েব ও র‍্যাপারের অভিযানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—An actual survey of Ganges above Hardwar to the furthest point to which it had been traced by Hiudu pilgrims…

॥ ১২ ॥

পারাবার বিহারিণী গঙ্গে

আমি নদীকে ভালোবেসেছিলাম ছোটবেলা থেকেই। আমার বাড়ির সামনেই মাঠ পেরুতেই নদী। ঘরে জানলার ধারে বসে বসেই দেখতে

পেতাম সেই বিশাল জলধারা। বর্ষায় সেই জলধারা ফুলে ফেঁপে সমস্ত মাঠ ঘাট ডুবিয়ে দিতো কূল ছাপিয়ে উঠে। তাতেও সে তুষ্ট হতো না। একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই দেখতাম, সেই জলরাশি যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে হাজির হয়েছে ঘরের আঙিনায়। ঘরের জানলার সামনে বসে বসে জলের এই অদ্ভুত খেলা দেখতাম। বিস্তীর্ণ জলধারা যেন কল কল ছল ছল শব্দে ধীর পদক্ষেপে বয়ে যেতো। মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম—এই বিশাল জলধারার নাম ব্রহ্মপুত্র। ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র এই জলধারা। কেন জানি না, এই জলধারাকেই গঙ্গা বলে ভাবতে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। অবশ্য মা বলতেন—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মানস-সরোবর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

মানস-সরোবর দর্শন আমার হয়নি। যাঁরা মানস-সরোবর দর্শন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে নানা কাহিনী শুনেছি। তাঁরা তীর্থযাত্রী, অভিযাত্রী নন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উৎস সম্পর্কে কোন কাহিনী শুনিনি তাঁদের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে ভূগোল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থান মানস-সরোবর নয়। গঙ্গাও মানস-সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়নি। মা অবশ্য ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনিও হয়তো এমনই কারো কাছ থেকে শুনেছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, বায়ু, পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে গঙ্গার উৎস বলা হয়েছে বিন্দু সরোবর। কোন কোন পুরাণে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিল সুদূর প্রাচীন যুগে। রামায়ণের যুগ থেকে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণের যুগ পর্যন্ত কালের হিসেব অনুসারে দেখা যায় বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব তখনো ছিল। অর্থাৎ গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্য অপরিবর্তিত ছিল। পরবর্তীকালে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর বলে উল্লিখিত হয়েছে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্যের পরিবর্তন বর্তমান কালের ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় হতে পারে। কালের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এই সব যোগসূত্র যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তা জানা যায় না। কিন্তু সুদূর অতীত যুগের বিন্দু সরোবর ও মানস-সরোবর উভয় পবিত্র স্থানেই তীর্থযাত্রীরা যেতেন তীর্থ দর্শন মানসে। কালের প্রভাবে হয়তো বা বিন্দু সরোবরের অস্তিত্ব প্রাচীনকালের ভূগোল থেকে মুছে গিয়েছে। কিন্তু মানস-সরোবর বর্তমান যুগের ভূগোলে ভাস্বর।

মানস-সরোবর থেকে নির্গত জলধারা গরুর মুখাকৃতি বিশিষ্ট গুহা থেকে নিঃসারিত হয়ে অবতরণ করেছে মর্ত্যলোকে। রেনেলের মানচিত্রে

গঙ্গার উৎস ও গতিপথের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল। রেনেল মানস-সরোবর দর্শন করেন নি। গঙ্গার পূর্ণ গতিপথও পর্যবেক্ষণ করেননি। মুরক্রফ্ট মানস-সরোবর দর্শন করেছিলেন। মানস-সরোবর পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয় না। মুরক্রফ্ট অবশ্য গঙ্গার গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি। গরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট গুহা, যার প্রচলিত নাম গোমুখ, সেই গোমুখ থেকে গঙ্গার জলধারা নির্গত হয়েছে, এ তথ্যের সততা যাচাই করা হয়নি।

১৮০৮ সনে ওয়েব, র‍্যাপার ও হিয়ারসে গঙ্গোত্রী গোমুখ পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাটোয়ারী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। দুর্গম পথ ও প্রতিকূল পরিবেশ বলে তাঁদের পক্ষে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওয়েব, গোমুখ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, এশিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশিত প্রবন্ধ সত্যই বিস্ময়কর। ওয়েব গোমুখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই নাম শুধুমাত্র হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মনের মধ্যে গাঁথা আছে। এই নামের উল্লেখ রয়েছে হিন্দুদের পুরাণ গ্রন্থে। ১৮১৬ পর্যন্ত কোন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী গোমুখ ভ্রমণ করেননি বলেই হয়তো ওয়েবের বক্তব্য অসার প্রমাণিত হয়নি। ওয়েবের এই অদ্ভুত বিবরণের স্বপক্ষে এইচ্. টি. কোলব্রুক আলোচনা প্রসঙ্গে গঙ্গোত্রীতে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারাকে অত্যন্ত ক্ষীণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—এই ক্ষীণ ও সাধারণ ধারা কোন নিকটস্থ পাহাড়ের গা থেকে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ এই ক্ষীণ ধারা যদি ভাগীরথীর হয়ে থাকে, তাহলে একে গঙ্গার উৎস বলা সন্দেহের কারণ। ভাগীরথীর উৎসস্থান গোমুখ এতথ্য প্রমাণিত না হওয়ায়, গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে নির্গত হয় না, মুরক্রফ্টের এ তথ্য প্রমাণিত হওয়ার ফলে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এমনি নানা সমস্যার সমাধানকল্পে ১৮১৫ সনে লর্ড হেস্টিংস গঙ্গার জরিপকার্য সম্পন্ন করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন হজসন ও লেফ্টেন্যাণ্ট হার্বার্ট গঙ্গার জরিপের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সামরিক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, দুঃসাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। তাঁদের ওপরে দায়িত্ব ছিল পর্বতসংকুল সাটলেজ ও গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ করা ও সমস্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করে জরিপ করা। সেজন্য তাঁদের উত্তরে চীন ও তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করবার নির্দেশ ছিল।

জরিপ কার্যের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্থানটিকে নির্দেশিত করবার জন্য

একটি দেওদার গাছকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নক্ষত্র চিনে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেছিলেন তাঁরা। উচ্চ স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে বৃহস্পতি গ্রহকে লক্ষ্য করে দ্রাঘিমাংশ নিশ্চিত হয়েছিলেন। জরিপ বিভাগের কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন করলেও কিন্তু পরিপূর্ণ কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি। ১৮১৫ সন থেকে অবশ্য ক্যাপ্টেন ওয়েব কুমায়ুন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জরিপকার্য শুরু করেছিলেন। পাঁচ বৎসর ধরে ক্রমাগত কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ওয়েব অনেক দুর্গম অঞ্চলগুলোর জরিপকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। ১৮১৮ সনের মধ্যে ক্যাপ্টেন হজসন ও লেফটেন্যান্ট হার্বার্ট গাড়োয়াল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলগুলো ও সেখানকার জলধারাগুলোর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। এই জরিপ কার্যের সময় হজসন ১৮১৭ সনে সর্বপ্রথম ভাগীরথীর জলধারা অনুসরণ করে পেঁাছে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী। তারপর গঙ্গোত্রী থেকে এগিয়ে গিয়ে পেঁাছেছিলেন গোমুখ। গোমুখের ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের সামান্য অংশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর গোমুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে এশিয়াটিক রিসার্চে (VOL. XIV) ও এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে (VOL. VIII+II) প্রকাশিত হয়েছিল। গোমুখের সামনে পেঁাছেই তিনি দেখেছিলেন বিশাল তুষার ক্ষেত্রের পাদদেশের বেশ নিম্নে খিলানের মতো বরফের ভেতর থেকে ভাগীরথী বা গঙ্গা নিঃসারিত হচ্ছে। তিনি লিখেছেন—"Over debouche, the mass of snow is perfectly perpendicular and from the bed of the stream to the summit we estimate the thickness at little less than 300 feet solid frozen snow probably the accumulation of ages, it is layer of some feet thick each seemingly the remains of a full of separate year. The height of the arch of snow is only sufficient to let the stream flow under it."

ওপরে অপরিচ্ছন্ন স্তূপীকৃত বরফ যেন সম্পূর্ণ খাড়াভাবে অবস্থিত। নদীবক্ষ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার অনুমান, কমপক্ষে তিনশো ফুট পুরু দীর্ঘ বছর ধরে সঞ্চিত জমানো শক্ত বরফ, যা বছরের পর বছর ধরেই আলাদাভাবে সঞ্চিত হয়ে স্তর বিন্যাসের সৃষ্টি করেছে। বরফের খিলানের মতো সমস্ত অংশ জুড়েই নদীর জলধারা নীচ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। হজসন হিমবাহের ওপরে উঠবার পর দেখেছেন—"The vast collection of snow is about 1·50 miles in width, filling up the

whole space between the feet and the peaks to the right and left, we see its surface forward to the extent of 4 or 5 miles or more. General acclivity 7° but we pass small holes in the snow caused by its irregular subsiding a very dangerous place, the snow stuck of rubbish and rocks embedded in it."

চারপাশে, ডাইনে বাঁয়ে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলির দ্বারা বেষ্টিত বিশাল সঞ্চিত তুষার ভূমি দেড় মাইল প্রশস্ত। আমরা সামনের দিকে চার পাঁচ মাইল বা আরো বেশী দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। সাধারণ ঢাল গড়ে ৭°, কিন্তু আমরা এগুবার সময় লক্ষ্য করলাম ছোট ছোট বরফের গহ্বর। সেগুলো নানা আকৃতি বিশিষ্ট, অত্যন্ত বিপজ্জনক। বরফের ওপরে পাথর ও নোংরা গুঁড়ো পাথর আটকে রয়েছে। হজসন লক্ষ্য করেছেন—Many rents in the snow appear to have been recently made their sides shrinking and falling in ponds of water from in the bottom of this.

অনেকগুলি গহ্বর নতুন দেখা যাচ্ছে। সেগুলোর চারদিকটা সংকোচনের ফলে ও ধসে গিয়ে জলপূর্ণ কুণ্ডের মধ্যে পড়েছে।

এই জলপূর্ণ গহ্বরগুলির সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে হজসন লিখেছেন "The snow of the great bed was stuck as it were, with rocks and rubbish in such a manner as that the stones and large pieces of rocks are supported in the snow and sink as it sinks as they are at such a distance from the peaks as it preclude the idea that they could have rolled down to their present places and execpt their sharp points had been covered it appears most likely that they came down like snow balls with avalanches.

বিশাল তুষার ক্ষেত্রে পাথর ও নোংরা ধূলি মলিন কাদা, গুঁড়ি পাথর সবই যেন আটকে রয়েছে। বরফের মধ্যে এগুলো এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, যাতে মনে হয়, বড় বড় প্রস্তর খণ্ড অনেক দূরের পর্বত গাত্র থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে এসেছে। কেবলমাত্র অমসৃণ পাথরগুলো হয়তো হিমানী সম্প্রপাতের সময় বরফে গোলার মত নেমে এসেছে।

হজসন বিশাল তুষার ক্ষেত্রের মাঝখানে যেসব গহ্বর দেখেছেন, সেগুলোর সংখ্যা বা গহ্বরগুলোর গভীরতা নিরূপণ করতে পারেননি। গঙ্গার উৎস স্থানের উচ্চতা ১২৯১৪ ফুট বলে উল্লেখ করেছেন।

ঠিক সাঁইত্রিশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৪৫ সনে কর্নেল ফোর্ড মারখম্

ভাগীরথীর ধারা অনুসরণ করে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন। গঙ্গোত্রী থেকে গিয়েছিলেন গোমুখ। মারখম লিখেছেন গোমুখ সম্পর্কে—At last the great glacier of the Ganges wes reached and never can I forget my first impressions when I beheld it before me in all its savage grandeur. The glacier thickly studied with enormous loose rocks and earth is about a mile in width and extends upwards many miles towards the immense mountains covered with perpetual snow down to its base and its glittering summit piercing the very skies, rising 21000 feet above the level of the sea. The chasm in the glacier through which the sacred stream rushes forth into the light of day is named the Cow's Mouth and is held in deepest reverence by all Hindoos. The Ganges enters the world no puny stream but burst forth from its icy womb, a river of 30 to 40 yards in breadth of great depth and very rapid."

অবশেষে গঙ্গার বিশাল হিমবাহে পেঁছে গিয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে ভয়ংকর সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, এই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। হিমবাহ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, বিপুল পরিমাণ স্তূপীকৃত পাথর, কাদা মাটি এই নিয়ে মাইল খানেক প্রশস্ত, মাইলের পর মাইল দীর্ঘ হয়ে উঁচু ঢালের দিকে এগিয়ে গিয়েছে তুষারাবৃত পর্বত শিখরের উদ্দেশ্যে। সেই পর্বতগুলির পাদদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত তুষার মণ্ডিত। এই সব তুষার মণ্ডিত পর্বত শৃঙ্গগুলি যেন আকাশ ভেদ করে রয়েছে। সেইগুলির উচ্চতা সমুদ্র তল থেকে ২১০০০ ফুট। হিমবাহের মধ্যের বিশাল গুহার ভিতর থেকে পবিত্র নদী নির্গত হয়ে দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়েছে। এই গুহার নাম গোমুখ। একেই হিন্দু তীর্থযাত্রীরা শ্রদ্ধাভরে পরম পবিত্র তীর্থ বলে মনে করেন। গঙ্গা কিন্তু ছোট্ট জলধারা নিয়ে মর্ত্যে অবতরণ করেনি, বরং তুষার গর্ভ থেকে তিরিশ বা চল্লিশ গজ প্রশস্ত জলধারা বিশাল বেগে নির্গত হয়েছে। এই জলধারা গভীর ও ভীষণ খরস্রোতা।

হজসন ও মারখমের এই বিবরণের পর গোমুখ সম্পর্কে প্রাচীন যুগের তথ্য বর্তমান যুগের মানুষদের আছে রহস্যময় মনে করা অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য ভূগোল বিজ্ঞানীরা বর্তমান কালের ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের আলোয় গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। গঙ্গা বিন্দুসরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে। রামায়ণের এই প্রাচীন ভৌগোলিক

তথ্য সত্য বলে প্রমাণ করবার মতো প্রমাণ যোগ্য কোন তথ্যই উপস্থাপিত করতে পারেন নি পাশ্চাত্য ভূগোল বিজ্ঞানীগণ। মানস সরোবর থেকে নির্গত গঙ্গার ধারার সন্ধান পাননি উইলিয়ম মুরক্রফট। কিন্তু গঙ্গার উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যই উপস্থাপিত করতে পারেননি। গঙ্গার কোন ধারা হিমালয়ের ওপারে তিব্বত ভূখণ্ড থেকে উৎসারিত হয়েছে কিনা, এ তথ্যও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। মুরক্রফট নিতি গিরিপথ অতিক্রম করবার পরও ধৌলী গঙ্গার ধারা দেখেননি। বরং গিরিপথে পেঁছবার পূর্বেই নদীর উৎস দেখেছিলেন। গিরিপথ অতিক্রম করবার পর তিব্বত অঞ্চলের ওপর দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন কৈলাস পর্বত ও মানস-সরোবরের দিকে। কিন্তু ভ্রমণের সময় সেই অঞ্চল যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি। তাই ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। ১৮১৭ সনে জরিপ কার্যের পর ক্যাপ্টেন হার্বার্ট লিখেছিলেন যে—গঙ্গার মুখ্য ধারা ভাগীরথী ও অলকানন্দা হিমালয়ের ওপারে তিব্বত ভূখণ্ড থেকে উৎসারিত হয়েছে। এই জলধারা দুটি তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের গিরিশিরা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে ভারত ভূখণ্ডে। হার্বার্টের এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করেননি কেউই। এই ধারণার সত্যতা যাচাই করবার মতো কোন সঠিক তথ্য ছিল না। কারণ, এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেই অঞ্চল নিখুঁতভাবে জরিপ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে ধরনের জরিপ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উচ্চ হিমালয়ের দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান নির্ধারণ না করতে পারলে সেই অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তেও পেঁছে যাওয়া সম্ভব হয় না। কর্নেল ট্যানার এ সম্পর্কে লিখেছিলেন যে—সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ নির্ণয় করতে পূর্ববর্তী অভি-যাত্রীরা ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ ভাল মানচিত্র, জরিপের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম, অভিজ্ঞ জরিপকারী না হলে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই নানা ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। এই কার্যে ভুল হলে এক পর্বতকে অন্য পর্বত বলে চিহ্নিত হতে পারে। তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থানই ত্রুটিপূর্ণ হবে। ট্যানারের এই ধরনের মন্তব্যের ফলে সঠিক ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দ্বারা গঙ্গার ধারা জরিপ করবার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে অনুভব করা শুরু হয়েছিল।

গঙ্গার ধারা নতুন করে পর্যবেক্ষণের কথা ভাবতেই একটি প্রশ্ন আবার

মনে জেগে ওঠে। আবার ভাবতে হয়—গঙ্গার উৎস কোথায়? সুদূর অতীত যুগের পবিত্র জলপ্রবাহ যেন সর্বকালের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছে। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেছিল। এ বিশ্বাস সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীদের। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গার জলরাশি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল মর্ত্যলোকে। সমস্ত ধারার সম্মিলিত জলরাশিই পবিত্র গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে মুখ্য ধারা প্রবাহিত হয়েছে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের ভেতর দিয়ে। গাড়োয়ালে প্রবাহিত মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে ভাগীরথী অন্যতম। ভাগীরথীর উৎপত্তি স্হান গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে বরফের গুহা থেকে নির্গত হয়েছে এই জলধারা। গোমুখের উচ্চতা প্রায় ১৩000 ফুট। হজসন গোমুখের উচ্চতা নির্ণয় করেছিলেন ১২৯১৪ ফুট। অবশ্য পরবর্তী কালে উচ্চতা ১২৭৭০ ফুট বলে চিহ্নিত হয়েছে। কেদারনাথ পর্বতের ঠিক পেছন দিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা! লেফটেন্যাণ্ট হার্বার্ট ১৮১৭ সনে হজসনের সঙ্গে গোমুখ এসেছিলেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখে চারটি উচ্চ তুষার মণ্ডিত পর্বত শিখর দেখে মুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেছিলেন সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু, সেণ্ট প্যাট্রিক ও সেণ্ট ডেভিড। অবশ্য এই নামগুলো ভারতীয় জরিপ বিভাগ গ্রহণ করেনি। এই পর্বত শিখরগুলোর এই ধরনের নামকরণের কোন উদ্দেশ্য জানা যায়নি। পরে অবশ্য হজসন ও হার্বার্ট এই পর্বত শিখর-গুলোকে সতোপন্থ পর্বত মালার অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করেন। সর্বশেষে এই পর্বত শিখরগুলোর চারটির তিনটি ভাগীরথী পর্বত মালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্গ বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এই পর্বত শিখরগুলো সুদূর প্রাচীন যুগ থেকে তীর্থযাত্রীদের কাছে পরিচিত। এই নামগুলো গঙ্গোত্রী অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা এই পর্বতগুলো ভাগীরথী পর্বত-মালা বলে জানতো। চতুর্থ শিখরটি সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ পর্বত। ১৯৩৩ সনে প্রখ্যাত পর্বত অভিযাত্রী ভাগীরথী পর্বতমালাকে সেণ্ট্রাল সতোপন্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। গঙ্গোত্রী মন্দির থেকে গোমুখের দূরত্ব ১৮ মাইল ছিল। বদ্রীনাথ মন্দির থেকে বদ্রীনাথ পর্বত শিখরের দূরত্ব ১০ মাইল।

জাড্ গঙ্গা বা জাহ্নবী-গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে আসা প্রধান শাখা। এই ধারা গঙ্গোত্রী মন্দিরের সাত মাইল উৎরাইয়ের পথে ভৈরব ঘাটিতে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চার মাইল পশ্চিমে শ্রীকান্ত পর্বত ও সাত মাইল পূর্বে বন্দর পুঞ্চ পর্বতের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে হিমালয়

পব তমালার উচ্চ গিরিশিরার ভেতর দিয়ে গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করে এই সম্মিলিত জলধারা প্রবাহিত হয়েছে। ঝালা থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ভাগীরথীর অপরূপ গিরিখাত, মধ্য হিমালয়ের সব চাইতে বিখ্যাত গিরিখাত। এই গিরিখাত অপরূপ। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ গ্রীসব্যাচ্ লিখেছেন—One of most remarkable in the central Himalayas and for picturesqueness can hardly be surpassed by the valley in the world.

গিরিখাত সম্পর্কে লিখেছেন গ্রিস্ব্যাচ—"Its sides are often absolutely vertical smoothed down by the torrent which rushes 600 feet or more down below through a narrow slit in the rocks." (Geology of tho Central Himalaya—Gries-batch)

জাহ্নবী গঙ্গাকে ভাগীরথীর মুখ্য শাখা নদী বলা হয়। তিব্বত ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত তুষার মণ্ডিত গিরিপথ জেলুখাগা বাসাঙ চোক-লা (১৭৪১০ ফুট) জাহ্নবী গঙ্গার উৎস স্থান। এই গিরিপথ মানা হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত। এই হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে জাহ্নবী গঙ্গার নীলাভ জলধারা গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ভাগীরথীর অপর একটি শাখানদীর নাম ভীল গঙ্গা। ভীলাঙ্ উপত্যকায় অবস্থিত খাটলিঙ্ হিমবাহ থেকে (প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চতা থেকে) এই শাখানদী উৎসারিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে টিহরীতে। টিহরীতে ভীলগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্হলে কুড়ি ফুট খাড়া পাথরের গিরিখাত দর্শনীয়। টিহরী থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করে ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এমনি দুটি প্রধান শাখানদী ছাড়াও অনেকগুলো ছোট জলধারা এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দুধ গঙ্গা—ধারালী গ্রামের ওপরে শ্রীকান্ত পর্বতের (২০২১২ ফুট) পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে ধারালী গ্রামে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রুদ্র গহ্বরা গঙ্গা—রুদ্রগহরা উপত্যকায় গঙ্গোত্রী পর্বতমালার পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গোত্রী মন্দির থেকে মাইল দেড়েক নীচে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেদার গঙ্গা যোগীন পর্বত মালার পাদদেশে অবস্থিত কেদার-তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে—গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাদদেশে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সব ধারা ছাড়াও হারসিল বা হরিপ্রয়াগে শ্যাম

গঙ্গা, গঙ্গোত্রীর সন্নিকটে পাটাঙ্গনা গঙ্গা, চীরবাসার কাছে ভৃগু গঙ্গা, মাতৃ গঙ্গা, গোমুখের কাছে মেরু গঙ্গা উল্লেখযোগ্য। এই সব ধারাগুলোর উৎস স্থান উচ্চ হিমালয়ে তুষার মণ্ডিত উপত্যকা।

গাড়োয়াল হিমালয়ের গঙ্গার আর একটি মুখ্য ধারার নাম অলকানন্দা। বদ্রীনাথের উত্তরে বসুধারা পেরিয়ে গেলে ভাগীরথী খড়ক ও সতোপন্থ হিমবাহ। এই দুই হিমবাহের স্নাউট থেকে নিঃসারিত দুটি ধারার মিলনে উৎপত্তি হয়েছে অলকানন্দা। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে অলকানন্দার নামের উল্লেখ রয়েছে। অলকানন্দার উৎস স্থানের নিকটবর্তী পর্বত মালার নাম অলকাপুরী। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে এই অলকাপুরীর উল্লেখ আছে। যক্ষরাজ কুবেরের আলয় অলকাপুরী। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে অলকাপুরীর বর্ণনা রয়েছে। এই স্থান থেকে পবিত্র ধারা নিঃসারিত হয়ে অবতরণ করেছে নিম্ন উপত্যকায়। পথিমধ্যে ছোট বড় জলধারায় পুষ্ট হয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অলকানন্দার অনেকগুলো শাখা হিমালয়ের উত্তরে তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে উৎসারিত হয়েছে। যেমন ধৌলী গঙ্গা, হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত জাস্কার গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত নিতি গিরিপথের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেখান থেকে এই ধারা প্রবাহিত হয়ে যোশীমঠের পাদদেশে বিষ্ণু প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গাড়োয়াল-কুমায়ুনে প্রবাহিত গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে ধৌলী গঙ্গা উল্লেখযোগ্য। ভূগোল বিজ্ঞানীরা অবশ্য ধৌলীকে অলকানন্দার বৃহত্তম শাখানদী বলে উল্লেখ করেছেন। ধৌলী গঙ্গার জলধারা পুষ্ট করেছে ঋষি গঙ্গা ও গির্থিগঙ্গা। ঋষি গঙ্গা নন্দাদেবীর পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে রিনি গ্রামের পাদদেশে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গির্থি উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে গির্থি গঙ্গা। মালারী গ্রামের কাছে এই ধারা এসে নিতি গ্রামের কাছে ধৌলী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। এছাড়াও বসুধারা তাল থেকে নিঃসারিত ধারা এসে নিতি গ্রামের কাছে ধৌলী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। অলকানন্দার অপর একটি শাখা নদী সরস্বতী। সরস্বতী নদী মানা গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ওই হিমবাহের ওপরে রাক্ষসতাল ও দেবতাল নামে দুটি হ্রদ ছিল। এই হ্রদ দুটিকেই ভুল করে পর্তুগীজ ধর্মযাজক অ্যান্তেনিও দ্য আন্দ্রে মানস সরোবর ও রাক্ষস তাল বলে উল্লেখ করেছিলেন। সরস্বতী নদীর প্রধান শাখানদী আরোয়া নদী। আরোয়া তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে ঘাসতোলীর সন্নিকটে

সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলিত জলধারা মানাগ্রামের পাদদেশে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্হলের নাম কেশব প্রয়াগ। সরস্বতীর জলে পুষ্ট অলকানন্দা ও বদ্রীনাথের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যোশীমঠের পাদদেশে বিষ্ণু প্রয়াগে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেশব প্রয়াগ থেকে বিষ্ণু প্রয়াগ পর্যন্ত অলকানন্দার এই গতিপথে ছোট বড় কয়েকটি জলধারা মিলিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঋষি গঙ্গা বদ্রীনাথের প্রান্তে অবস্হিত নীলকণ্ঠ পর্বত শিখরের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে বদ্রীনাথে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে।

কুবের গঙ্গা—নর পর্বতের পাদদেশে অবস্হিত কুবের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই ধারা বদ্রীনাথ ও মানাগ্রামের কাছে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে।

ক্ষীর গঙ্গা—ক্ষীর উপত্যকায় অবস্হিত পানি পাতিয়া হিমবাহ থেকে উৎপন্ন এই জলধারা হনুমান চটিতে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ভুইংডার গঙ্গা—ভুইংডার উপত্যকায় অবস্হিত লোকপাল ও টিপরা খড়ক থেকে উৎপন্ন জলধারা গোবিন্দ ঘাটে অলকনন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বিষ্ণু প্রয়াগ থেকে প্রবাহিত অলকানন্দা কর্ণ প্রয়াগ পর্যন্ত অবতরণের পথে ছোট বড় শাখানদীর জলে পুষ্ট হয়েছে। সেই সব নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারা গরুড় গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা, বিরেহী গঙ্গা। বিরেহী গঙ্গার পরই মন্দাকিনী নদী।

কুমায়ুন হিমালয়ে শৈল সমুদ্র হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্দাকিনী নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। কুমায়ুন হিমালয়ের বিখ্যাত ধারা পিণ্ডারী গঙ্গা। পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে এই ধারা কুমায়ুনের সীমারেখা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে গাড়োয়ালে। গাড়োয়াল হিমালয়ে এই নদী এসে অলকানন্দায় মিলিত হয়েহে কর্ণপ্রয়াগে।

পিণ্ডারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে কাফানি গঙ্গা, সুন্দর ডুঙ্গা ও কোয়েল গঙ্গা। কাফানি হিমবাহ থেকে নির্গত হয়ে কাফানি গঙ্গা দেয়ালীর কাছে পিণ্ডারী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েহে। সুন্দর ডুঙ্গা হিমবাহ থেকে নির্গত সুন্দর ডুঙ্গা নদী খাতির পাদদেশে পিণ্ডারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কোয়েল গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে কোয়েল উপত্যকা থেকে। এই জলধারা পিণ্ডারী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে

দেবলের কাছে।

অলকানন্দার আর একটি বিখ্যাত শাখানদীর নাম মন্দাকিনী নদী। কেদারনাথ পর্বতের পাদদেশে চোরাবারি হিমবাহ থেকে সৃষ্ট চোরাবারি তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদী রুদ্রপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে। মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত জলধারাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারা মধ্য মহেশ্বর গঙ্গা, বাসুকী গঙ্গা. মান্দানী গঙ্গা ও কালী গঙ্গা।

মধ্যমহেশ্বর উপত্যকা থেকে নির্গত এই ধারা উখীমঠের পাদদেশে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেদারনাথের সন্নিকটে বাসুকীতাল থেকে উৎপন্ন জলধারা বাসুকী গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে শোন প্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মান্দানী পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন মান্দানী গঙ্গা ও কালী গঙ্গার সম্মিলিত ধারা কালী মঠের সন্নিকটে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

গাড়োয়াল কুমায়ুনে প্রবাহিত প্রধান জলধারার উৎস স্থান ছোট বড় হিমবাহ। এইসব হিমবাহের অনেকগুলিই হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এইসব হিমবাহ নিঃসৃত জল এসে গঙ্গার জলধারাকে পুষ্ট করেছে। হিমালয়ে প্রবাহিত নদীগুলির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান ধারাগুলো ছোট ছোট ধারাগুলোর জলে পুষ্ট হতে থাকে প্রথম থেকেই। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম দেবপ্রয়োগ। এই সঙ্গম স্থল গাড়োয়াল কুমায়ুন হিমালয় থেকে প্রবাহিত ছোট বড় নদীর সম্মিলিত জলরাশি। বন্দরপুঞ্ছ, কামেট, নন্দাদেবীর তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি মূলতঃ গঙ্গার জল বিভাজিকা। বদ্রীনাথ, কেদারনাথ. গঙ্গোত্রী, ত্রিশূল পর্বত শৃঙ্গগুলি মধ্যবর্তী অঞ্চল। মুসৌরী বা এই অঞ্চলের কোন উচ্চস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে গাড়োয়ালের তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণীগুলি। এই গিরি শ্রেণীর রেখা যেন দুটি স্থানে বিচ্ছিন্ন দেখা যাবে। এই দুটি বিচ্ছিন্ন স্থানটির প্রথমটি নন্দাদেবী গিরিশৃঙ্গ সমেত গিরিশিরা ও বদ্রীনাথ গিরিশৃঙ্গ সমেত গিরিশিরা। মধ্যবর্তী নিম্ন অংশ অলকানন্দার গিরিখাত। এই গিরিখাতের ভেতর দিয়েই অলকানন্দা প্রবাহিত হয়েছে। তেমনি শ্রীকান্ত পর্বত ও বন্দরপুঞ্ছ পর্বত শিখরের জন্য দ্বিতীয় বিচ্ছিন্ন গিরিশিরা ভাগীরথী নদীর গিরিখাত।

ভাগীরথীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে বৃহত্তম হিমবাহ বলা চলে। প্রাচীন

যুগের হারিয়ে যাওয়া সমস্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করবার চেষ্টা করে ভাবা যেতে পারে—গঙ্গোত্রী হিমবাহে প্রথম অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ। সুদূর অযোধ্যা থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম পথ অতিক্রম করে পেঁছেছিলেন গঙ্গার উৎসে। তিনি সমস্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান চিহ্নিত করে এসেছিলেন। ভগীরথের চিহ্নিত পথ ধরে পরবর্তী পথযাত্রী পুণ্যার্থীরা এসেছিলেন তীর্থ পরিক্রমায়। এই তীর্থ যাত্রা সুদূর অতীত যুগ থেকে অব্যাহত। সেই অতীত যুগের স্বাক্ষর আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সামনে বসে বসে বিশাল তুষার আর স্তূপীকৃত শিলারাশির দিকে তাকাতে তাকাতে ভয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি। অনন্তকাল ধরে সঞ্চিত তুষার জমে জমে কঠিন পাথরের মতো হয়ে গিয়েছে। নরম তুষার কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন এক অবিচ্ছিন্ন কঠিন বরফের ধারা দীর্ঘ ষোল মাইল পথ অতিক্রম করে এসে স্তব্ধ হয়েছে অপরূপ বরফের গুহা সৃষ্টি করে। এই বরফের গুহামুখ থেকে নিরন্তর নিঃসারিত জলধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে কত কাল থেকে, তার কোন হদিশ নেই। গোমুখে বরফের বিশাল গুহার মুখ লক্ষ্য করেছি। গুহামুখ থেকে বিশাল জলস্রোত প্রচণ্ড বেগে নির্গত হতে দেখেছি। প্রবহমান জলধারার সমস্ত অংশই গুহামুখের বরফ গলেই নির্গত বলে মনে হয় না। গুহামুখের ভেতরটা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। যেন অনেক দূর থেকে বয়ে আসা জলধারা অদ্ভুত গম্‌গম্‌ শব্দে সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহিত হয়েছে। জলধারার যে মূল উৎস কোথায়, অন্তত গোমুখ থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। অতি প্রাচীন যুগের তীর্থযাত্রীদের পরিচিত এই জলধারার নাম ভাগীরথী বা গঙ্গা। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ভাগীরথী, অলকানন্দা, জাহ্নবী নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই নামগুলোর মধ্যে ভাগীরথীর উল্লেখ প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই সব নামগুলোকে গঙ্গার বিভিন্ন নাম বলা হয়। গঙ্গা ভারতবর্ষের পবিত্র নদী। তাই এই নদীর স্তব, স্তুতি, বন্দনা উপলক্ষে নানা নামের উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসাবে গঙ্গার উৎস স্থানকে পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করাই স্বাভাবিক। এই দুর্গম তীর্থে ভ্রমণের জন্য পথ কষ্ট মৃত্যুভয় সব কিছুই তুচ্ছ করতেন তীর্থ যাত্রীরা। যুগ যুগ ধরে তীর্থ যাত্রীরা সমবেত হতেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। গোমুখের পূর্বে গঙ্গোত্রী—সেখানে মন্দির রয়েছে। এই মন্দির দর্শনের আশায় তীর্থ সমাগম হতো। গঙ্গার উৎস স্থান বলেই এই স্থান মাহাত্ম্য তীর্থ যাত্রীদের আকর্ষণ করতো।

দুর্গম হিমালয়ের সমস্ত তীর্থের মধ্যে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ তীর্থ অন্যতম। গঙ্গার অন্যান্য ধারার মধ্যে ধৌলী গঙ্গ, বিষ্ণু গঙ্গা, অলকানন্দা, জাহ্নবী, পিণ্ডারী গঙ্গার উৎস স্থান বা তার সন্নিকটে কোন মন্দির নেই। উৎস স্থানকে পবিত্র তীর্থ স্থান বলেও তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। এমন কি এই নদীগুলির উৎস স্থানও সাধারণের কাছে অপরিচিত। অলকানন্দা 'বিষ্ণু গঙ্গা' বা সরস্বতীর ধারা অনুসরণ করে পর্তুগীজ মিশনারী তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। এই ধারাগুলোকে সর্বক্ষেত্রেই গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন। হজসন গোমুখ নিঃসৃত ধারাকে গঙ্গা বলেই উল্লেখ করেছেন। মারখম ১৮৫৩ সনে গোমুখ পৌঁছেছিলেন। হজসনের পর তাঁর বিবরণই উল্লেখযোগ্য। তিনিও গোমুখ নিঃসৃত জলধারার নাম গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন। গোমুখকেই তিনি গঙ্গার উৎস বলে উল্লেখ করেছেন ভ্রমণ-বার্তায়। গঙ্গার ধারা একটি নয়, এই ইঙ্গিত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে লেখা আছে। মহারাজা ভগীরথ যে ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যভূমিতে, সেই ধারার নাম ভাগীরথী। ভাগী-রথী নামটি সুদূর অতীতেই প্রচলিত। গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান ধারা বলে মেনে নেওয়া হবে, এ নিয়ে ভূগোল-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। রেনেল ও তাঁর পূর্ববর্তী ভূগোল-তত্ত্ববিদ ও অভিযাত্রী—ভাগীরথীকেই গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। অলকানন্দা বা বিষ্ণু গঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন পর্তুগীজ ধর্মযাজক আন্দ্রে ও তাঁর পরবর্তী মিশনারী-গণ। তাঁরা গঙ্গার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেননি। তিব্বতে যাবার জন্য সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করবার জন্যই, অলকানন্দার গতি পথকে বেছে নিয়েছিলেন। এই পথ বহুল পরিচিত। প্রতি বৎসরই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী বদ্রীনাথ দর্শন করতে যান অলকানন্দার গতি পথ ধরে। দুঃসাহসী তীর্থযাত্রীরা সরস্বতী নদীর গতিপথ অনুসরণ করে যান কৈলাস মানস-সরোবরে। তিব্বতীয় ব্যবসায়ীর দল তিব্বত থেকে আসতো মানা গ্রামে সরস্বতী নদী পথ ধরে। গাড়োয়ালী, ভারত, তিব্বত সীমান্তবাসী ব্যবসায়ীরা তিব্বতে যাতায়াত করতো। অলকানন্দার ও সরস্বতীর গতিপথ তাই পরিচিত। ধৌলী গঙ্গার উৎস পেরিয়ে অবশ্য নিতি গ্রামের অধিবাসীরা তিব্বতে যাতায়াত করতো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। জাহ্নবী গঙ্গার উৎস পেরিয়ে তুলনামূলক ভাবে খুব কম লোকজনই যাতায়াত করতো তিব্বতে। মিশনারীরা মানা গিরিপথ

অতিক্রম করে তিব্বতে যাওয়া তাই সহজসাধ্য বলে জেনেছিল। গাড়োয়াল-কুমায়ুনের অধিবাসীরা গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলোকে গঙ্গা বলেই অভিহিত করে। বিদেশী ভ্রমণকারীরা ভৌগোলিক তথ্যের সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত তথ্য মিশিয়ে হয়তো বা নতুন অভিমত প্রচার করেছিলেন।

গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে কোনটির উৎসকে গঙ্গার উৎস বলে মেনে নেওয়া হবে এ নিয়ে মতবিরোধ সম্পর্কে কর্নেল এস্-জি-বুরাড' লিখেছেন—

"In the controversy over the surface of the Ganges during the early part of the century, it may be diffcult to define exactly what is meant by the source. The Ganges had many sources and no agreement could be reached as to which of them was the true source."

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বিতর্কের সমাধান কল্পে ক্যাপ্টেন হার্বার্ট অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন। সেই সময় হার্বার্ট হিমালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধারণা, জাহ্নবী গঙ্গাই গঙ্গার মুখ্য ধারা। জাহ্নবীর উৎসকেই গঙ্গার উৎস বলা উচিত। হার্বার্টের এ ধারণা বেশ কিছুদিন তথ্যাভিজ্ঞদের মনে রেখাপাত করেছিল। পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে—বড় বড় হিমবাহ থেকে নির্গত ধারার কোন নির্দিষ্ট একটিকে গঙ্গার মুখ্য ধারা হিসাবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। এই বক্তব্যকে স্বীকার করে নেবার ফলে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে বাদানুবাদের অবসান ঘটেছিল সাময়িকভাবে। তার মূল কারণ, গঙ্গার সম্পূর্ণ জল প্রবাহের কুড়িভাগের এক ভাগও কোন একটি মাত্র হিমবাহ থেকে নির্গত হয় না। সেদিক দিয়ে বিচার করে গঙ্গার প্রধান উৎস চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ক্যাপ্টেন হার্বার্টের মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারেননি তৎকালীন ভূগোল-বিজ্ঞানীরা। হার্বার্ট অবশ্য অলকানন্দার ধারা ও গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেননি। পরে অবশ্য ভাগীরথীকেই তিনি গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে মন্তব্য করেছিলেন। হার্বার্টের এই বক্তব্য ও প্রাচীন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার রিচার্ড স্ট্র্যাচে বলেছিলেন যে—ভাগীরথী জলধারার দ্বিগুণ পরিমাণ জল অলকানন্দা দিয়ে প্রবাহিত হয়। সুতরাং গঙ্গার প্রধান উৎস বলতে ধৌলীগঙ্গার উৎসকেই গঙ্গার উৎস বলে মেনে নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে রিচার্ড স্ট্র্যাচে রয়াল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির জার্নালে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন প্রবন্ধ আকারে। স্ট্র্যাচে লিখেছেন—

I may here also notice that on no principle's whatever

can the glacier at Gongotri be considered as the true source of the Ganges. The Bhagirathi which rises from that glacier is usually looked upon as the main stream of that famous river but it has in truth, no claim to such a title excepting in as much as it is the sacred stream of the Hindu Mythology. The Alakananda, the other great feeder of the Ganges is nearly twice the size of the Bhagirathi and the most distant sources of the former river are certainly more remote than any of the latter. Taking for granted that the Bhagirathi was the true Gauges, Cap tain Herbert, one of the earliest explorers of this country, suggested that the Jahnavi, a river that joining the Bhagirathis, a little below Gangotri was the true source of the Ganges. It has also been supposed that the Jahnavi rose from the north side of the Himalaya in the same manner as the sutlej, but this is not the case, the usual watershed range being as strongly developed accross its head as elsewhere. On the whole therefore, it is certain that the true source of the river is to be found in that of the Dhauli river which takes its rise to the north of the village Niti most probably in the stream called Raikana."

"আমি লক্ষ্য করেছি যে, গঙ্গোত্রী হিমবাহকে কোনক্রমেই গঙ্গার উৎস বলা চলে না। ভাগীরথী যে হিমবাহ থেকে উদ্ভূত, সাধারণতঃ সেই প্রধান ধারাকেই বিখ্যাত নদী মেনে নেওয়া হয়েছে। এ কথা সত্য যে, হিন্দু পুরাণে লিখিত পবিত্র ধারা ছাড়া অন্য কোন ধারার নাম থাকা উচিত নয়। অলকানন্দা, গঙ্গার অপর বৃহৎ ধারা, এই ধারা ভাগীরথীর জলপ্রবাহের দ্বিগুণ। দ্বিতীয় ধারাটির তুলনায় প্রথমটির উৎস-স্থানের দূরত্ব বেশী। ধরা যাক, ভাগীরথীই সত্যিকারের গঙ্গা। ক্যাপ্টেন হার্বার্ট এ দেশের পুরানো অভিযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, গঙ্গোত্রীর সামান্য নীচে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত জাহ্নবী নদীই প্রকৃত গঙ্গার উৎস। অনুমান করা হয়েছিল যে, জাহ্নবী নদী হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ঠিক সাটলেজ নদীর মতোই। কিন্তু এ অনুমান সত্য নয়। কারণ জলবিভাজিকা রূপ গিরিশিরা নদীর এ পাশেই পরিপুষ্ট হয়ে রয়েছে। এ সব কিছু ভাবলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে নদীর সত্যিকারের উৎস ধৌলীগঙ্গাতেই নিহিত। এই ধৌলীগঙ্গা উত্তরে নিতি গ্রাম থেকে বিশেষ করে রাইকানা নদী থেকেই

নির্গত হয়েছে।"

কোন কোন ভূগোল-বিজ্ঞানীরা নদীর উৎসের যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছিলেন। তাঁদের মতে নদীর উৎস আসলে নদীর ধারার বিশেষ অংশ অর্থাৎ নদীর ধারার মুখের শেষপ্রান্ত। এই সংজ্ঞা মেনে নিয়ে, কর্নেল জর্জ স্ট্র্যাহান্ গঙ্গার উৎসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে গঙ্গার উৎস হিমালয় পর্বত না হয়ে মধ্য ভারতের চম্বল নদীর শেষ প্রান্তও হতে পারে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে রিচার্ডের মতবাদকে হয়তো বা কেউ উপেক্ষা করতে পারেননি। সেই সব সময় ক্যাপ্টেন হার্বার্ট হিমালয় পর্বতে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সমীক্ষার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। গাড়োয়াল কুমায়ুনের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের সময় ধৌলীগঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় ধৌলী গঙ্গার ধারা সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। হার্বার্ট লিখেছেন—

"I must not leave the Dhauli, however, without saying some of those great accumulations of boulder stones, the very sight of which strikes the traveller with astonishment and forces him to admit the action of some great rush of waters. This diluvian beds are here seen on a scale, which sets at nought any theory that would derives its agent from the body of water at present occupying that channel.

The beds of some of the rivers are, for a part of their course, in the solid rock. In these cases, the depth is often considerable, while the appearence is such as leaves not a doubt in the spectators mind but that the present channel was once filled up with solid rock. This is conclusion we cannot escape from however, defficult it may be to understand the removal of so many thousand cubic feet of solid rock by the agency of water."

"আমি ধৌলী নদীর সম্পর্কে এড়িয়ে যেতে পারি না মাঝে মাঝে সঞ্চিত স্তূপীকৃত পাথরগুলোর দৃশ্য দেখে। সেই দৃশ্য ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও স্তম্ভিত করে। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন জলপ্রবাহের শক্তি। কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে! এই সব শিলাখণ্ড-দ্বারা ঢাকা তটভূমি সম্পর্কে কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলি জলপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে তটভূমিতে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

কোন কোন নদীর তটরেখায় সঞ্চিত কঠিন পাথরগুলোর অবস্থান দেখে নদীর ধারার কিছু অংশের গতিপথ অনুমান করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে নদীর গভীরতা প্রায়ই উল্লেখযোগ্য না দেখে ভ্রমণকারীর মনে হয়তো বা এই ধরনের সন্দেহের চিহ্নমাত্র থাকে না যে, বর্তমান জলধারাই একদা কঠিন শিলারাশির দ্বারা আবৃত ছিল। এই সিদ্ধান্ত আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না, হয়তো বা বুঝবার পক্ষে কষ্টকর মনে হতে পারে যে, এত হাজার হাজার ঘনফুট কঠিন শিলারাশি কেমন করে জলপ্রবাহ অপসৃত করতে পারে ?''

হার্বার্টের পর্যবেক্ষণে ধৌলীগঙ্গার জলপ্রবাহ, প্রবহমান জলের পরিমাণ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ভাগীরথী বা জাহ্নবী গঙ্গার তটভূমিতে সঞ্চিত শিলারাশি, স্তূপীকৃত উপলখণ্ডগুলোর অবস্থান দেখে ধারাগুলোর গভীরতা, প্রবহমান জলের পরিমাণ অনুমান করে তিনি অবশ্য ধৌলীগঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্যধারা বলে মন্তব্য করেননি। তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ রিচার্ড স্ট্র্যাচের মন্তব্যের সমর্থন নয়। স্ট্র্যাচে হয়তো বা ধৌলীগঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন গভীরভাবে। নদীর তটভূমিতে সঞ্চিত শিলারাশির অবস্হান লক্ষ্য করেই হয়তো এই ধারার গভীরতা, জলস্রোতের গতিবেগ, প্রবহমান জলের পরিমাণ অনুমান করেছিলেন। তাঁর এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে ধৌলীগঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেছিলেন।

ধৌলীগঙ্গার উৎস স্থলে কোন দীর্ঘ হিমবাহ নেই। নিতি গিরিপথের পার্শ্বদেশে অবস্থিত গঙ্গোনলী পর্বতের পাদদেশ থেকে এই জলধারা নির্গত হয়েছে। এই ক্ষীণ জলধারা নিতি গ্রামের সন্নিকটে প্রবাহিত রাইকানা নদীর জলে পুষ্ট হয়ে অবতরণ করেছে। রিচার্ড স্ট্র্যাচে এই রাইকানা নদীর উৎসকেই ধৌলীগঙ্গার উৎস বলেছেন। রাইকানা নদী অবশ্য উৎপন্ন হয়েছে রাইকানা হিমবাহের স্নাউটের মুখে সৃষ্ট বসুধারা তাল থেকে। নিতিগ্রামের কাছে রাইকানা নদী দশ গজ প্রশস্ত। মালারী গ্রামের সন্নিকটে ধৌলীগঙ্গার বিস্তার কুড়ি গজ। ধৌলীগঙ্গা রিনি, তপোবন গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যোশীমঠের পাদদেশে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে। উৎস থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত ধৌলীগঙ্গা জলসম্ভার সংগ্রহ করেছে রাইকানা নদী, ঋষি গঙ্গা ও গির্থি গঙ্গা থেকে। উৎস থেকে অন্তিম গতি পর্যন্ত ধৌলীগঙ্গার স্বতন্ত্র পরিচয়, বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দার জলে ধৌলীর পরিচয় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ধৌলীগঙ্গার উৎস স্হলে বিশাল হিমবাহের অস্তিত্ব নেই বলেই উৎস মুখ থেকে প্রচুর জল-সম্ভার সংগৃহীত হতে পারে না। এই নদীর

সৃষ্টির ইতিহাস নেই, পৌরাণিক কাহিনীতে পুষ্ট হয়ে প্রাচীন জনমানসের সামনে ভাস্বর হতে পারেনি। তীর্থযাত্রীদের কাছে, স্থানীয় অধিবাসী-দের কাছে এই নদীর উৎসের প্রচার নেই। রিচার্ড স্ট্র্যাচের বক্তব্যের স্বপক্ষে বলবার মতো যথার্থ তথ্য কোথায় ?

গঙ্গার মুখ্যধারাগুলোর কথা আলোচনা করতে গেলে মূলতঃ দুটো মাত্র ধারাকেই গঙ্গার ধারা বলে মনে করা উচিত। সেই ধারা দুটি ভাগীরথী ও অলকানন্দা। এই দুটি ধারাই দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য ধারা-গুলো ভাগীরথী ও অলকানন্দার শাখা-প্রশাখা।

ভাগীরথীর মুখ্য ধারা—জাহ্নবী গঙ্গা ও ভীলগঙ্গা। জাহ্নবী গঙ্গা উৎস স্থান থেকে পবাহিত হয়ে ভৈরবঘাটিতে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। ভৈরবঘাটির পর থেকে ভাগীরথী ও জাহ্নবী গঙ্গার সম্মিলিত জলধারা ভাগীরথী নামেই প্রবাহিত। মানা হিমবাহ থেকে উৎসারিত জাহ্নবী গঙ্গার পরিচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ভাগীরথীর জলপ্রবাহের মধ্যে। জাহ্নবী গঙ্গার প্রবাহমান ধারার জলের পরিমাণ ভাগীরথীর তুলনায় কমই হোক বা বেশীই হোক, জাহ্নবী গঙ্গার স্বকীয়তা লুপ্ত হয়েছে সঙ্গমের পর। পৌরাণিক কাহিনীতে জাহ্নবীর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভাগীরথীর তুলনায় স্বল্প প্রচারিত।

ভীলগঙ্গা বা ভীলাঙ্ গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে খাটলিঙ্ হিমবাহ থেকে। এই ধারা পার্বত্য পথ বেয়ে অবতরণ করেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন উপত্যকায়। সর্বশেষে এই ধারা টিহরী শহরের পাদদেশে এসে মিলিত হয়েছে ভাগী-রথীর সঙ্গে। এই সঙ্গম স্থলেই ভীলগঙ্গার পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে। ভীলগঙ্গা ও ভাগীরথীর সম্মিলিত জলধারা ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে।

অলকানন্দার একক প্রবাহ কোন এক সময়ে ভূগোল-বিজ্ঞানীদের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। অলকানন্দার উৎস স্থল নীলকণ্ঠ পর্বত ও বদ্রীনাথ পর্বতমালা অঞ্চল। এই অঞ্চলে অবস্থিত ভাগীরথী খড়ক ও সতোপন্থ নামে দুটি হিমবাহের সংযোগ স্থলে তিনটি ধারা উৎসারিত হয়েছে ১২৮৬০ ফুট উচ্চতায়। সম্মিলিত এই তিনটি জলধারার নাম অলকানন্দা। মানা গ্রামের পাদদেশে অলকানন্দা মিলিত হয়েছে উত্তর দিক থেকে আসা সরস্বতী নদীর সঙ্গে। এই দুটি ধারার সঙ্গম স্থলের নাম কেশব প্রয়াগ। হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মানা গিরিপথের পাদদেশ থেকে নির্গত সরস্বতী নদী বিভিন্ন ছোট বড় জলধারায় পুষ্ট-

হয়ে অলকানন্দার জল-সম্ভার বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং কেশব প্রয়াগে সরস্বতী নদীর পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে অলকানন্দার মাঝখানে। অলকানন্দার উৎস ও সরস্বতীর উৎসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, পরিচিতির দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার পর ধারা দুটির কোনটি মুখ্য ধারা বলে পরিগণিত হওয়া উচিত, এ নিয়ে ভূগোল-বিজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সরস্বতী নদী অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বিষ্ণুগঙ্গা নামে প্রচারিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে পর্তুগীজ মিশনারী এই ধারাকে বিষ্ণুগঙ্গা বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের ভ্রমণ বর্ণনায়। তদনুযায়ী মানা গিরিপথের পাদদেশ থেকে উৎসারিত বিষ্ণুগঙ্গা মানাগ্রাম ও বদ্রীনাথের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ করেছিল নিম্ন উপত্যকায়। এই ধারা যোশীমঠের পাদদেশে ধৌলীগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগের সৃষ্টি করেছে। সেই হিসেবে অলকানন্দা নামের সৃষ্টি বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে। বিষ্ণুগঙ্গা ধৌলীগঙ্গার সম্মিলিত জলধারার নাম অলকানন্দা।

প্রাচীন ভূগোল-বিজ্ঞানে প্রচলিত নামের পরিবর্তন ঘটে চলেছে দীর্ঘদিন থেকে। অলকানন্দা নাম পৌরাণিক যুগের। বদ্রীনাথ বিষ্ণুক্ষেত্র ; সেই স্থান দিয়ে প্রবাহিত ধারার নাম বিষ্ণুগঙ্গা বলে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সরস্বতী নদী বা বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দা নদী দুটোর কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌ ধারা কোন্‌টির শাখা বলা যুক্তিযুক্ত, এ বিচার করতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। সরস্বতী নামটি প্রাচীন, তবে বৈদিক যুগের সরস্বতী আর এই সরস্বতী এক নয়। অলকানন্দায় সম্মেলনের ফলে নামের অবলুপ্তি ও স্বকীয়তা হারিয়ে গিয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করে এই ধারাকে আর মুখ্য বলা যায় না। যে নদী উৎস থেকে অন্তিম গতি পর্যন্ত নাম অবিকৃত থাকে, অন্য কোন জলধারার সম্মেলনেও স্বকীয় মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে সে ধারাকেই মুখ্য ধারা বলা উচিত। ধৌলীগঙ্গা নামের অবলুপ্তিতে নদীর একক পরিচিতি হারিয়ে গিয়েছে। রিচার্ড স্ট্র্যাচের বিচারে ধৌলীগঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্য ধারা বলবার কোন যুক্তি নেই। তবে গঙ্গার প্রধান ধারা কোন্‌টি? বিদেশী ভ্রমণকারী ও ভূগোল-বিজ্ঞানীদের যুক্তি ও বিচারের জন্য অভ্রান্ত তথ্য কোথায়? যে তথ্যের আলোকে অতীত যুগের পৌরাণিক রহস্য উদ্ভাসিত হতে পারে? রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত কাহিনীগুলোর সত্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে যুগের ভৌগোলিক তথ্য, যা আজো অবিকৃত, সেগুলোর অস্তিত্ব বর্তমান। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গা

আনয়ন করেছিলেন। এ কাহিনীর সত্যতা যাচাই করবার প্রশ্ন আসে না। কারণ, সে যুগের পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান ও তথ্য বিকৃত হয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনই সুদূর অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। এই ব্যবধান যুক্ত করবার মতো সেতু কোথায়? কিন্তু ভগীরথ যে গঙ্গার ধারা এনেছিলেন তার নাম ভাগীরথী। এই ভাগীরথীর অস্তিত্ব আজও বর্তমান। এই অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে সুদূর অতীত যুগ থেকে তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ ও দুর্গম পদ-যাত্রায়। আজও সে পদযাত্রার ধারা অব্যাহত ভাগীরথীর ধারার মতোই। সুদূর অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে এ যোগসূত্রকে অস্বীকার করা যায় না।

ভাগীরথীর উৎসই গঙ্গার উৎস। অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা এ সত্যতার আলোকবর্তিকা বয়ে নিয়ে এসেছে। সে আলো আজও ভাস্কর।

॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্ গচ্ছেরণু কনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃকন্যাং সগরতনয় স্বর্গ সোপান পঙ্‌ক্তিম্ ॥
গৌরীবক্ত্র ভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ।
শম্ভোঃ কেশ গ্রহনম্ করোদিন্দু লগ্নোর্মি হস্তা ॥ ৫১
মেঘদূত/পূর্ব মেঘ

"এই স্থানে অর্থাৎ সরস্বতী থেকে কনখল পর্যন্ত এই স্থানের নিকটবর্তী হরিদ্বারে গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের গাত্র বেয়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে। সগর সন্তানগণ যেন এই ভাগীরথীর (জাহ্নবীর) সোপান বেয়েই স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। থাদে থাদে পুঞ্জীভূত ফেনরাশি যেন গঙ্গার কলহাস্য, তরঙ্গরূপ হস্ত ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে মহাদেবের জটা আকর্ষণ করেছেন। স্বপত্নী গৌরীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই গঙ্গা যেন কলহাস্যে মুখরিত।" মহাকবি কালিদাসের রচিত মেঘদূত কাব্যে গঙ্গা

অবতরণের সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত ধারাগুলি উচ্চভূমি থেকে অবতরণ করেছে সোপান শ্রেণী বেয়ে। মহাদেবের জটাজালে নিরুদ্ধ জলধারা তুষারাবৃত হিমবাহ। এই অনেক-গুলো হিমবাহের বরফ বিগলিত হয়ে গঙ্গার ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

গঙ্গার উৎসমুখের সমস্ত হিমবাহগুলোর জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তবে কোন কোন দুঃসাহসী অভিযাত্রী হিমবাহের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণই পরবর্তী অভিযানের সূত্রপাত করেছিল। হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য হিমবাহ সমীক্ষা করেছিলেন জেনারেল রিচার্ড স্ট্র্যাচে। ১৮৪৭ সনে জেনারেল রিচার্ড স্ট্র্যাচে কুমায়ুন হিমালয়ে পিণ্ডারি হিমবাহে পৌঁছেছিলেন হিমবাহ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। তাঁর পর্যবেক্ষণের বিবরণ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি পিণ্ডারি হিমবাহের অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, হিমবাহের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। রিচার্ডের মতে পিণ্ডারি হিমবাহের দৈর্ঘ্য আট মাইল। হিমবাহের স্নাউ-টের উচ্চতা ১১৩০০ ফুট। সেখান থেকেই হিমবাহের বরফ গলে পিণ্ডারি গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে। হিমবাহের মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা ১২০০০ ফুট। সেই অংশের সঞ্চিত বরফ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তুষারভূমির সৃষ্টি করেছে। রিচার্ড পিণ্ডারি হিমবাহ সমীক্ষা সম্পন্ন করে অবতরণ কালে দেওয়ালীতে পিণ্ডারি নদী ও কাফ্নি নদী সঙ্গমস্থল পর্যবেক্ষণ করে-ছিলেন। এই সঙ্গমস্থলের উচ্চতা ৮২০০ ফুট। কাফ্নি নদীর ধারা অনুসরণ করে কাফ্নি হিমবাহে পৌঁছে গিয়েছিলেন রিচার্ড স্ট্র্যাচে। তিনি কাফ্নি হিমবাহ সমীক্ষা সম্পন্ন করে হিমবাহের দৈর্ঘ্য ছ মাইল বলে নির্ধারিত করেছিলেন। হিমবাহের স্নাউট ১২৫০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে কাফ্নি নদী অবতরণ করেছে। হিমবাহের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সঞ্চিত বরফ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তুষার ভূমির সৃষ্টি করেছে। সেই তুষার ভূমির উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট। পিণ্ডারি ও কাফ্নি অঞ্চলের চিরতুষার অঞ্চলের উচ্চতা ১৫০০০ ফুট। সম্ভবতঃ এর পর থেকেই হিমবাহ সংক্রান্ত মোটামুটি নির্ভরশীল তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন। ডগলাস ফ্রেসফিল্ডের নেতৃত্বে কমিশন ইণ্টারন্যাশনাল দ্য গ্লেসিয়ারের তরফ থেকে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ ১৯০৬ সন থেকে হিমালয়ের প্রধান প্রধান হিমবাহগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, স্নাউটের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভূ-তত্ত্ববিদ্ কটাম ও ব্রাউন ১৯০৬ সনে

কুমায়ুন হিমালয়ে অবস্থিত পিন্ডারি হিমবাহ, মিলাম হিমবাহ, সঙ্কম্প হিমবাহ ও পোটিঙ্ হিমবাহের প্রাথমিক জরিপকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরা হিমাবাহগুলির ভৌগোলিক পরিবেশ, স্নাউটের অবস্থান সমীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ সনে ডাঃ লঙস্টাফ্, জেনারেল ব্রুস, বাগিনী হিমবাহ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এমনি করে কোশা হিমবাহ, নন্দাদেবী পর্বতের উত্তর ও দক্ষিণ ঢাল বেয়ে নেমে আসা হিমবাহগুলোর প্রাথমিক ভাবে জরিপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। সেই সময় জরিপবিভাগের কর্মচারীগণ কামেট পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসা রাইকানা হিমবাহ সমীক্ষা করেছিলেন।

১৮৬৭ সনে কর্নেল মন্টোগোমারী কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকা জরিপ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মন্টোগোমারী জরিপ করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের অনেক তুষারাবৃত অঞ্চল ও গিরিপথ অতিক্রম করেছিলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা। তাঁরা দুর্গম তুষারাবৃত অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে পথ খুঁজে বার করবার জন্য সাহায্য নিতেন গাড়োয়াল কুমায়ুনের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের। সেই সব গ্রামবাসী বংশানুক্রমে উচ্চ হিমালয়ে মেষ চরাবার সময় নতুন নতুন সহজ পথ চিহ্নিত করে রাখতো। তাদের চিহ্নিত পথ ও নিরাপদ রাত্রিবাসের স্থানগুলো জরিপকারী ও অভিযাত্রীদের সহায়ক হত। উচ্চ হিমালয়ের দুর্গম স্থানেই এমনিভাবে চিহ্নিত হত ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। ভারতীয় জরিপ বিভাগ গঙ্গার বেসিনের জরিপ কার্য শুরু করেছিল ১৮৭১-১৮৭২ সনে। সেই সময় গাড়োয়াল কুমায়ুনের নদীগুলোর উৎস পর্যন্ত মানচিত্র অঙ্কন, উৎসের নিকটস্থ উচ্চ উপত্যকা, উচ্চ গিরিশিখর, গিরিপথ ও হিমবাহগুলোর জরিপ কার্য স্থগিত ছিল। কারণ, সেই সময় গভর্নর জেনারেল এই ধরনের জরিপ কার্য অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল মনে করে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেননি। পরে অবশ্য ১৮৭২ সনে রিয়্যাল ও কিন্যে জাহ্নবী গঙ্গার উপত্যকা জরিপ কার্য সম্পন্ন করে, নানা হিমবাহের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

কমিশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য গ্লেসিয়ারের উদ্যোগে যখন ভূতত্ত্ববিদ্গণ হিমালয়ের হিমবাহগুলোর জরিপ কার্য শুরু করেছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় জরিপ বিভাগ ও বিভিন্ন হিমবাহ জরিপ ও তার মানচিত্র অঙ্কনের কাজ আরম্ভ করেছিল। ১৯১১ সনে লেফ্টেন্যান্ট বুরার্ড ও লেফ্টেন্যান্ট ম্যানকোলা জাহ্নবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে নদীর উৎস স্থান জেলুখাগা (সাঙচোক্লা) গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের

উদ্দেশ্য ছিল—এই নদীর উৎস জাস্কর গিরিশিরার ওপারে কিনা এই তথ্য সংগ্রহ করা।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে গঙ্গার প্রচলিত ধারাগুলির নাম—ভগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। ধারাগুলির অবস্থান অনুসারে নামগুলোর প্রচার হয়েছিল। জাহ্নবীকে গঙ্গার অপর নাম বলে অভিহিত করা হয়েছে পুরাণে ও রামায়ণে। ধবলী বা ধৌলীগঙ্গা নামে কোন ধারা প্রাচীন যুগের কোন কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায়নি। ধৌলীগঙ্গা ও পিণ্ডার গঙ্গা এই দুই ধারা অলকানন্দার শাখা, এ তথ্য হয়তো বা সে যুগের ভূগোল-বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত না থাকলেও প্রচার ছিল না। ধৌলীর প্রাধান্য প্রচারিত হয়েছিল বিদেশী ভ্রমণকারীদের সাহায্যে। বিদেশীরা হয়তো বা স্বল্প সময়ের জন্য পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তেন। তাঁদের অনেক তথ্যই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ধৌলী গঙ্গার উৎস নির্দিষ্ট হিমবাহ নয়। ১৮১২ সনের মে মাসে উইলিয়ম মুরক্রফ্‌ট যোশীমঠ থেকে ধৌলীগঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন মূল উৎসে। নিতি গিরিপথের সন্নিকটে একটি পর্বতের পাদদেশ থেকে ধৌলীগঙ্গার ধারা নির্গত হতে দেখেছিলেন। রিচার্ড স্ট্র্যাচে অবশ্য রাইকানা হিমবাহকেই ধৌলীর উৎস বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাইকানা হিমবাহের বরফ গলে যে ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম রাইকানা নদী। এই নদী নিতি গ্রামের সামান্য ওপরে ধৌলীগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং মুরক্রফ্‌টের চিহ্নিত ধৌলীর উৎস সম্পর্কে দ্বিমত না থাকাই সম্ভব। বরং রিচার্ডের তথ্য ত্রুটিপূর্ণ বলা চলে।

রাইকানা নদী ধৌলীগঙ্গার শাখা নদী। রাইকানা হিমবাহ দীর্ঘ হিমবাহ নয়। কামেট পর্বতের (২৫৪৪৭′) পূর্ব ঢাল থেকে বরফ সঞ্চিত হয়ে আনুমানিক ছ-সাত মাইল দীর্ঘ হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো সঞ্চিত হয়ে বাধা সৃষ্টি করায় সম্ভবতঃ অপরূপ সরোবরের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সরোবরের নাম বসুধারা তাল। বসুধারা তাল থেকে নির্গত জলধারাই রাইকানা নদী। বসুধারা তালের উপচে পড়া জলের পরিমাণ এমন কিছু নয়। তবু এই ধারার জলে ধৌলীগঙ্গা কিছুটা পুষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে অবতরণের পথে ধৌলী জল সংগ্রহ করেছে গির্থি গঙ্গা থেকে। গির্থি গঙ্গার উৎসস্থল উজাতিরচে হিমবাহ। উজাতিরচে (২০৫৫০′) ও ল্যাম্পাক (২০৪২০′)

পর্বত গাত্র থেকে নেমে আসা বরফ উজ্জাতিরচে হিমবাহের বরফ যোগান দিয়েছে। গির্থি গঙ্গা হিমবাহের বরফ গলে দীর্ঘ ধারার সৃষ্টি করে মালারি গ্রামের সন্নিকটে ধৌলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধৌলীগঙ্গার পরবর্তী শাখা নদী দুনাগিরি গড়। এই ধারার উৎস স্থান বাগিনী হিমবাহ। বাগিনী হিমবাহ প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ। দুনাগিরি পর্বত (২৩১৮৪′), চ্যাঙ্‌-ব্যাঙ্‌ (২২৫২০′) পর্বত গাত্র থেকে প্রভূত বরফ সঞ্চিত হয়ে এই দীর্ঘ হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। ধৌলীগঙ্গা সব চাইতে বেশী জল সংগ্রহ করেছে ঋষিগঙ্গা থেকে। ঋষিগঙ্গার উৎসস্থল নন্দাদেবী পর্বত (২৫৬৪৫′), ত্রিশূল (২৩৩৬০′) ও তার ছোট ছোট পর্বতশিখর থেকে উৎপন্ন হিমবাহ।

ঋষিগঙ্গার উৎস প্রধানতঃ দুটি হিমবাহ। নন্দাদেবী পর্বতের দক্ষিণ ও উত্তর ঢাল থেকে প্রভূত পরিমাণ বরফ নেমে এসে সঞ্চিত হয়েছে। এই সঞ্চিত বরফই দক্ষিণ ঋষি হিমবাহ ও দক্ষিণ নন্দাদেবী হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। হিমবাহ দুটির উভয়ই প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ। নন্দাদেবীর দীর্ঘ গিরিশিরা এই হিমবাহ অঞ্চলকে দুর্ভেদ্য প্রাকারের মতো ঘিরে রেখেছে। এই গিরিশিরার সর্বনিম্ন অংশের উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফুট। এই ঢালু অংশ দিয়েই ঋষিগঙ্গার বহির্গমনের পথ খুঁজে বার করে নিয়েছে। প্রায় দু'শ পঞ্চাশ বর্গমাইল পরিমিত তুষার ক্ষেত্রের বরফ গলেই ঋষিগঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। ঋষিগঙ্গার গিরিখাত দুর্গম, গিরিশিরা দুর্ভেদ্য, উচ্চ উপত্যকায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। কথিত আছে এই দুর্গম অনধিগম্য উপত্যকায় সাতজন ঋষি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

নন্দাদেবীর ঢাল থেকে সংগৃহীত বরফের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ ঋষি হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে। অবশ্য চ্যাঙ্‌ব্যাঙ্‌ পর্বত শিখরের ঢাল বেয়ে বেশ কিছু পরিমাণ বরফ যোগান দেয় দক্ষিণ ঋষি হিমবাহকে। ঋষি ও নন্দাদেবী হিমবাহ ছাড়াও ঋষিগঙ্গার জল স্ফীত করেছে ত্রিশূল হিমবাহের বরফ গলা জল। ত্রিশূল হিমবাহের বরফ সংগৃহীত হয় ত্রিশূল পর্বত (২৩৩৬০′) থেকে। ত্রিশূল হিমবাহ ছাড়াও নন্দাঘুণ্টি ও বণ্টি পর্বত থেকে নেমে আসা হিমবাহের বরফগলা জল রণ্টিনালা ও ঋষিগঙ্গাকে পুষ্ট করেছে। রণ্টিনালা—রিনি গ্রামের সন্নিকটে ঋষিগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই ধৌলীগঙ্গা তার জলভার বয়ে নিয়ে এসেছে যোশীমঠের পদতলে। বিষ্ণুপ্রয়াগের সৃষ্টি করেছে অলকানন্দায় মিলিত হয়ে।

অলকানন্দার উৎস অঞ্চলে কতগুলো উল্লেখযোগ্য পর্বত শৃঙ্গ

রয়েছে। বদ্রীনাথ মন্দির থেকে প্রায় দশ এগারো মাইল পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিশাল পর্বতমালার নাম বদ্রীনাথ পর্বতমালা। এই পর্বতমালার চারটি উচ্চ পর্বত-শিখর বলেই সম্ভবতঃ অপর নাম চৌখাম্বা। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৩৪২০ ফুট, অপর তিনটির উচ্চতা যথাক্রমে ২৩১৯০', ২২৮৮০', ২২৪৮৫'। বদ্রীনাথ পর্বতমালার প্রধান শিখরের সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরা দীর্ঘ প্রাচীরের সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত। এই গিরিপ্রাচীর এই অঞ্চলের প্রধান জলবিভাজিকা। এই গিরিশিরার পূর্ব ঢালে অলকানন্দা সরস্বতী অববাহিকা; পশ্চিম ঢালে ভাগীরথীর উৎস মুখের বৃহৎ গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখাযুক্ত বিশাল পরিবার। এই পর্বতমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিখরদেশ থেকে একটি গিরিশিরা পশ্চিমে কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০') পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। এই গিরিশিরা এই অঞ্চলের প্রধান জলবিভাজিকা। এই গিরিশিরার দক্ষিণ ঢালে মন্দাকিনী উপত্যকা, উত্তর ঢালে গঙ্গোত্রী উপত্যকা। বদ্রীনাথ পর্বতমালার তৃতীয় শিখর থেকে নাতিদীর্ঘ গিরিশিরা দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে গিয়েছে। এই গিরিশিরা এই অঞ্চলের জলবিভাজিকা। এই জলবিভাজিকায় পূর্ব প্রান্তে ক্ষীরগঙ্গা উপত্যকা। বদ্রীনাথ পর্বতের পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে বরফ নেমে এসে মোটামুটি বড় ধরনের তুষারক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। এই সঞ্চিত তুষারক্ষেত্র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে সতোপন্থ হিমবাহ। এই হিমবাহের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে ছোট বড় পর্বত শিখর। ছোট ছোট শিখরগুলোর উচ্চতা—১৯৪৯০ ফুট, ১৯০৭০ ফুল, নারায়ণ পর্বত—১৯৫৭০ ফুট। উচ্চ শিখরগুলোর মধ্যে নীলকণ্ঠ পর্বত ২১৬৪০ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২০৫৩০ ফুট। এই সব পর্বতগাত্র বেয়ে নেমে আসা বরফ কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ধারার সৃষ্টি করতে পারেনি। পর্বতগাত্রগুলি প্রস্তরময়, খাড়া বলে সেখানে বরফ জমতে পারে না। মোটামুটি ঢালু স্থানে বরফ সঞ্চিত হয়ে ঝুলন্ত হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। পরে, এই সব ঝুলন্ত হিমবাহের বরফ ঝরে পড়ে হিমানীসম্প্রপাতরূপে। পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে বরফ গলে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি করেছে। এই সব ধারা সতোপন্থ হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখায় গিয়েছে মিলিয়ে। পরে হয়তো অন্তঃসলিলার সৃষ্টি করে এই ধারা পৌঁছে গিয়েছে সতোপন্থ হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায়। প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বরফগলা জল অলকানন্দার উৎস মুখের তিনটি ধারার একটা।

অলকানন্দার উৎসের মুখে রয়েছে আর একটি হিমবাহ, ভগীরথ

খড়ক হিমবাহ। এই হিমবাহের উৎস মুখে রয়েছে স্বচ্ছন্দ পর্বত (২২০৫০′) অনামী শৃঙ্গ ২১৯৯০′, ২১৯৮০′, ১৯৯৬০′। এইসব পর্বত শিখরগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট শিখর থেকে নিয়মিত আসা বরফের অবিচ্ছিন্ন ধারা না থাকলেও গিরিশিরার ওপর থেকে শীত ও বর্ষার প্রভূত তুষার সঞ্চিত হয়ে অবতরণ করে। এই সঞ্চিত বরফই ভগীরথ খড়ক হিমবাহের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বরফগলা জলের ধারা এসে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। ভগীরথ খড়ক হিমবাহ ও সতোপন্থ হিমবাহের মধ্যবর্তী উচ্চ উপত্যকার ওপরে একটি গিরিশিরা পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে পূর্বে প্রসারিত হয়েছে। এই গিরিশিরার ওপরে রয়েছে বালাকুন পর্বত (২১২৩০′), অনামী-শৃঙ্গ (২০০১০′) ও (১৯৯২০′, ১৯৯৪০′)। এই গিরি-শ্রেণীতে সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবতরণ করে লারি বামাক নামে ছোট্ট হিমবাহ সতোপন্থ হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গিরিশিরার পূর্বপ্রান্তের পর্বত শিখরগুলোর ঝুলন্ত হিমবাহের বরফ হিমানী সম্প্রপাতরূপে পর্বতগুলোর পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে হয়তো বা গলে ছোট ছোট ধারার সৃষ্টি করেছে। এইসব ধারা মিলিত হয়ে ভগীরথ খড়ক হিমবাহ ও সতোপন্থ হিমবাহ নিঃসৃত ধারা দুটির মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অলকানন্দার উৎস স্থানে মিলিত হয়েছে।

সম্ভবত এইসব বরফগলা জলের কিছু অংশ গ্রাবরেখার পাথরগুলো সিক্ত করেছে। পরে পাথরগুলো শীততাপের প্রভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে সমতলভূমির সৃষ্টি করেছে। সুন্দর সুদৃশ্য ঘাস ও রঙীন ফুল সমস্ত অঞ্চলকে ছেয়ে রেখেছে। নিম্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা মেষ চারণ করবার জন্য এই সব স্থানে এসে অস্থায়ী রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতো। পরবর্তীকালে জরিপকারীরা এই স্থানগুলোকে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই সব অঞ্চলের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের নাম—মাজনা (১৩৫০০′), খাঁদু সড়ক (১৪৫০০′), ভগীরথ খড়ক (১৩০০০′)। অলকানন্দার উৎস স্থানের উচ্চতা—১২৮৬০ ফুট।

খাঁদু খড়কের সঙ্গে যুক্ত হিমবাহের নাম বাগনু হিমবাহ। এই হিম-বাহের বরফ যোগান দেয় কতকগুলি অনামী শৃঙ্গ। এই সব শৃঙ্গগুলির উচ্চতা—২০৩২০′, ২০৩৩০′, ২০২৬০′, ২০১৭০′, ২০৮৪০′, ১৯৯৭০′, ১৯৮১০′, ১৯৯৩০′, ১৯৮৩০′, ১৯৬৬০′, ১৯৪৪০′, ১৯২৭০′। এই সব পর্বত শিখরের সঞ্চিত বরফের দ্বারা পুষ্ট বাগনু হিমবাহের স্নাউট থেকে নিঃসৃত জলধারা ভগীরথ খড়ক হিমবাহের স্নাউটের ধারায় মিলিত

হয়েছে। এই অঞ্চলের নামগোত্রহীন শিখরগুলোকে অলকাপুরী গিরিমালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অলকানন্দা অবতরণের মুখে প্রভূত জলসম্ভার সংগ্রহ করেছে সরস্বতী নদী থেকে। যক্ষরাজ কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করে অলকানন্দার যেন প্রথম পরিচয় কৈলাস-মানসসরোবরের পথ থেকে আসা সরস্বতীর সঙ্গে। মানা গিরিপথের পাদদেশে বরফের ঢালের মুখে দুটি হ্রদ—দেবতাল ও রাক্ষসতাল। এই হ্রদ দুটি ভূগোল-বিজ্ঞানীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল।

বিদেশী ভ্রমণকারী সরস্বতী নদীকে গঙ্গা, হ্রদ দুটিকে মানসসরোবর ও রাক্ষসতাল বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

সরস্বতীর উৎস স্থানের হ্রদ দুটি সম্ভবতঃ বালবালা হিমবাহের ও উত্তর পশ্চিমে সুরজ হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখায় সৃষ্ট হয়েছিল। মূল সুরজ হিমবাহের একটি অংশ উত্তর পূর্বে অগ্রসর হয়েছে মানা গিরিপথের সন্নিকটে। হ্রদ দুটি মুখ্যত গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর জলবিভাজিকার পূর্ব ঢালে উৎপন্ন হিমবাহগুলির মধ্যে আরোয়া হিমবাহ, বৈদ্যুম হিমবাহ, তারা ও সুরজ হিমবাহ। এই হিমবাহগুলির সবকটির স্নাউট থেকে জলধারা প্রবাহিত হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে মিশেছে। এই ধারাগুলির মধ্যে দীর্ঘ ধারা এসেছে আরোয়া হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় উৎপন্ন আরোয়া তাল থেকে। কেউ কেউ একে অর্বা তাল বলেন। কেউ বা একে পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত উর্বশী তাল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তবে এ তথ্যের কোন সত্যতা নেই। এই অঞ্চলের পর্বত শৃঙ্গগুলির কোনটাই ২১১৪০ ফুটের বেশী নয়। এই অঞ্চলের পর্বত শৃঙ্গগুলির উচ্চতা যথাক্রমে ২০০২০′, ২০২৮০′, ২০৬৪০′, ২০৬৬০′, ২০৪২০′, ২০৩১০′, ২০০৭০′। এই অঞ্চলে ১৯০০০ ফুটের ওপরে পনের যোলটি শৃঙ্গ রয়েছে। এইসব পর্বতশিখর থেকে সংগৃহীত বরফ হিমবাহগুলোকে সজীব রেখেছে। এই সব সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শৃঙ্গগুলির স্বল্প বরফ সঞ্চিত হয়ে দীর্ঘ হিমবাহের সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই ছোট ছোট হিমবাহ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেছে বিশেষ কতগুলি পর্বতশৃঙ্গ ঘিরে। এই অংশের দীর্ঘ ধারা আরোয়া ঘাসতলীর কাছে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর গতিপথের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে বড় বড় পর্বতশৃঙ্গ। এই পর্বতশৃঙ্গগুলির পশ্চিম ঢাল থেকে নেমে আসা বরফ উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। সরস্বতীর উৎস পথের সন্নিকটে উত্তর পূর্ব

প্রান্তে অবস্থিত বালবালা হিমবাহ। বালবালা শিখর (২১০৫০′) থেকে বরফ সংগ্রহ করে এই হিমবাহ পুষ্ট হয়েছে। বালবালার পূর্বে মুকুট পর্বতের (২৩৭৬১′) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ চামরাও হিমবাহ। আরো পূর্ব দক্ষিণে আবিগামিন পর্বত (২৪১৩০′) ও কামেট পর্বতের (২৫৪৪৭′) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে খাগিয়াম হিমবাহ, পশ্চিম কামেট হিমবাহ। কামেটের দক্ষিণে মানা পর্বতের (২৩৮৬০′) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ নাকথুনী হিমবাহ, আনাদেব হিমবাহ। অবশ্য এই হিমবাহগুলিকে বরফ সংগ্রহ করে দেয় মন্দির পর্বত (২১৫২০′)। মন্দির পর্বতের দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত (২১২৬৪′) থেকে উৎপন্ন হয়েছে খুলিয়া গার্ভিয়া হিমবাহ। এই সব হিমবাহগুলির স্নাউট থেকে ছোট ছোট জলধারা এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়।

সরস্বতীর জলে পুষ্ট অলকানন্দা পরমানন্দে মন্থর গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে বদরিকাশ্রমের পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে। তার সামান্য পূর্বে ছোট্ট একটি ধারার জল সংগ্রহ করেছে। সে ধারার নাম কুবের গঙ্গা। নর পর্বতের গাত্রে সঞ্চিত ছোট্ট কুবের হিমবাহের বরফ গলে নেমে এসেছে এই ধারা। অদূরে অলকাপুরী, কুবেরের আলয়, নর পর্বতের গায়ে যক্ষরাজ ধনপতি কুবেরের ধনভাণ্ডার। কিম্বদন্তী আর কাহিনীতে ভরা হিমালয়।

বদরিকাশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নীলকণ্ঠ পর্বতের উত্তর পূর্ব ঢাল থেকে নেমে আসা বরফ গলা জলধারা ঋষি গঙ্গারূপে প্রবাহিত হয়েছে। এই ঋষিগঙ্গার ক্ষীণ ধারা এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়। বদরিকাশ্রমের পর থেকেই অলকানন্দা আবার দক্ষিণ বাহিনী। এই ধারা কখনো বা উচ্ছল, কখনো প্রপাতের সৃষ্টি করে মহা উৎসাহে···মহা গর্জনে অবতরণ করেছে হনুমান চটিতে। হনুমান চটিতে পশ্চিম দিক থেকে ক্ষীরগঙ্গা অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। ক্ষীরগঙ্গার উৎস স্থল পান পাতিয়া হিমবাহ। ঐ অঞ্চলের পাঁচটি পর্বত শিখরগুলির উচ্চতা যথাক্রমে ১৯০৪১,′ ১৭৯৬০′, ১৮২২০′, ১৯৭৩০′, ১৭৪৮৮′, ১৮০৫৯′,। পান-পাতিয়া হিমবাহের বেশীর ভাগ বরফ সংগৃহীত হয় বদ্রীনাথ পর্বতমালার তৃতীয় শিখর ও তৎসংলগ্ন গিরিশিরা থেকে।

হনুমান চটির পর অলকনন্দার উল্লেখযোগ্য শাখানদী ভুইণ্ডার গঙ্গা। এই জলধারার প্রায় সাত মাইল পথে অলকানন্দার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। গিরিশিরার পাদদেশ দিয়ে মাঝে মাঝে গিরিখাত অতিক্রম করে পেঁৗছে

গিয়েছে পাণ্ডুকেশ্বরে। পাণ্ডুকেশ্বরের সামান্য নীচে এই ধারা পূর্ব দিক থেকে আসা ভ্যুইণ্ডার গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গৌরীপর্বত (২২০১০′) ও রতবন পর্বতের (২০২৩০′) গাত্র থেকে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়েছে পর্বতের পাদদেশে। সেখানকার সঞ্চিত বরফে লরিবাঁক হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছ। এই হিমবাহের স্নাউট থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভ্যুইণ্ডার গঙ্গা। এই জলধারা পুষ্ট হয়ে অলকানন্দার নীলাভো জলপ্রবাহ যোশীমঠের পদতলে বিষ্ণুপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে ধৌলী গঙ্গার সঙ্গে। বিষ্ণু প্রযাগের পর অলকানন্দা প্রভূত জলসম্ভার বহন করে সু-গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রাবাহিত হয়েছে কখনও বা দুর্বার বেগে, কখনও বা স্তিমিত কলকণ্ঠে। যোশীমঠ থেকে পিপলকোটি পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ মাইল গতিপথে অলকানন্দার বিচিত্র গতি। এই অংশের জলধারার বিস্তার বৃদ্ধি পায়নি, অথচ জলের গভীরতা আছে। কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা অনুমান করা দুঃসাধ্য। যোশীমঠ থেকে হেলাং চটির নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত অলকানন্দার গভীরতা সম্ভবতঃ সব চাইতে বেশী। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা যোশী-মঠের মাইল চার পাঁচেকের মধ্যে নদীর গভীরতা খুবই বেশী। বছর কয়েক পূর্বে কয়েকজন অভিযাত্রী ভেলায় করে অলকানন্দার গতিপথ ধরে হরিদ্বার যাবার চেষ্টা করেছিলেন। যোশীমঠে সিংহদ্বারে ভেলা নিয়ে নেমেছিলেন তাঁরা। অলকানন্দার তীরে হাজার কয়েক উৎসাহী দর্শক ছিলেন। তাঁদের চোখের সামনেই ভেলা-সহ অভিযাত্রীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অলকানন্দার নীলাভো জলের মধ্যে। তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পিপলকোটি থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত বাসরাস্তা নির্মাণের সময় কয়েকটি বুলডোজার অলকানন্দার গর্ভে মিলিয়ে গিয়েছিল ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। অলকানন্দার পথ ধরে পায়ে হেঁটে যাবার পথে বেলাকুচির কাছে তটভূমির সামনে বসে বসে দেখেছি জলধারার বিস্তার পঁচিশ ফুটের বেশী নয়; কিন্তু স্বচ্ছ জলধারা যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে বেয়ে চলেছে। হেলাংচটির কাছে প্রতিবছরই ধস নামতো। পায়ে চলা পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। পায়ে হেঁটে একবার প্রায় অলকানন্দার তটরেখায় পেঁৗছে গিয়েছিলাম। সরস্বতী আর ধৌলী গঙ্গার জলভার বহন করে অলকানন্দা যেন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফিকে নীলাভো জল, স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। দু পাশের প্রস্তরময় গিরিখাত স্পর্শ করে মৃদু কলধ্বনিতে প্রবাহিত জলধারা। অথচ বর্ষায় অলকানন্দা স্ফীতা হয়ে শুরু করে

তর্জন গর্জন। তখন জলধারা দুপাশের গিরিখাত অতিক্রম করে অনেকটা উচ্চ অংশ পর্যন্ত ছাপিয়ে তটরেখার চিহ্ন মুছে ফেলে। বৃষ্টি হয় অবিশ্রান্তভাবে, ধস নামে, জল বেড়ে অতর্কিতে নিম্ন উপত্যকার গ্রাম ভাসিয়ে ফেলে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এমন ধরনের সর্বনাশা বন্যার ইতিহাস রয়েছে। পিপলকোটির পরে বিরেহী গঙ্গা। নন্দাঘুণ্টি পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎসারিত হয়ে বিরেহী গঙ্গার ক্ষীণ ধারা নেমে এসেছিল। এই নদীর গতিপথ ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে ১৮৯৩ সনে এক অপরূপ হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। পর বৎসরই বাঁধ ভেঙে অবরুদ্ধ জলের স্রোত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অলকানন্দায়। ফলে অলকানন্দার স্ফীত জলপ্রবাহ শ্রীনগর শহরের ক্ষতি করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিরেহী তালের সৃষ্টি হয়েছিল, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিরেহীতাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

চামোলীর পর অলকানন্দার শাখা নদী নন্দাকিনী—কুমায়ুন হিমালয়ে নন্দাঘুণ্টি পর্বত (২০৭০০′) ও ত্রিশূল পর্বতের (২৩৩৬০′) ঢাল বেয়ে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছিল শৈল সমুদ্র হিমবাহ। এই হিমবাহের বরফ গলে নির্গত হয়েছে নন্দাকিনী। কুমায়ুন হিমালয়ের সীমানা পেরিয়ে এই ধারা এসে অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। নদী দুটির সঙ্গম স্থলের নাম নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগের পর অলকানন্দা মিলিত হয়েছে পিণ্ডারি গঙ্গার সঙ্গে। কুমায়ুন হিমালয়ে নন্দাকোট পর্বত (২২৫১২′), ছাঙ্গুস (২০৭৭০′), নন্দাখাত (২১৬৯০′), পানওয়ালী দোয়ার (২১৮৬০′) এই সব পর্বত শিখর থেকে সঞ্চিত বরফ ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে নেমে এসে পিণ্ডারি হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। পিণ্ডারিগঙ্গার জলধারা পুষ্ট করেছে কাফনী নদী। নন্দকোট পর্বতের গিরিশিরা থেকে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে কাফনী হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। হিমবাহের স্নাউটের মুখ থেকে নিঃসারিত কাফনী নদী দেয়ালীর নীচে পিণ্ডারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। থারকোট পর্বত (২০০১০′) ও মৃগথুনী পর্বতের (২২৪৯০′) গা বেয়ে নেমে আসা বরফ সঞ্চিত হয়ে মৃগথুনী হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। এই হিমবাহ থেকে উৎসারিত সুন্দরডুঙ্গা নদী খাতি গ্রামের নীচে এসে পিণ্ডারী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। দেবলের কাছে কোয়েল গঙ্গা মিলিত হয়েছে পিণ্ডারী নদীর সঙ্গে। মৃগথুনী পর্বতের পশ্চিম গিরিশিরার ওপরে অনামী শৃঙ্গ (২০৭১৮′) ঢাল বেয়ে নেমে আসা বরফ বিদোয়ালগর হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। এই হিমবাহের স্নাউট থেকে উৎসারিত হয়েছে কোয়েল গঙ্গা। বিষ্ণু প্রয়াগ থেকে শুরু করে পিণ্ডারী গঙ্গাও অলকানন্দার সঙ্গম স্থলে কর্ণপ্রয়াগ

পর্যন্ত নদীর গতি মোটামুটি আস্তে, কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা খুবই কম। অবশ্য এই পথে নদীর বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর তটভূমি শস্যশ্যামল। কর্ণপ্রয়াগের পর অলকানন্দা প্রভূত জল সম্ভার সংগ্রহ করেছে রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর কাছ থেকে। পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের মন্দাকিনী—সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। এই নদী কেদারনাথ পর্বত ও তার গিরিশিরায় যুক্ত পর্বত থেকে নেমে আসা বরফ গলে উৎসারিত হয়েছে। এই বরফের ধারাই চোরাবারি হিমবাহ। চোরাবারি হিমবাহের অধিকাংশ বরফই যোগান দিয়েছে কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০′), ভারতখুন্টা পর্বত ২১ (৫৮০′)। এই হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো জড়ো হয়ে প্রাকৃতিক অবরোধের সৃষ্টি করেছিল। তার ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল সুদৃশ্য চোরাবারি তালের। সম্প্রতি এই হ্রদকে গান্ধী সরোবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অস্থিভস্ম এই হ্রদে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। চোরাবারি তাল থেকে উৎসারিত মন্দাকিনী শোণপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে বাসুকী গঙ্গার সঙ্গে। বাসুকী গঙ্গার উৎসস্থল—চোরাবারি হিমবাহের পশ্চিমে অবস্থিত বাসুকী তাল। কেদারনাথ মন্দির থেকে বাসুকী তালের দূরত্ব মাত্র তিন চার মাইল। শোণপ্রয়াগের পর মন্দাকিনী অবতরণ করেছে। অবতরণের মুখে গুপ্তকাশীর পাদদেশে মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে মন্দাকিনীতে। গুপ্তকাশীর পূর্বে নালা চটির পাদদেশে মন্দাকিনীতে মিলিত হয়েছে কালীগঙ্গা ও মান্দানী গঙ্গার সম্মিলিত জলধারা। কালীগঙ্গা ও মান্দানী গঙ্গার উৎসস্থল বিসাই—কৈয়ন ও মান্দানী হিমবাহ। এই সব হিমবাহ বরফ সংগ্রহ করেছে মহালয়া পর্বত (১৯৩৩৪′). সুমেরু পর্বত (২০৭৭০′), মান্দানী পর্বত (২০৩২০′) থেকে। মধ্যমহেশ্বর গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে কোন উল্লেখযোগ্য হিমবাহ নেই। তবে বদ্রীনাথ পর্বতমালার চতুর্থ শিখর (২২৪৮৫′) ও তৃতীয় শিখর (২২৮৪০′) থেকে নেমে আসা স্বল্প বরফ সংগৃহীত হয় মধ্যমহেশ্বর উপত্যকায়। সেখানকার লুপ্তপ্রায় হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় সৃষ্ট দুটি হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা। গুপ্তকাশীর পর থেকে মন্দাকিনী ধীরবেগে প্রবাহিত হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায়। রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকে অলকানন্দা প্রশস্ত হতে শুরু করেছে। শ্রীনগরে অলকানন্দা বেশ প্রশস্তা। পরে অবশ্য গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। অলকানন্দাকে পবিত্র নদী বলে মনে করেন তীর্থযাত্রীরা। কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চতম পর্বতমালা বিধৌত কয়েকটি

ধারার পুষ্ট হয়েছে এই নদী। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলোতে বার বার দেখতে পাওয়া যায় এই নদীর উল্লেখ। পরবর্তী যুগে অলকানন্দাকে গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন সংস্কৃত কবিগণ। যক্ষ রাজা কুবেরের বাসস্থান অলকাপুরী, সেই অলকাপুরী থেকে উৎসারিত পবিত্র নদী প্রবাহিত বদরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে। নদী প্রবাহের এ চিত্র সুদূর অতীত যুগের।

১. অলকানন্দা--

দৈর্ঘ্য (আনুমানিক) ১৮৫ মাইল/২৯৬ কিলোমিটার

উৎস স্থলের নাম অলকাপুরী

উৎস স্থলের উচ্চতা ১২৮৬০ ফুট

উৎস স্থলের হিমবাহ ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ দৈর্ঘ্য ১১.৫০ মাইল

সতোপন্থ হিমবাহ দৈর্ঘ্য ৯.৫০

ভাগীরথী খড়ক হিমবাহের স্নাউটের উচ্চতা—১২৯২৩ ফুট

সতোপন্থ হিমবাহের স্নাউটের উচ্চতা—১৫৩৫০ ফুট

দুইটি হিমবাহের ধারা ও বালাকুন পর্বতের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত বরফ গলা তৃতীয় ধারা এসে ১২৮৬০ ফুট উচ্চতায় মিলিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে অলকানন্দা।

২. অলকানন্দার মুখ্য শাখা নদী—

সরস্বতী নদী বা বিষ্ণুগঙ্গা—আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল।

উৎস স্থলের নাম—দেবতাল। উৎসস্থলের উচ্চতা—১৬৫৬৪ ফুট।

ধৌলীগঙ্গা আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৬৮ মাইল।

উৎস স্থলের নাম বা পরিচয়—গঙ্গোনোলী পর্বতের পাদদেশ।

উৎসস্থলের উচ্চতা—১৬৫০০ ফুট।

মন্দাকিনী আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল।

উৎসস্থলের পরিচয়। শৈলসমুদ্র-হিমবাহ স্নাউটের উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট।

পিণ্ডারগঙ্গা আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৪৫ মাইল।

উৎসস্থলের পরিচয়। পিণ্ডারী হিমবাহ—স্নাউটের উচ্চতা ১২০০০ ফুট।

মন্দাকিনী আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল।

উৎসস্থলের পরিচয়। চোরাবারি তাল—উৎসস্থলের উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট।

৩. অলকানন্দার সাধারণ শাখা প্রশাখা ও উৎস স্থল—

ঋষি গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৬ মাইল, উৎসস্থল নীলকণ্ঠ পর্বতের পূর্ব গাত্র। উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট।

ক্ষীর গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, উৎসস্থল পানপাতিয়া হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১২৬০০ ফুট।

ভ্যুইংডার গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, উৎসস্থল লরিবাক হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট।

কুবের গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৩ মাইল. উৎসস্থল কুবের হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৩৮০০ ফুট।

গরুড় গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২০ মাইল উৎসস্থল—

বিরেহী গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, উৎসস্থল বিহেরীতাল (অধুনা লুপ্ত)।

সরস্বতী নদীর মুখ্য প্রশাখাগুলি ও তার উৎসস্থল—

সুরজ নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১ মাইল, উৎসস্থল সুরজ হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৬৫৬৪ ফুট।

তারা নদী। আনুমাকিক দৈর্ঘ্য ½ মাইল, উৎসস্থল তারা হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৬১০০ ফুট।

আরোয়া নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল, উৎসস্থল আরোয়া তাল। উচ্চতা ১৬৫০০ ফুট।

বালবালা নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ½ মাইল, উৎসস্থল বালবালা হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৬৬৩০ ফুট :

চামরাও নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১ মাইল, উৎসস্থল চামরাও হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৫৫৫০ ফুট।

খুলিয়া গার্ভিয়া নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৩ মাইল, উৎসস্থল খুলিয়া গার্ভিয়া হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৩০০০ ফুট।

ধৌলী গঙ্গার মুখ্য শাখা প্রশাখা, দৈর্ঘ্য ও উৎসস্থল—

রাইকানা নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৮ মাইল, উৎসস্থল বসুধারা তাল। উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট।

গির্থি গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, উৎসস্থল উজাতিরচেঁ হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট।

দুনাগিরি গড়। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১০ মাইল, উৎসস্থল বাগিনী হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট।

ঋষি গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, উৎসস্থল নন্দাদেবী

হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট।

নন্দাকিনী নদীর শাখা প্রশাখা—

রূপ গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৫ মাইল, উৎসস্থল রূপকুণ্ড। উচ্চতা ১৬০০০ ফুট।

পিণ্ডারী গঙ্গার মুখ্য শাখা-প্রশাখা—

কাফিন গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, উৎসস্থল কাফনি হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১২০০০ ফুট।

সুন্দরডুঙ্গা নদী। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল, উৎসস্থল সুন্দর-ডুঙ্গা হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৪০০০ ফুট।

কোয়েল গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, উৎসস্থল বিদোয়াল গড় হিমবাহ। স্নাউটের উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট।

মন্দাকিনী নদীর শাখা-প্রশাখা—

বাসুকী গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল, উৎসস্থল বাসুকী-তাল। উচ্চতা

কালী গঙ্গা ও মান্দানী গঙ্গা। সম্মিলিত জলধারা সমেত আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, উৎস স্থল বিসাই, কিরণ ও মান্দানী হিমবাহ। হিমবাহ-গুলির স্নাউটগুলির উচ্চতা প্রায় ১৪৫০০ ফুট।

মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, উৎসস্থল—মধ্য মহেশ্বর, উপত্যকায় দুটি হ্রদ। উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট।

রুদ্রগঙ্গা। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল, উৎসস্থল—রুদ্রনাথ উপত্যকা থেকে উৎসারিত। উচ্চতা প্রায় ১৪৫০০ ফুট।

অলকানন্দাকে জলসম্ভারে পুষ্ট করে যেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়—

হিমবাহের নাম	দৈর্ঘ্য	স্নাউটের উচ্চতা	ভৌগোলিক অবস্থান
ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ	১১·৫০ মাইল	১২৯২৩ ফুট	গাড়োয়াল
সতোপন্থ হিমবাহ	৯·৫০ মাইল	১৩৩৫০ ফুট	,,
বিদ্যুম হিমবাহ	৩·৫০ মাইল	১৫৩৫০ ফুট	,,
বাগন্যু হিমবাহ	৪·০০ মাইল	১৩৯০০ ফুট	,,
কুবের হিমবাহ	২·০০ মাইল	১৩৩৮০ ফুট	,,
পানপাতিয়া হিমবাহ	৭·৫০ মাইল	১২৬০০ ফুট	,,
লরী বাঁক হিমবাহ	৪·০০ মাইল	১৩০০০ ফুট	,,
পিণ্ডারী হিমবাহ	৮·০০ মাইল	১২০০০ ফুট	কুমায়ুন

কাফ্‌নি হিমবাহ	৬'০০ মাইল	১২০০০ ফুট
শৈল সমুদ্র হিমবাহ	৬'০০ মাইল	১৪৫০০ ফুট
সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ	৩'০০ মাইল	১৪০০০ ফুট

সরস্বতী নদীকে জলসম্ভারে পুষ্ট করে যেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়—

হিমবাহের নাম	দৈর্ঘ্য	স্নাউটের উচ্চতা	ভৌগোলিক অবস্থান
সুরজি হিমবাহ	৫'০০ মাইল	১৬৫৬৮ ফুট	গাড়োয়াল
তারা হিমবাহ	৪'৫০ মাইল	১৬১৪০ ফুট	,,
আরোয়া হিমবাহ	৫'০০ মাইল	১৬৫০০ ফুট	,,
বালবালা হিমবাহ	৫'০০ মাইল	১৬৬৩০ ফুট	,,
চামরাও হিমবাহ	৬'০০ মাইল	১৫৫৫০ ফুট	,,
খাগিয়াম হিমবাহ	২'০০ মাইল	১৫৭৫০ ফুট	,,
পশ্চিম কামেট হিমবাহ	৯'০০ মাইল	১৪৮০০ ফুট	,,

হিমবাহের নাম	দৈর্ঘ্য	স্নাউটের উচ্চতা	ভৌগোলিক অবস্থান
উত্তর নাকথনী হিমবাহ	৫'৭৫ মাইল	১৪০২০ ফুট	গাড়োয়াল
আনাদেব হিমবাহ	৫'০০ মাইল	১৪৪০০ ফুট	,,
খুলিয়া গার্ভিয়া হিমবাহ	৭'০০ মাইল	১৩০০০ ফুট	,,

ধৌলী গঙ্গাকে জলসম্ভারে পুষ্ট করেছে সেসব হিমবাহ, সেগুলোর পরিচয়—

হিমবাহের নাম	দৈর্ঘ্য	স্নাউটের উচ্চতা	ভৌগোলিক অবস্থান
রাইকানা হিমবাহ	৬'০০ মাইল	১৫৫০০ ফুট	কুমায়ুন
উর্জাতিরচে হিমবাহ	৬'০০ মাইল	১৩৫০০ ফুট	,,
বাগিনী হিমবাহ	১০'০০ মাইল	১৫৫০০ ফুট	,,
কোসা হিমবাহ	৮'০০ মাইল	১৪৪০০ ফুট	,,
দক্ষিণ নন্দাদেবী হিমবাহ	১২ মাইল	১৫৫০০ ফুট	,,
দক্ষিণ ঋষি হিমবাহ	১২ মাইল	১৫৫০০ ফুট	,,
ত্রিশূল হিমবাহ	৮ মাইল	১৪৫০০ ফুট	,,

॥ ১৪ ॥

স্নাতানং শুচিভিঃ স্তোয়ৈ গাঙ্গেয়ৈ প্রযত্নাত্মানম ॥

মহাত্মাগণ নিষ্ঠাসহকারে গঙ্গাজলে অবগাহন করে স্তুতি করতেন। এই গঙ্গার উৎসস্থল পবিত্রতম তীর্থস্থান হিসেবে তাঁরা জানতেন। সেই সব মহাত্মাগণ পরবর্তীকালে গঙ্গার বন্দনা করেছেন বিভিন স্তবস্তুতির মাধ্যমে। কিন্তু এই পবিত্র গঙ্গার উৎস কোথায়? এ প্রশ্ন বার বার আমার মনে জেগেছে। গোমুখের সামনে বসে বসে এসব কথা ভেবেছি। বরফের গুহামুখ থেকে নির্গত জলধারা উচ্ছল শব্দে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গোত্রী পেরিয়ে। সেখান থেকে গভীর গিরিখাত বেয়ে কঠিন পর্বত গাত্রের পার্শ্বদেশ দিয়ে আছড়ে পড়ে অবতরণ করেছে নিম্ন উপত্যকায়। এই উচ্ছল জলধারার নাম ভাগীরথী। মহারাজা ভগীরথের স্মৃতিবিজড়িত এই পবিত্র জলধারা, একথা ভাবতেই আমার মন যেন সুদূর রামায়ণ মহাভারতের যুগে যেতে চায়।

পনেরো বছর ধরে প্রায় প্রতিবারই গঙ্গার কোন না কোন ধারা অনুসরণ করে উৎসের দিকে এগিয়ে গিয়েছি। কখনো কখনো বা উৎস মুখ পেরিয়ে চলে গিয়েছি উচ্চ হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে। সেখানে উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। অপরূপ গঠন প্রকৃতি, বিস্ময়কর নাম। সেই সব নামের উল্লেখ দেখেছি রামায়ণ মহাভারতে ও পুরাণাদিতে। মহাদেবের দর্শন পাইনি, তবে তাঁর নামে পর্বত শিখরগুলোর পদতলে বসে দর্শন করেছি। দিনের পর দিন অতিবাহিত করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সেই সব তুষারমণ্ডিত পর্বত শিখরগুলোর ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে অবিচ্ছিন্ন কঠিন বরফের ধারা। মহাদেবের জটাজালের মতই এই বরফের অবিচ্ছিন্ন ধারাগুলো সম্মিলিত হয়ে অবতরণ করেছে নিম্ন-উপত্যকায়। সেখানে কঠিন বরফ বিগলিত হয়ে জলধারার সৃষ্টি করেছে। এমনি একটি প্রধান ধারার নাম ভাগীরথী। এমনি আর একটি জলধারার নাম অলকানন্দা, ধৌলীগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, পিণ্ডারীগঙ্গা, সরস্বতী বা বিষ্ণুগঙ্গা। অলকানন্দার গতিপথ ধরে উৎসের দিকে যাবার সময় শুনতাম এই পবিত্র ধারার নাম গঙ্গা। দীর্ঘকাল অবস্থানকারী প্রাচীন সন্ন্যাসী—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম গঙ্গার উৎস কোথায়? মৌনী নগ্ন সন্ন্যাসী হেসেছিলেন আমার প্রশ্ন শুনে। সস্নেহে তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। তারপর ইশারায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। গঙ্গার উৎস গোমুখ, বরফে গুহার ভেতর থেকে দ্রবময়ী গঙ্গা প্রবাহিত

হয়েছে নিম্নাভিমুখে। গোমুখে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। গোমুখের ওপরেও তিনি দেখেছিলেন পবিত্র জলধারা। মৌনী সন্ন্যাসী গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করে তুষারাবৃত অঞ্চল দিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন সুউচ্চ গিরিপথ কালিন্দী খাল। সেই কালিন্দী খাল অতিক্রম করে অবতরণ করেছিলেন আরোয়া তাল। আরোয়া তালকে সবাই বলতো উবর্শী তাল। উবর্শী তালে অবস্থান করেছেন অনেকবার। গোমুখের উত্তর পূর্বে কোথায় সেই বিন্দু সর বা বিন্দু সরোবর, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী অবশ্য সে সরোবর দেখতে পাননি।

উবর্শী তাল থেকে উৎসারিত জলধারা অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী যেতেন সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে। সেখান থেকে সরস্বতীর ধারা অনুসরণ করে অবতরণ করতেন বদরানারায়ণে। গঙ্গার উৎস থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পেঁছে যেতেন বদরীনারায়ণে। বদ্রীনারায়ণ···ভগবান বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর পাদপদ্ম বিগলিত হয়েই গঙ্গার ধারা উৎসারিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী আঙুল দিয়ে লিখে বোঝাতে চাইতেন গঙ্গার কথা। দীর্ঘকাল ধরে তুষারাবৃত অঞ্চলে অবস্হান করতে করতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চলা-ফেরা করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। সুদূর অতীতকাল থেকে সাধুসন্ন্যাসীরা গঙ্গোত্রী দর্শন করে সোজা চলে যেতেন বদ্রীনারায়ণ। ১৯২৯ সনে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী গঙ্গোত্রী থেকে গিয়েছিলেন কৈলাস মানস-সরোবর। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তপোবন মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে প্রবাহিত ভাগীরথীর ধারা লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন এই ভাগীরথীই গঙ্গা। এই গঙ্গার প্রাচীন কাহিনী, প্রাচীন যুগের তীর্থযাত্রীদের বুকের মাঝখানে সযত্নে লালিত-পালিত হয়ে এসেছে। গঙ্গার অন্যান্য ধারাগুলির মধ্যে ভাগীরথীর মতো তেমন কোন প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত নেই।

কালের কোন হিসেব নেই। মহারাজা ভগীরথের কালের কোন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ এই সুদূর অতীতের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা সংযোজিত করতে পারেননি। তাই তাদের সংগৃহীত তথ্যাগুলি বিতর্কিত বিষয়। গোমুখের পাশে বসে বসে ভাগীরথীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনির মধ্যে কালের স্পন্দন শোন যায় না। তবু বলা যায়, গোমুখের ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহে প্রথম অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ। আজন্ম সুখে স্বচ্ছন্দে লালিত মহারাজ কেমন করে সুদূরে উত্তর প্রদেশের সমতল ভূমি থেকে পদব্রজে এসেছিলেন হিমালয়ের গভীরতম প্রদেশের বিপদসঙ্কুল

পার্বত্য অঞ্চলে। এই বিচিত্র অঞ্চল তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমনি বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে হয়তো বা তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তবু সেই যুগের ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে যথার্থ পথের সন্ধান খুঁজে বার করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্গম পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন উচ্চ হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতমালার পাদদেশে। সেখানকার বিস্ময়কর পর্বতশৃঙ্গগুলি, গিরিসঙ্কট, বিশাল তুষার ক্ষেত্র, মহারাজ ভগীরথ হয়তো বা সবই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ভূগোল বিজ্ঞানের এই সব বিস্ময়কর তথ্য ও দুঃসাহসিক অভিযান আজো রামায়ণ, মহাভারতে কাহিনীরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

গঙ্গার অবতরণ ক্ষেত্রের নাম গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী শব্দের অর্থ গঙ্গোত্তরী—গঙ্গার উত্তরণ। বরফাবৃত উচ্চ পার্বত্য ভূমি থেকে গঙ্গার অবতরণ। তুষারাবৃত হিমবাহের বরফ গলে জলধারারূপে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নির্গত জলধারার নাম গঙ্গা। গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গার ধারা আবিষ্কার করেছিলেন বলে এই ধারার নাম ভাগীরথী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক প্রাবরেখার অর্থাৎ হিমবাহের স্নাউট থেকে উৎসারিত হয়েছে ভাগীরথী। অধিকাংশ বড় বড় হিমবাহের স্নাউটেই বিস্ময়কর বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই দুর্গম পরিবেশের মধ্যে অপরূপ বরফের গুহামুখের সৌন্দর্য দর্শন করে সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রী হয়তো বা গুহামুখের নামকরণ করেছিলেন গোমুখ। গোমুখ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরুর মুখ। অর্থাৎ গরুর মুখাকৃতি বিশিষ্ট গুহা। গো-শব্দের অন্য অর্থ পৃথিবী। পৃথিবীর গুহামুখ থেকে যে পরম পবিত্র জলধারা নির্গত হয়েছে তার নামই গঙ্গা। গঙ্গা নাম···অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু গঙ্গোত্রী, গোমুখ—এই নামগুলো পরবর্তীকালের। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সামনে স্তূপীকৃত শিলারাশি দেখলে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সামনেই ভাগীরথী পর্বতমালার তিনটি তুষারাবৃত শিখর। সেগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ২২৪৯৫ ফুট, ২১৩৬৪ ফুট, ২১১৭৪ ফুট। এই পর্বতমালা গোমুখে পৌঁছবার পূর্বে চীরবাসা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। কে এই পর্বতমালার নামকরণ করেছিল জানা নেই। মহারাজা ভগীরথের নামকে স্মরণীয় করবার জন্যই এই পর্বতমালার নামকরণ। বিদেশী ভ্রমণকারীদের বহু পূর্ব থেকেই তীর্থযাত্রীদের কাছে অতি পরিচিত।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের মধ্যে হজসন সহযাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন

গোমুখ। গোমুখের সামনের পর্বত শিখরগুলোর নতুন করে নামকরণ করেছিলেন—সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু, সেণ্টপ্যাট্রিক্। গোমুখের সন্নিকটে খুব সম্ভব শিবলিঙ্গ পর্বত (২১৪৬৬ ফুট)-কে সেণ্ট ডেভিডরূপে নামকরণ করেছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের দেশে মিশনারী ধর্মপ্রচার করবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পায়নি। তার প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এ নামকরণ স্থায়ী হতে পারেনি। তৎকালীন ভারতীয় জরিপ বিভাগ অবশ্য এই নতুন করে নামকরণ গ্রহণ করেনি। কারণ, শিখরগুলোর প্রাচীন নাম বহুল প্রচলিত। এই সব নাম ও পরিচয় সুদূর অতীতকালের তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে ছিল ছড়ানো। দুর্গম পথ চলতে চলতে তীর্থযাত্রীরা যখন গোমুখে এসে পৌঁছে যেতেন, তখন তাঁরা প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হতেন। পথ চলতে চলতে শুনতাম কিম্বদন্তী, স্থানীয় কাহিনী। পথশ্রম, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যুভয় দূর হত। গঙ্গোত্রীর মন্দির পেরিয়ে পৌঁছে যেতেন অপার্থিব প্রাকৃতিক গুহামন্দির গোমুখ। সেই গুহামন্দিরের একমাত্র আরাধ্য দেবী গঙ্গা। সেই মূর্তিময়ী গঙ্গা যেন বরফের গুহামুখ থেকে নির্গত হয়ে অবতরণ করেছে মর্ত্যে মানুষদের পাপ তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অভাব অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্য।

সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে আসতেন গঙ্গার উৎস দর্শনের আশায়। বিভিন্ন সমতলভূমি, গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করে পুণ্যার্থীরা পৌঁছে যেতেন হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ, টিহরী ধরাসু। সবই পায়ে-হাঁটা পার্বত্য বন্ধুর পথ। ১৯৪৯ সন থেকে বাসরাস্তা ঋষিকেশ থেকে ধরাসু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল মোট ৬৬ মাইল। এই পথে টিহরী যেতে প্রথম ভাগীরথীর দর্শন হত। সেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভীলগঙ্গা। সঙ্গমস্থলের নাম গণেশ প্রয়াগ। ছোট্ট মন্দির রয়েছে সেখানে। ধরাসুর পর পায়ে-হাঁটা পথ শুরু হত। ধরাসুর পর নাকোরি। নাকোরিতে পরশুরাম জননী রেণুকা দেবীর মন্দির। কেউ কেউ বলেন এই স্থানে পরশুরাম মাতৃ-হত্যা করেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীগুলোর ভৌগোলিক পরিচয় খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তবে রেণুকাদেবীর মন্দিরের জীর্ণ দশা দেখলে মনে হয় পদযাত্রা সংক্ষিপ্ত হবার পর যাত্রীরা ভুলে যেতে শুরু করেছেন। প্রাচীন যুগের তীর্থযাত্রীরা এই সব স্থানে রাত্রিবাস করতেন, মন্দির দর্শন করতেন। কাহিনীর সঙ্গে স্থানের চিত্র মনে গেঁথে থাকতো। নাকোরির পরই উত্তরকাশী। উত্তরের কাশী বা বারাণসী। উত্তরকাশীর

মাইল দুয়েক পূর্বে ছোট্ট জলধারা এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই ধারার নাম বরুণা। উত্তরকাশী পেরিয়ে মাইল দুয়েক পথ চলেই দেখা যাবে, একটি ছোট্ট জলধারা এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই জলধারার নাম অসি। এই অসি ও বরুণা উত্তরকাশীকে যেন বেষ্টন করে রয়েছে। বারাণসীতে যেমন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বরুণা ও অসিনদী, উত্তরের উত্তরকাশীতে ঠিক তেমনি। ভাগীরথীর তীরবর্তী এই উত্তরকাশী, অতীতকাল থেকেই পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত। সেখানে রয়েছে বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির। এছাড়া রয়েছে প্রাচীন কালীমন্দির, পরশুরাম মন্দির, একাদশ রুদ্রের মন্দির। উত্তরকাশীর পর ছোট্ট জনপদ মানেরি। মানেরি থেকে ১৮ মাইল দূরে সুদৃশ্য হ্রদ রয়েছে। তার নাম ডোরিতাল। এই ডোরিতাল থেকেই উৎসারিত হয়েছে অসি-নদী। উত্তরকাশীর পর প্রধান জনপদ ভাটোয়ারী। ভাটোয়ারীর অপর নাম ভাস্কর প্রয়াগ। জলনদী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে ভাস্কর প্রয়াগ। কথিত আছে—ভাস্কর এখানে শিবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে আলোকেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিছিলেন। এই শিবলিঙ্গ চুরাশী লিঙ্গের অন্যতম। ভাটোয়ারী থেকে ৯ মাইল দূরে গাঙ্গনানী। শীতল ভাগীরথীর জলধারার পাশেই রয়েছে ব্যাসকুণ্ড ও বশিষ্টকুণ্ড নামে দুটি তপ্ত কুণ্ড। এই কুণ্ড দুটির মিলিত নাম ঋষিকুণ্ড। ঋষিকুণ্ডের উপচে পড়া তপ্ত জল মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর বুকে। গাঙ্গনানীর পর চার মাইল দূরে লোহারিনাগ। সেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শোনগঙ্গা। লোহারিনাগের পর পথ ধীরে ধীরে সুখীর চড়াই-এ এসে পেঁছে গিয়েছে। সুখীর পর অবতরণ—ঝালা তারপর হারসিল বা হরি-প্রয়াগ। শ্যামগড় বা শ্যামগঙ্গা ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে হরি-প্রয়াগে। হরিপ্রয়াগের পর ধারালী। ধারালীতে দুধগঙ্গা এসে পতিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সঙ্গমের মুখে প্রাচীন শিব মন্দির আজো অর্ধ প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ধারালীর ওপরে দুধগঙ্গার ধারা অনুসরণ করলে পেঁছে যাওয়া যায় শ্রীকান্ত পর্বতের (২০১২০ ফুট) পাদদেশে। সেখানে শ্রীকান্ত পর্বত শিখরের গাত্র থেকে নেমে আসা বরফ গলে দুধগঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে। অবশ্য শোনা যায় শ্রীকান্ত পর্বতের পাদদেশে মহারাজা ভগীরথ কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। অবশ্য এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ কাহিনী অতীতের অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের প্রচলিত কাহিনী।

ধারালীর পর জাংলা, তারপর জাহ্নবী গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থল

ভৈরবঘাটি। সেখানে অবস্থিত রয়েছে ভৈরবের মন্দির। পাইন আর চীর গাছের ছায়ায় অপরূপ পরিবেশের মধ্যে ভৈরবঘাটি যেন পদযাত্রীদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। ভৈরবঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র ছয় মাইল পথ। সমস্ত পথই প্রায় সমতল। চড়াই উৎরাই খুবই সামান্য। পাইন, চীর আর দেওদার গাছের ছায়ায় ছায়ায় এই পথ যেন কখন ফুরিয়ে যায়। ধরাসু থেকে এমনি করে ৭৫ মাইল পথ অতিক্রম করে পেঁছে যেতেন তীর্থযাত্রীরা গঙ্গোত্রী। ১৯৬০ সনে বাস রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল উত্তর-কাশী পর্যন্ত। ১৯৬৪ সনে বাস রাস্তা চলে গিয়েছিল ভাটোয়ারী পর্যন্ত। দু'বছর পর বাস রাস্তা আরো এগিয়ে গিয়েছিল ঝালায়। ১৯৬৮ সনে বাসপথ হারসিল পর্যন্ত। ১৯৬৯ সনে ধারালী। ১৯৭২ সনে ধারালী পেরিয়ে জাংলার পর লংকা পর্যন্ত। জাহ্নবী গংগার খাড়া গিরিখাদের ওপরে একপারে লংকা, জাহ্নবী গংগার ওপারে ভৈরবঘাটি। পারাপারের সেতু আজো বানানো হয়নি বলে যাত্রীদের লংকা থেকে উৎরাই পথ পেরিয়ে যেতে হয় জাহ্নবী গঙ্গার তটভূমিতে। নদী পেরিয়ে চড়াই ভেঙ্গে পেঁছে যেতে হয় ভৈরবঘাটি। ভৈরবঘাটিতে অত্যুৎসাহী বাস মালিক একটি বাসের মেসিন খুলে প্রতিটি অংশ কুলির মারফত লংকা থেকে ভৈরবঘাটি পেঁছে নিয়ে গিয়েছিল। পরে সব অংশ জুড়ে পুরো বাস চালু করেছিল ভৈরবঘাটি থেকে গংগোত্রী।

গংগোত্রী থেকে গোমুখের প্রাচীন পথ দুর্গম ছিল। সেই পথ আজ অচল, শুধুমাত্র সাধু সন্নাসীরা মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঠিয়া বানিয়ে রেখেছেন। গংগোত্রী থেকে চীরবাসা একদিনের পথ ছিল। চীরবাসায় পুরনো ধর্মশালা আজও বর্তমান। আজকের চীরবাসায় চীর গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটি বনবিভাগের ঘর রয়েছে। তীর্থযাত্রীরা চীরবাসায় অবস্হান না করে সোজা চলে যান ভুজবাসায়। সেখান থেকেই দেখা যায় গোমুখ। প্রায় আড়াই মাইল দূরে বরফের গুহামুখ থেকে ভাগীরথী নৃত্যভংগে প্রবাহিত। সামান্য পথ পেরিয়ে গোমুখের সামনে প্রতিদিনই বসে থাকতে ভালো লাগতো আমার। সূর্য প্রখর হত, একটানা হিম-শীতল বাতাস আসতো বরফের গা ছুঁয়ে। গোমুখের গুহা থেকে অব্যক্ত ধ্বনিতে জলধারা যেন নির্গত হত সুড়ংগ পথে। সুড়ংগ পথের বেশ কিছু দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় ভালভাবে লক্ষ্য করলে। মাঝে মাঝে গুহামুখ থেকে বরফের খণ্ড ভেঙে খসে পড়তো ভাগীরথীর বুকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এই ভাগীরথীর জল। এই জল তুলে কোন পাত্রে রাখলেই ওপর দিকটা জমে যেতে শুরু করে।

গোমুখ পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌঁছে যেতে হলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঁচুনীচু শিলাস্তূপ পেরুতে হয়। এইসব শিলাস্তূপের নীচে কঠিন বরফ। গঙ্গোত্রী হিমবাহ পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। গোমুখের কাছাকাছি এসে হিমবাহ উত্তর-পশ্চিম হয়ে সোজা পশ্চিমে এসেছে। এই হিমাবাহের দৈর্ঘ্য ষোল মাইল. প্রস্থে দুই থেকে তিন মাইল। হিমবাহের উৎপত্তি স্থানের উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফুট। সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ স্নাউট ১২,৭৭০ ফুট। এই হিমবাহের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গগুলি নিরন্তন বরফের যোগান দেয়। এ ছাড়াও অনেকগুলো শাখা হিমবাহ অসংখ্য তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গ থেকে বরফ সংগ্রহ করে মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়।

বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিচিত্র পর্বত শৃঙ্গগুলি মিলিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। সুদূর অতীত যুগের তীর্থ-যাত্রীরা এই হিমবাহের স্নাউট দর্শন করতে আসতেন। সঠিক কতকাল পূর্ব থেকে এই তীর্থযাত্রার প্রচলন ছিল, সে তথ্য আজো অজ্ঞাত। ১৮১৭ সন থেকে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত প্রতি বছরই প্রায় ষাট হাজার তীর্থযাত্রী সমাগম হত।

মেজব রেনেল অবশ্য এইসব তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে গোমুখ সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি গোমুখের কথা, বরফে গুহা ও তার আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। হজসন ও মারথমের পর ১৮৯১ সনে গ্রেইচ্‌ব্যাচ্ গোমুখ দর্শন করে তার একটি মোটামুটি রেখাচিত্র অংকন করেছিলেন। অবশ্য উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় জরিপকার্য শুরু হয়েছিল ১৮৭১-১৮৭৪ সনে। জরিপকারীরা নদীর উৎসস্থল ও তৎসংলগ্ন তুষারাবৃত পর্বত শৃঙ্গগুলোর উচ্চতা নির্ধারণ, হিমবাহগুলোর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছিল। ১৯০৬ সনে হিমালয়ের সমস্ত হিমবাহগুলির সমীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে কুমায়ুন অঞ্চলের পিণ্ডারী, পোটিঙ্ ও মিলাম হিমবাহের গতি-প্রকৃতি শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি নানা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমীক্ষার প্রস্তাব হয়তো বা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাবের জন্যই এই ধরনের সমীক্ষা বা জরিপকার্য স্থগিত হয়েছিল উপযুক্ত অর্থের অভাবে। তবে ১৯৩১ সন থেকে উচ্চ হিমালয়ে জরিপকার্যের জন্য অর্থের সংস্থান হয়েছিল। অবশ্য ১৯০৫-১৯০৭ সনে প্রখ্যাত অভিযাত্রী, ভূগোল তত্ত্ববিদ্‌গণ হিমালয়ের গভীরে অভিযান পরিচালনা শুরু করে-ছিলেন। অবশ্য গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে কোন পর্বত অভিযান সেই

সময় পরিচালিত হয়নি। অভিযাত্রীদের দৃষ্টি ছিল ধৌলী উপত্যকা, নন্দাদেবীর পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি।

॥ ১৫ ॥

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা"।

নিম্নাভিমুখী প্রবাহিত ধারাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধারার নাম গঙ্গা। তুষারাবৃত পর্বত শিখর থেকে এই শ্রেষ্ঠ ধারার উত্তরণ হয়েছিল কোন এক সুদূর অতীত যুগে। সে যুগের এই ভৌগোলিক ঘটনা কাব্যে ও পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠ জলধারা ছিল কঠিন বরফের ধারারূপে উত্তরণের পূর্ব অবস্থায়। গঙ্গার এই তুষারাবৃত ধারার নাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ। কবে কোন সুদূর অতীতকালে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে গঙ্গার উৎস বলে সারা ভারতের জনমানসের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল, তার ইতিহাস নেই। হিমবাহকে বরফের নদী বলা চলে। ভূগোল বিজ্ঞানীরা হিমবাহ সম্পর্কে বলেন—

"Glaciers are rivers of ice which collect in the ravains and valleys of the high snow peaks and ranges and which move slowly downwards until they reach the point where their ice melts."

হিমবাহের বরফ সঞ্চিত হয় উচ্চ তুষারাবৃত পর্বত শিখরে, গিরি-খাতের মধ্যে ও উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায়। তুষারপাতের ফলে সঞ্চিত বরফ ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে ধীর বেগে অবতরণ করতে থাকে। এই অবিচ্ছিন্ন বরফের ধারা নির্দিষ্ট বেগে উচ্চ বন্ধুর উপত্যকা থেকে অপেক্ষাকৃত ঢালু উপত্যকায় প্রবাহিত হতে থাকে। অবশেষে প্রবহমান বরফের ধারা নিম্ন উপত্যকায় পৌঁছেই গলতে শুরু করে।

ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেন—

"The lower end of a Glacier is known as its snout and at its snout there is an ice cave from which water issues. The changes from ice to water marks the source of a river, every such ice cave is a source of a river."

হিমবাহের সর্বশেষ প্রান্তের নাম স্নাউট। সেখানে বরফের গুহা

দেখতে পাওয়া যায়। এই গুহা থেকেই উৎসারিত হয় জলধারা। হিমবাহের যে স্থানে বরফের গুহায় বরফ গলে জলধারারূপে প্রবাহিত হতে থাকে, সেই বরফ গলা জলধারাই নদীর উৎসরূপে চিহ্নিত হয়। হিমবাহের শেষ প্রান্তে বরফের গুহামুখ থেকেই নদীর জন্মলাভ হয়ে থাকে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউটে বৃহৎ বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ গুহা মুখের অতি পরিচিত নাম গোমুখ। সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা গঙ্গার উৎস দর্শনের জন্য জীপন বিপন্ন করেও আসতেন দুর্গম পথ অতিক্রম করে। হিমালয় পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছে ছোট বড়, মাঝারি ধরনের অসংখ্য হিমবাহ। ছোট ছোট অসংখ্য হিমবাহগুলি পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার গা বেয়ে নদীর ধারার মতো প্রবাহিত হয়। এইসব প্রবহমান বরফের ধারাগুলো অবতরণের পথে বৃহৎ কোন হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়। হিমবাহগুলির আকৃতি প্রকৃতি বিচার করে ভূগোল বিজ্ঞানীরা দু ধরনের হিমবাহের উল্লেখ করেছেন। বড় বড় দীর্ঘ হিমবাহগুলোকে (Longittudinal glacier) লংগিচুডিনাল হিমবাহ বলা হয়। এই সব দীর্ঘ হিমবাহ প্রধান প্রধান গিরিশ্রেণীর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। ছোট ছোট হিমবাহগুলির নাম ট্রান্সভার্স হিমবাহ (Transverse glacier)। দীর্ঘ হিমবাহগুলির স্নাউটে অপরূপ বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বিখ্যাত হিমবাহগুলির সবই অবশ্য হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয় না। এই সব দীর্ঘ হিমবাহগুলির স্নাউট সমুদ্রতল থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত। বিখ্যাত হিমবাহগুলির দৈর্ঘ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, স্নাউটের অবস্থানের পরিচয় দেখানো হল।

হিমবাহের নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	হিমবাহের দৈর্ঘ্য মাইল	কিলোমিটার	স্নাউটের অবস্থান (উচ্চতা) ফুট	মিটার
ফেড্ চেঙ্কো	ট্রান্স-আলতাই	৪৮	৭৬·৮০	৯৮৮০′	৩০০০
সিয়াচেন	কারাকোরাম্	৪৫	৭২·০০	১২১৫০′	৩৭০০
ইনিল্চেক্	তিয়েন্সান	৪৪	৭০·৪০	৯১০০′	২৭৫০
হিস্পার	কারাকোরাম্	৩৮	৬০·৮০	১০[illegible]০০′	৩২০০
বিয়াফো	কারাকোরাম্	৩৭	৫৯·২০	১০৩৬০′	৩১০০
বালতোরা	কারাকোরাম	৩৬	৫৭·২০	১১৫৮০′	৩৫০০
বাতুরা	হিন্দুকুশ	৩৬	৫৭·২০	৮০৩০′	২৪৫০
কাইকাফ্	তিয়েনসান্	৩১	৪৯·৩০	১১৩০০′	৩১২০

এইসব হিমবাহগুলির স্নাউট থেকে কিন্তু বৃহৎ নদীর সৃষ্টি হয় নি। দীর্ঘ হিমবাহগুলির মধ্যে সিয়াচেন, হিস্পার, রিয়াফো, বালতোরা ও বাতুরা হিমবাহগুলির স্নাউট থেকে বরফ গলে যথাক্রমে নুব্রা, নুঙ্গা ও সিগার নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এইসব নদীগুলি মূলতঃ সিন্ধু নদে মিলিত হয়ে সিন্ধুকে পুষ্ট করেছে।

বুরার্ডের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে আফগানিস্থান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা থেকে বাইশটি ছোট ও বড় নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে সিক্ত ও সরস করেছে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাইশটি নদ-নদীর মধ্যে প্রধান তিনটির দৈর্ঘ্য বিচার করা যেতে পারে।

উৎস স্থান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত এই ধারাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ঃ—

সিন্ধু নদ	মোট দৈর্ঘ্য	১৮০০ মাইল/২৮০০ কিলোমিটার
ব্রহ্মপুত্র নদ	মোট দৈর্ঘ্য	১৮০০ মাইল/২৮০০ কিলোমিটার
গঙ্গা নদী	মোট দৈর্ঘ্য	১৬০০ মাইল/২৫৬০ কিলোমিটার

তুষারাবৃত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভূত নদ-নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। এইসব জলধারা যতটা অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত সেই অঞ্চলের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করলে দেখা যায় যে, সিন্ধু নদ হিমালয়ের প্রায় ১,০৩,৮০০ বর্গমাইল পরিমিত পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ৯১৩০০ বর্গমাইল ও গঙ্গা নদী প্রায় ৮৯০০ বর্গমাইল পরিমিত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ফলে এইসব ধারাগুলির বাৎসরিক জল নিঃসরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল। সেই হিসাবে জলধারাগুলির জল নিঃসরণের আনুপাতিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছিল ইরাবতী নদীর জল নিঃসরণের পরিমাণকে একক হিসাব করে।

ইরাবতী বা রাভী নদীর জল নিঃসরণের আনুপাতিক পরিমাণ	১
সিন্ধু নদ	০.৩৩
ব্রহ্মপুত্র নদ	০.৫০
গঙ্গা নদী	১.৬০

অর্থাৎ ইরাবতীর জল নিঃসরণের তুলনায় সিন্ধুনদের জল নিঃসরণের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের চাইতেও কম, ব্রহ্মপুত্রের পরিমাণ অর্ধেক। কিন্তু

গঙ্গানদীর জল নিঃসরণের পরিমাণ দেড়গুণেরও বেশী। এই হিসাবে উচ্চ হিমালয়ে প্রবাহিত গঙ্গার জল নিঃসরণের পরিমাণ সিন্ধুনদের জল নিঃসরণের পাঁচ গুণেরও বেশী।

উৎস থেকে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবাহিত গঙ্গার জলসম্ভার সিন্ধুর চাইতেও অনেক বেশী বলে গাঙ্গেয় উপত্যকা সরস হয়েছে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার বিশাল অংশকে সিক্ত করে সরস করবার মতো পরিমিত জল সম্ভারের অভাবেই কি সুদূর অতীত যুগের সিন্ধু সভ্যতা ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে?

আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর, জনপদ সৃষ্টির পেছনে এ ধরনের যুক্তি থাকতে পারে। বৈদিক যুগের মানুষ সিন্ধুর গুণগান করেছিলেন। ঋগ্বেদের নদী সূক্তে তার স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের পরই সরস্বতী নদীর স্থান পেয়েছিল বৈদিক যুগে। এই নদীর অববাহিকা আম্বালা ও পাতিয়ালার বিভিন্ন অংশে সে যুগের আর্য সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বে। সরস্বতী নদীর উৎস স্থলে হয়তো বা তেমন কোন বিশাল হিমবাহ না থাকায় নদীর জলপ্রবাহ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। উপযুক্ত জলসম্ভারের অভাবে অববাহিকা শুষ্ক হয়ে, মরুভূমি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। কাল-ক্রমে এই নদীর জলধারা হারিয়ে গিয়েছিল। আর্যগণকে তাই এগিয়ে যেতে হয়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়। সরস্বতী সভ্যতার তথ্য পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে। কিন্তু গাঙ্গেয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ আজও বর্তমান। গঙ্গার অপরূপ জলসম্ভার, অববাহিকাকে সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা, সমৃদ্ধ-শালী করে তুলেছে। গঙ্গার বিগলিত স্নেহধারা অব্যাহত রেখেছে হিমালয়ের তুষার সম্পদ। অপরিমিত তুষার সঞ্চিত হয়ে রয়েছে হিমালয়ের হিমবাহগুলিতে। সেইসব হিমবাহগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় মাত্র ৮৯০০ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গার জলধারা প্রবাহিত। এই অঞ্চল উৎস স্থান থেকে হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। ১৮০৭ সনে সার্ভেয়র জেনারেল অফ্ বেঙ্গল সর্বপ্রথম গঙ্গার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রথম অভিযান পরিচালনা করেছিল। ১৯০৭ সনে ঠিক একশত বৎসর পর গঙ্গার উৎস, উচ্চ হিমালয় সম্পর্কে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল একক ভ্রমণকারী ও অনুসন্ধানীদের প্রচেষ্টায়। ১৯০৬ সনের মে মাসে সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার

বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক অ্যাডভাইসরের সভায় সংগৃহীত সমস্ত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ১৯০৭ সনে ভূগোল-বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে বিশাল হিমালয়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

আসাম হিমালয়	ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।	উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, আসাম ভুটান সিকিম পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ গিরি-শ্রেণী।
নেপাল হিমালয়	তিস্তা নদী থেকে কালী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।	নেপাল থেকে কুমায়ুন সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ৫০০ মাইল দীর্ঘ গিরি-শ্রেণী।
পাঞ্জাব হিমালয়	শতদ্রু নদী থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।	হিমাচল, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হিমালয়ের ৩৫০ মাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণী।

কুমায়ুন, গাড়োয়াল হিমালয়ে মাত্র ৮৯০০ বর্গমাইল জুড়ে গঙ্গার জলধারা প্রবাহিত। উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। আর সেইসব পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফ অসংখ্য ছোট বড় হিম-বাহের সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট হিমবাহগুলি মিলিত হয়ে বৃহৎ হিমবাহে পরিণত হয়েছে। এইসব বৃহৎ হিমবাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিমবাহের নাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ। ভাগীরথীর পূতঃ জলধারা নিঃসারিত হয়েছে এই হিমবাহের বরফ থেকেই। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত এই জল-ধারার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারিত করেছিলেন মহারাজা ভগীরথ।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল বা ২৫·৬০ কিলোমিটার, প্রস্থে ৩ মাইল বা ৪·৮০ কিলোমিটার। কোন কোন ভূগোল-বিজ্ঞানীদের মতে এই হিমবাহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ মাইল বা ২৮·৮০ কিলোমিটার। ১৯২০-২৪ সন ও ১৯৩৬-৩৭ সনের জরিপ-বিভাগের মানচিত্র (Topo Sheet) অনুসারে হিমবাহের দৈর্ঘ্য ১৬ মাইলের চাইতে বেশী বলে মনে হয়। এই দীর্ঘ হিমবাহকে বরফ সংগ্রহ করে ছোট ও মাঝারি হিমবাহগুলি। এইসব শাখা হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলো তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ থেকে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সব চাইতে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বদ্রীনাথ বা চৌখাম্বা। চৌখাম্বার চারটি শিখরের উচ্চতা যথাক্রমে ২৩৪২০ ফুট, ২৩১৯০ ফুট, ২২৮৮০ ফুট ও ২২৪৮৫ ফুট। চৌখাম্বা পর্বতমালার

প্রথম ও দ্বিতীয় শৃঙ্গের সঞ্চিত বরফের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পর্বতগাত্রের পশ্চিমের ঢাল বেয়ে অবতরণ করেছে প্রায় ২০000 ফুট উচ্চতায়। অবতরণের সময় খাড়া ঢালের মুখে বিশাল হিমপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই হিমপ্রপাত প্রায় ১৮000 ফুট পর্যন্ত নেমে এসে দীর্ঘ হিমবাহের সূচনা করেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ সৃষ্টির প্রারম্ভিক ভূমিকা একে বলা যেতে পারে। এই হিমবাহ প্রবাহিত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ পাশের গিরিশিরার গা ঘেঁষে। হিমবাহ যাত্রার দীর্ঘপথ সমাপ্ত হয়েছে ১২৭৭০ ফুট উচ্চতায়। সেখানে বরফ গলে জলধারা রূপে প্রবাহিত হয়েছে।

চৌখাম্বা পর্বতের প্রথম শিখরের উত্তর গিরিশিরা এগিয়ে গিয়েছে। গিরিশিরায় ওপরে প্রথমেই দেখা যাবে ২২৩২৯ ফুট, ২১৯৫0 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি পর্বতশৃঙ্গ। পর্বতশৃঙ্গ দুটির সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ পশ্চিমগাত্র বেয়ে নেমে এসে ছোট শাখা হিমবাহের সৃষ্টি করেছে। হিমবাহটির নাম মৈয়ান্দি। পর্বতশৃঙ্গ দুটির সর্বোচ্চটিকে মৈয়ন্দি পর্বত বলা উচিত ছিল। হয়তো শিখরটি পূর্বগাত্র বেয়ে বেশ কিছু পরিমাণ বরফ ভগীরথ খড়ক হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে বলে পর্বতশিখরের নামকরণ হতে পারেনি। মৈয়ান্দি হিমবাহটি ছোট্ট। টোপোসীটে অবশ্য মৈয়ান্দি বামক লিপিবদ্ধ আছে। এই বামক বেশ কিছু পরিমাণ বরফ সংগ্রহ করে ১৬৮00 ফুট উচ্চতায় গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়েছে।

মৈয়ান্দি বামকের পরই স্বচ্ছন্দ বামক। স্বচ্ছন্দ পর্বত (২২০৫৯′) শিখর থেকে বরফ নেমে এসে ছোট হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছে। স্বচ্ছন্দ পর্বতের উত্তর গিরিশিরায় অবস্থিত অনামী শৃঙ্গ (২১৯১0′)। এই শিখরদেশের সঞ্চিত বরফ এসে পুষ্ট করেছে স্বচ্ছন্দ বামককে। এই বামক মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়েছে ১৬১২0 ফুট উচ্চতায়। চৌখাম্বা পর্বতমালার তৃতীয় ও চতুর্থ শিখর (২২৮৪0′ ও ২২৪৮৫′) থেকে সংগৃহীত বরফের বেশী অংশই গঙ্গোত্রী হিমবাহেই সঞ্চিত রয়েছে। হিমবাহের দক্ষিণ পার্শ্বের গিরিশিরায় ওপরে অবস্থিত মান্দানী পর্বত (২0৩২0′)। মান্দানীর পশ্চিম গিরিশিরায় রয়েছে অনামী শৃঙ্গ ১৯৫৬0 ফুট, ও ১৯৫৩0 ফুট। এই শৃঙ্গের গিরিশির পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই গিরিশিরার ওপরেই অবস্থিত সুমেরু পর্বত (২0৭৭0′)। এই সব পর্বতশিখরে সঞ্চিত বরফের বেশী অংশই দক্ষিণ দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে মধ্যমহেশ্বর উপত্যকায়। গিরিশিরার উত্তর গাত্রের সামান্য বরফই মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে।

মান্দানী পর্বত থেকে শুরু করে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত মোট চারটি পর্বত-শিখরের সঞ্চিত স্বল্প বরফ কোন হিমবাহের সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বচ্ছন্দ বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে মূল হিমবাহের গতি পরিবর্তিত হয়েছে উত্তর থেকে উত্তর পশ্চিমে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ-উৎস স্থান থেকে স্বচ্ছন্দ বামকের সঙ্গে সঙ্গম স্থল পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় মাইল। এই অংশের ঢাল ১৮০০০ ফুট থেকে ১৬১২০ ফুট পর্যন্ত অর্থাৎ ২১২০ ফুট। হিমবাহের বিস্তার এই স্থানেই তিন মাইলের মতো। বরফের গভীরতা বেশী, গ্রাবরেখার পাথর কোথায়ও দৃশ্যমান নয়। উৎস স্থান থেকে মৈয়ান্দি বামকের সংযোগ স্থল পর্যন্ত ঢাল বেশী বলে বরফের ফাটল দেখা যায়। স্বচ্ছন্দ বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থলে মধ্য গ্রাবরেখার মধ্যে দেখা যাবে দু তিনটে হিম সরোবর (মুল্যা)। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ পার্শ্বে স্বচ্ছন্দ হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে গণহিম্ বামক। গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিত হয়েছে ১৫৫০০ ফুট উচ্চতায়। স্বচ্ছন্দ বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল (১৬১২০′) থেকে এই স্থল পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচ মাইল। এই পথ অতিক্রম করতে হিমবাহকে ৬২০ ফুট ঢালে অবতরণ করতে হয়েছে। গণহিম্ বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থলের মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো যেন বরফের আস্তরণ পেরিয়ে দৃশ্যমান। গণহিম্ বামকের মধ্য গ্রাবরেখায় ছোট বড় হিম সরোবর দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থান থেকেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ ধীর বেগে পশ্চিম উত্তর দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। প্রায় মাইল চারেক পথ পরিক্রমার পথ গঙ্গোত্রী হিমবাহ মিলিত হয়েছে দক্ষিণ দিক থেকে আসা কীর্তি বামক। সঙ্গম স্থলের উচ্চতা ১৪৮০০ ফুট। কীর্তিস্তম্ভ শিখর যুগল (২০৫২৯′ ও ২০৫১০′) থেকে নেমে আসা বরফ থেকেই কীর্তি বামকের সৃষ্টি। অবশ্য কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০′) কেদারনাথ স্তম্ভ (২২৪১০′), ভারত ঘুণ্টা পর্বতের (২১৮৫০′) সঞ্চিত বরফের বেশ কিছু অংশ কীর্তি বামকে মিলিত হয়েছে। এছাড়াও ভৃগুপন্থ পর্বতের (২২২১৮′) সঞ্চিত বরফের কিছু অংশ এসে মিলিত হয়েছে কীর্তিবামকে। কীর্তিবামক গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে মূল হিমবাহ বরফে পুষ্ট হয়ে দ্রুত অবতরণ করেছে পথ যাত্রার সমাপ্তির মুখে। মাত্র তিন মাইল পথ অর্থাৎ ১৪৮০০ ফুট থেকে ১২৭৭০ ফুট—২০৩০ ফুট অবতরণ। দ্রুত উত্তরণের মুখে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের অবিচ্ছিন্ন ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে চুরমার

হয়েছে। সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল ফাটলের। আর সেই ফাটলের মাঝে মাঝে জমা হয়েছে স্তূপীকৃত পার্শ্ব গ্রাবরেখার পাথরগুলো। মাঝে মাঝে হিমবাহের মধ্যে হিম সরোবর দেখতে পাওয়া যায়। কীর্তিবামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্হলের পরেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ সোজা পশ্চিমাভিমুখে অবতরণ করেছে ১২৭৭০ ফুট উচ্চতায়। এই স্হানেই তুষার সীমার রেখা। বিশাল বরফের গুহার ভেতর থেকে বরফ গলা জল দুর্বার বেগে বেরিয়ে এসে ভাগীরথীর সৃষ্টি করেছে। কীর্তিবামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম স্হল থেকে হিমবাহের অন্তিম পর্যায়ে বরফের ওপরে স্তূপীকৃত পাথর অসংবদ্ধভাবে ছড়ানো। ছোট বড় অজস্র পাথরের প্রবাহ ঢেউ খেলানো। যতদূর দৃষ্টি পড়ে ততদূরই যেন এই বিস্ময়কর দৃশ্য।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ পর্যায়ে পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে দুটো বড় বড় শাখা হিমবাহ এসে মিলিত হয়েছে। এই হিমবাহ দুটির নাম চতুরঙ্গী হিমবাহ ও রক্তবরণ হিমবাহ। চতুরঙ্গী হিমবাহ প্রায় আটমাইল দীর্ঘ। হিমবাহের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্ব দিয়ে ছোট ছোট হিমবাহ এসে চতুরঙ্গীকে পুষ্ট করেছে। চতুরঙ্গীর দক্ষিণ পাশের প্রথম শাখা হিমবাহ বাসুকী বামক। বাসুকী পর্বত (২২২৮৫′) ও অন্যান্য অনামী শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফ থেকেই এই ছোট বামকের সৃষ্টি। এই বামক প্রায় ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় চতুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চতুরঙ্গী হিমবাহ থেকে বাসুকী বামকের সঙ্গম স্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। বাসুকী বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্থল থেকে মাইল দেড়েক দূরে সুন্দর বামক ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সঙ্গম স্হল। চতুরঙ্গী হিমবাহের শাখাগুলির মধ্যে এইটিই সব চাইতে দীর্ঘ। সতোপন্থ পর্বত (২৩২১০′) ও অন্যান্য অনামী শৃঙ্গ (২২২২১′, ২২২১৮′), ভাগীরথী (১) (২২৪৯৫′) পর্বত থেকে আসা বরফ এই হিমবাহকে পুষ্ট করেছে। সুন্দর বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্হলের উচ্চতা ১৬৭০০ ফুট। সুন্দর ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্হল থেকে মাইল খানেক দূরে সুরালয় বামক এসে মিলিত হয়েছে চতুরঙ্গীতে। চন্দ্রাপর্বত (২২০৭৩′) ও অন্যান্য অনামী শৃঙ্গ (২২১১০′, ২১৫১২′, ২১৪১০′, ২১৩৯০′) থেকে নেমে আসা বরফ সুরালয় বামকের সৃষ্টি করেছে। সুরালয় ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্হলের উচ্চতা ১৭০০০′। এই সঙ্গম স্হল থেকে দু'মাইল দূরে ১৭৫০০ ফুট উচ্চতায় সেতা বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্হল। চতুরঙ্গী ও আরোয়া জলবিভাজিকার ওপরের পর্বত শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফে পুষ্ট

হয়েছে সেতা ও চতুরংগী। সেতা বামক ও চতুরংগী সংগম স্হলের বিপরীত দিকে চতুরঙ্গীর হিমবাহের উত্তর পাশে অবস্হিত কালিন্দী বামক। কালিন্দী ও কয়েকটি অনামী শৃংগ থেকে নেমে আসা বরফ থেকে এই ছোট্ট হিমবাহ সৃষ্ট হয়েছে। হিমবাহের উৎস স্হানের কাছ থেকে চতুরংগী-আরোয়া জল-বিভাজিকার সব চাইতে নিম্নতম অংশ ১৯৫১০′। গংগোত্রী ও চতুরঙ্গী অতিক্রম করে আরোয়ায় অবতরণের একমাত্র পথ কালিন্দী খাল। চতুরঙ্গী ও কালিন্দী বামকের সঙ্গম স্হলের উচ্চতা প্রায় ১৮০০০ ফুট। সুরালয় বামক ও চতুরঙ্গীর সংযোগ স্হলের বিপরীত দিকে চতুরঙ্গীর উত্তর পাশে অবস্থিত খালিপেট বামক। চতুরঙ্গীর সঙ্গে এই বামকের সংগম স্থলের উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফুট। কতকগুলো অনামী শৃংগ থেকে নেমে আসা বরফ থেকেই খালিপেট বামকের সৃষ্টি হয়েছে।

চতুরংগী হিমবাহের উৎস স্হলের উচ্চ পর্বতশিখর খুবই কম। তবে সেতা ও কালিন্দী বামকের প্রভূত বরফে এই হিমবাহের উৎসস্হল পুষ্ট। ছয়টি শাখা হিমবাহের বরফ এসে ঢলে পড়েছে চতুরংগীতে। শাখা হিমবাহগুলির গ্রাবরেখার বিচিত্র বনের পাথর এসে পড়েছে চতুরঙ্গীতে। শাখা হিমবাহগুলির গ্রাবরেখার বিচিত্র বর্ণের পাথর এসে চতুরংগী হিমবাহে সঞ্চিত হয়েছে। এই সঞ্চিত পাথর মূল হিমবাহ দ্বারা বাহিত হয়েছে ধীর বেগে। গ্রাবরেখার বিচিত্র বর্ণের পাথরের জন্য হিমবাহের নাম চতুরংগী হিমবাহ।

গংগোত্রী হিমবাহের উত্তরের পার্শ্ব গ্রাবরেখার পাশ কাটিয়ে উত্তর দিক থেকে এসেছে রক্তবরণ হিমবাহ। গ্রাবরেখার পাথরগুলো লালরঙের জন্য হিমবাহের এই নামকরণ। প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ এই হিমবাহের সংগে নীলাম্বর বামক, পিলাপানি বামক, শ্বেতবরণ বামক, অনামী বামক ও থেলু বামক পাঁচটি বরফের ধারায় রক্তবরণ পুষ্ট হয়েছে। রক্তবরণের উৎস স্হলে রয়েছে শ্রীকৈলাস (২২৭৪২′), অনামী শৃংগ (২১৫১২′, ২১৫৪০′)। উৎস স্হল থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণে নীলাম্বর বামক ও রক্তবরণের সংযোগ স্হলের উচ্চতা প্রায় ১৭৫০০ ফুট। নীলাম্বর বামক পূর্বদিকে অনামী শৃংগের (২২২৯৮′, ২২১০০′, ২১৫৯০′, ২১৯৯০′) বরফে পুষ্ট। রক্তবরণ হিমবাহ উত্তর দিক থেকে উৎসারিত হয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে তিন মাইল পথ। তারপর পূর্বদিক থেকে আসা পিলা-পানি বামকের প্রভূত বরফের ভারে পুষ্ট হয়ে রক্তবরণ গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সোজা পশ্চিমে তিন মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় নিঃশেষিত হয়েছে। হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা অপরূপ

বরফের গুহা দৃশ্যমান সেই গুহাকে প্রকৃত গোমুখ বলে মনে হয়। এই গুহামুখ থেকে জলধারা কালী গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলিয়ে গিয়েছে।

পিলাপানি বামকের উৎস স্থানে রয়েছে অনামী শৃঙ্গ (২২০১০', : ২০৮০')। রক্তবরণ হিমবাহের উত্তর পাশে অবস্থিত অনামী বামক ও রক্তবরণের সঙ্গম স্থল। পিলাপানি ও অনামী বামকের সঙ্গে রক্তবরণের সঙ্গম স্থলের উচ্চতা যথাক্রমে ১৬৫০০ ফুট ও ১৬০০০ ফুট। অনামী বামকের উৎস স্থলে অনামী শৃঙ্গ (২০১৭০ ফুট) থেকে স্বল্প বরফ সঞ্চিত হয়ে নেমে এসেছে পর্বতগাত্র বেয়ে। অনামী বামক ও রক্তবরণের সঙ্গম স্থল থেকে প্রায় মাইল দুয়েক পশ্চিমে ১৫৫০০ ফুট উচ্চতায় রয়েছে শ্বেতবরণ বামক ও রক্তবরণের সঙ্গম স্থল। শ্বেতবরণ মোটামুটি দীর্ঘ শাখা হিমবাহ। এই হিমবাহের উৎস স্থলে রয়েছে সুদর্শন পর্বত (২১৩৫০ ফুট), অনামী শৃঙ্গগুলি (২০৮০০ ফুট, ২১৮৫০ ফুট, ২১৭১০ ফুট)। রক্তবরণ হিমবাহের সর্বশেষ শাখা হিমবাহের নাম—থেলু বামক। মৃতপ্রায় স্তিমিত হিমবাহের স্নাউট বহুদূরে পিছিয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে জলধারা এসে মিলিত হয়েছে কালীগঙ্গায়। থেলু ধারা রক্তবরণ উপত্যকার অনেক অংশই সিক্ত করে রেখেছে। থেলু বামকের উৎস স্থলে অবস্থিত থেলু পর্বত, তার উচ্চতা ২০০০০ ফুটের চাইতেও কম।

মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ধারা অব্যাহত রেখেছে ছ'টি বড় শাখা হিমবাহ ও এগারোটি ছোট ছোট শাখা হিমবাহ। বদ্রীনাথ বা চৌখাম্বা পর্বতমালার প্রথম ও দ্বিতীয় শৃঙ্গের পশ্চিম ঢাল বেয়ে প্রভূত বরফ নেমে এসেছে ২০০০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুটে। এই খাড়া ঢালেই গঙ্গোত্রী হিমবাহের জন্ম। চৌখাম্বা পর্বতমালার প্রথম ও দ্বিতীয় শিখরের উত্তর গিরিশিরা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো এগিয়ে গিয়েছে সুদূর তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত। এই গিরিশিরার ওপরে ২২০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট চারটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। আটটি রয়েছে ২১০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ, আর সর্বসাকুল্যে ২০,০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে দশটি। এই দীর্ঘ গিরিশিরার মধ্যে সর্বনিম্ন অংশে ১৮৮৪০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। তার দক্ষিণে গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত রয়েছে ১৮০০০ ফুট উচ্চ কলু। চৌখাম্বা পর্বতমালার দীর্ঘ গিরিশিরার উত্তরপ্রান্তে রয়েছে ১৯৫১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গিরিপথ। সেই গিরিপথের নাম কালিন্দী

খাল। ১৮০০০ ফুট উচ্চ কলের পূর্ব ঢালে ভাগীরথ খড়ক হিমবাহ। ১৯১২ সনে মিড্ সাহেব এই কলে আরোহণ করে পশ্চিম ঢাল বেয়ে গংগোত্রী হিমবাহে অবতরণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৪ সনে প্রখ্যাত পর্বতারোহী এরিক্ শিপটন ও টিলম্যান এই মিডস্ কলে আরোহণ করে অপর পার্শ্বে অবতরণ করতে পারেন নি সাংঘাতিক বিপজ্জনক হিমপ্রপাত অতিক্রম করে। ফলে ভগীরথ খড়ক হিমবাহ থেকে সোজা উত্তরে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করে পেঁাছে গিয়েছিলেন আরোয়া উপত্যকায়। সেখান থেকে কালিন্দী খাল অতিক্রম করে পেঁাছে গিয়ে-ছিলেন চতুরংগী হিমবাহে। চতুরংগী হিমবাহ পথে শিপটন ও টিলম্যান অবশেষে পেঁাছে গিয়েছিলেন গোমুখ। চৌখাম্বা পর্বতমালার তৃতীয় ও চতুর্থ শৃংগের দীর্ঘ গিরিশিরা পশ্চিম থেকে পশ্চিম, পশ্চিম উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে বিশাল প্রাচীরের সৃষ্টি করে। এই প্রাচীরের ওপরে রয়েছে ২২০০০ ফুটেরও উচ্চতা বিশিষ্ট তিনটি পর্বতশৃংগ, ২১০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি পর্বতশৃংগ ও ২০,০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট সাতটি পর্বতশৃংগ। এইসব পর্বতশিখর যুক্ত দীর্ঘ গিরিশিরার দক্ষিণ ঢালে মধ্যমহেশ্বর উপত্যকা ও মন্দাকিনী উপত্যকা। গিরিশিরার উত্তর ঢালে গংগোত্রী উপত্যকা। এই দীর্ঘ জল-বিভাজিকার মধ্যে দু-একটি স্থানে গিরিশিরার সর্বনিম্ন অংশের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটেরও বেশী। এই অংশে কোন গিরিপথ নেই, তাই গংগোত্রী উপত্যকা থেকে সোজা মন্দাকিনী উপত্যকায় অবতরণ সম্ভব নয়। চৌখাম্বা বা বদ্রীনাথ পর্বতমালার বিশাল গিরি প্রাকার উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে দুটি পৃথক জল বিভাজিকার সৃষ্টি করেছে। এই জল-বিভাজিকা দুটির পশ্চিম ও উত্তর ঢাল বেয়ে সমস্ত বরফ অবতরণ করেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে। বর্ষা ও শীতের তুষারপাতে পুষ্ট গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধারা অব্যাহত রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। এই দীর্ঘ হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখায় বরফ গলে সৃষ্ট হয়েছে ভাগীরথী। সুদূর অতীত যুগের তীর্থস্থান বদ্রীনারায়ণ ও কেদারনাথ দুটি জল-বিভাজিকায় অবস্থিত।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের অফুরন্ত বরফ সংগৃহীত হয় অনেকগুলো পর্বত-শিখর থেকে। মে, জুন, জুলাই মাসে মৌসুমী বায়ু সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দক্ষিণ দিক থেকে সোজা উত্তরে প্রতিহত হয় দীর্ঘ গিরি-শিরায়। ফলে প্রচুর তুষারপাত হয় গিরিশিরায় ও উচ্চ গিরিশিখরগুলোর উপরে। শীতের তুষারও সঞ্চিত হতে থাকে। সেগুলো অবশেষে হিমানী সম্প্রপাতের সঙ্গে হিমবাহগুলিতে সঞ্চিত হয়। এইসব সঞ্চিত তুষার

প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহের ফলে পুনরায় ঘনীভূত হয়ে কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। এই বরফ গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখার বিশাল আধার। সেখানে সঞ্চিত প্রভূত বরফ ধীর বেগে অবতরণ করতে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ গঙ্গোত্রী হিমবাহের বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। গঙ্গার অন্যান্য শাখার হিমবাহগুলো বিশাল নয় বলেই এত বেশী পরিমাণ বরফ সংগ্রহ করে হিমবাহের নিয়মিত প্রবাহ অব্যাহত রাখতে পারে কিনা সন্দেহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় এই জন্যই।

১. গঙ্গোত্রী হিমবাহ দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল

প্রস্থ	৩ মাইল
স্নাউট	১২৭৭০ ফুট
স্থায়ী তুষারক্ষেত্রের আনুমানিক উচ্চতা	১৬০০০ ফুট
হিমবাহের উৎস স্থলের উচ্চতা	১৮০০০ ফুট
উৎস স্থানের পর্বতশৃঙ্গ বদ্রীনাথ পর্বত	(১) ২৩৪২০ ফুট (২) ২০১১০ ফুট

শাখা হিমবাহগুলির নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ (মাইল)	হিমবাহের উৎস স্থলের পর্বতশৃঙ্গগুলির পরিচয় ও উচ্চতা
চতুরঙ্গী হিমবাহ	৮	১.৭৫	অনামী শৃঙ্গ ২১১৪০ ফুট
কালিন্দী বামক	১	০.২৫	কালিন্দী পর্বত ২০০১৯ ফুট
সেতা বামক	১	০.২৫	অনামী শৃঙ্গ ২০২০০ ফুট, ২০৮৪০ ফুট
খালিপেট বামক	১.৫০	০.২৫	অনামী শৃঙ্গ ২০২৭০ ফুট
সুরালয় বামক	২.০০	০.৫০	চন্দ্রা পর্বত ২২০৭৩ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২২২২১ ফুট, ২১৫১২ ফুট
সুন্দর বামক	৩.৫০	০.৭৫	সতোপন্থ পর্বত ২৩২১২ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২২২২১ ফুট, ২১৭৪০ ফুট, ভাগীরথী পর্বত (১) ২২৪৯৬ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২২২১০ ফুট
বাসুকী বামক	০.৭৫	০.২৫	বাসুকী পর্বত ২২২৮৫ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২১৯৯০ ফুট

রক্তবরণ হিমবাহ	৬'৫০	১'৫০	শ্রীকৈলাস পর্বত ২২৭৪২ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২১৫১২ ফুট, ২১৫৪০ ফুট
নীলাম্বর বামক	১'৫০	০'২৫	অনামী শৃঙ্গ ২২১০০ ফুট, ২২২৯৮ ফুট, ২১২৫০ ফুট, ২১৯৯০ ফুট
পিলাপানি বামক	১'৫০	০'২৫	অনামী শৃঙ্গ ২২০৮০ ফুট, ২২০১০, ফুট ২০৯৯০ ফুট
শ্বেতবরণ বামক	২'৫০	০'৫০	সুদর্শন পর্বত ২১৩৫০ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২১৮৫০ ফুট ২০৮০০ ফুট
অনামী বামক	১	০'২৫	অনামী শৃংগ ২০১৭০ ফুট
থেলু বামক	০'৭৫	০'২৫	অনামী শৃংগ ২০২৩০ ফুট
মৈয়াশিদ বামক	১'৫০	০'২৫	অনামী শৃংগ ২২৩২৯ ফুট, ২১৯৫০ ফুট
স্বচ্ছন্দ বামক	২'৫০	০'৫০	স্বচ্ছন্দ পর্বত ২২০৫০ ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২১৯৯০ ফুট
গর্নাহিম্ বামক	২'০০	০'৫০	খরচা কুণ্ড ২১৬৯৫ ফুট
কীর্তি বামক	৩'৫০	০'৫০	কীর্তিস্তম্ভ (১) ২০৯৭০ ফুট (২) ২০৫২০ ফুট, ভারত ঘুণ্টা ২১৫৮০ ফুট, কেদারনাথ পর্বত ২২৭৭০ ফুট, কেদারনাথ স্তম্ভ ২২৪১০ ফুট

গঙ্গোত্রী ও অলকানন্দা জল-বিভাজিকার ওপরে দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত পর্বত শিখরগুলির পরিচয় ও উচ্চতা ঃ—

২৩০০০ ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর

বদ্রীনাথ বা চৌখাম্বা

(১) ২৩৪২০ ফুট

দুটি (২) ২৩১৯০ ফুট

২২০০০ ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ

২২১২০ ফুট

চারটি ২২৩২৯ ফুট

২২১১০ ফুট

স্বচ্ছন্দ পর্বত ২২০৫০ ফুট

২১০০০ ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ

আটটি
২১৩১০ ফুট
২১৯৫০ ফুট
২১৯৯০ ফুট
২১৯৮০ ফুট
২১৯৭০ ফুট
২১৪১০ ফুট
২১৫১২ ফুট
২১১৪০ ফুট

২০,০০০ ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ

দশটি
২০৮৪০ ফুট
২০২৮০ ফুট
২০০২০ ফুট
২০২৮২ ফুট
২০৬০০ ফুট
২০৬৪০ ফুট
২০৬৬০ ফুট
২০৪৪০ ফুট
২০৩১০ ফুট
২০৭০০ ফুট

গঙ্গোত্রী মন্দাকিনী জলবিভাজিকার ওপর দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত পর্বত শিখরগুলির পরিচয় ও উচ্চতা ঃ—

২২০০০ ফুটের ওপরে তিনটি পর্বতশিখর—চৌখাম্বা (৩) ২২৮৮০ ফুট
(৪) ২২৪৮৫ ফুট
কেদারনাথ পর্বত ২২৭৭০ ফুট

২১০০০ ফুটের ওপরে দুটি পর্বতশিখর অনামী শৃঙ্গ ২১১১০ ফুট
২১৫৮০ ফুট

২০০০০ ফুটের ওপরে সাতটি পর্বতশিখর—মান্দানী
পর্বত ২০৩২০ ফুট
সুমেরু পর্বত ২০৭৭০ ফুট

॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী ত্রিদেশশ্বরী ॥

(গঙ্গাস্তোত্র)

অতীত যুগের পুণ্যার্থী নরনারী বিশ্বাস করতেন—গঙ্গাতীরে দেহ-ত্যাগ করলে সর্ব পাপ তাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। গঙ্গা এমনি পবিত্র। এই নদীর তীরে তাই সম্ভবত সে-যুগের মুমুক্ষু মানুষ অগণিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পবিত্র তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হয়েছিল কালক্রমে। গঙ্গার কূলে কূলে যেমন অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হয়ে তীর্থভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তেমনি গঙ্গার তিনটি মুখ্য ধারার উৎস স্থলের সন্নিকটে—দুর্গম হিমালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেই তীর্থগুলির নাম—বদরিকাশ্রম- কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রী। হিমালয়ের তুষার সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত তিন তীর্থের একস্থান থেকে অপর তীর্থস্থানের সোজাসুজির দূরত্ব কম হলেও, সহজ ও সম্ভাব্য পথ দীর্ঘ। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের গিরিশিরা দীর্ঘ প্রাচীরের মতো অবরোধ করে রেখেছে এই সব মন্দিরগুলোকে। সেই সব মন্দিরের পুরোহিত পুজো সম্পন্ন করতেন নিয়মিতভাবে। প্রাচীনকালের তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে একই পুরোহিত এই সব মন্দিরগুলোর পুজো সম্পন্ন করতেন। অর্থাৎ একই পুরোহিত গঙ্গোত্রী মন্দিরের পুজো সম্পন্ন করে যেতেন বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো সম্পন্ন করতে। অথবা বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো সম্পন্ন করে পুরোহিত যেতেন কেদারনাথ মন্দিরে পুজো সম্পন্ন করতে। সে যুগে দুর্গম পথ অতিক্রম করবার জন্য যান-বাহন কিছুই ছিল না। পদ-যাত্রাই ছিল একমাত্র সম্বল, দীর্ঘপথ

অনামী শৃঙ্গ ২০৫৭০ ফুট
২০৫২০ ফুট
২০০২০ ফুট
২০০৪০ ফুট
২০৬৭০ ফুট

অতিক্রম করবার জন্য। সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে তখনকার যুগে একই বৎসরে এই তিন তীর্থে দর্শন অসম্ভব হতো। দুর্গম ও দীর্ঘপথ, বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে পদযাত্রা মন্থর হতে মন্থরতর হতো। সে ক্ষেত্রে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই পুরোহিত হিমালয়ের তিন তীর্থে যাওয়া ও পুজো সম্পন্ন করার কিংবদন্তী তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাসের মূলে কোন তথ্য ছিল না। তাঁরা মনে করতেন সাধু সন্ন্যাসীরা ও দুর্গম তীর্থের মন্দিরে অবস্থানরত পুরোহিত নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। অলৌকিক শক্তি বলে পুরোহিত হয়তো বা অসম্ভবকে সম্ভব করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন—এই তিন তীর্থের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চ হিমালয়ের গিরিপথগুলোর। তুষরাবৃত গিরিপথ অতিক্রম করে এক তীর্থে থেকে অপর তীর্থে যাতায়াত করতেন মন্দিরগুলোর পুরোহিত। এই পথ ধরেই যাতায়াত করতেন সাধু সন্ন্যাসীর দল।

গঙ্গার মুখ্য তিনটি ধারা—ভাগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। এই ধারাগুলির উৎস মুখের সন্নিকটে গঙ্গোত্রীর মন্দির, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথের মন্দির। ভাগীরথীর উৎস স্থান থেকে অলকানন্দার উৎস স্থান পর্যন্ত এবং অলকানন্দার উৎস স্থান থেকে মন্দাকিনীর উৎস স্থান পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তুষরাবৃত পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। সেই পর্বত-মালার দীর্ঘ গিরিশিরাগুলো উৎস স্থানগুলোকে সুউচ্চ দুর্গপ্রাকারের মতো বেষ্টন করে রেখেছে। সাধু সন্ন্যাসীরা ও মন্দিরের পুরোহিত হয়তো বা তুষরাবৃত গিরিশিরার মাঝখানে কোথাও কোন সহজসাধ্য সংক্ষিপ্ত গিরিপথ অনুসরণ করে যাতায়াত করতেন এই তীর্থগুলিতে। সেই গিরিপথ হয়তো বা সাধারণ তীর্থযাত্রীদের অগম্য ও অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে সেই গিরিপথ অপব্যবহারের ফলে অথবা ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে অব্যবহার্য হলে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীনকালের বৃদ্ধ পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে এই লুপ্ত গিরিপথের কাহিনী প্রচলিত ছিল। সুদূর অতীত যুগ ধরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই তিন তীর্থে যাত্রা করতেন ভারতের দূর দূরান্ত থেকে এসে। এমন কি সিংহল, ব্রহ্মদেশ থেকেও আসতেন তীর্থযাত্রীর দল। সমতলের মানুষ এক বৎসরের মধ্যে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ দর্শন করতে পারতেন হয়তো। কিন্তু সেই বৎসরই গঙ্গোত্রী দর্শন করা সহজসাধ্য ছিল না। এর মধ্যেই বর্ষা আসতো—ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত হয়ে পথঘাট বিপজ্জনক হতো। সর্বোপরি ধস নেমে পাহাড়ের পায়ে-চলা পথ বন্ধ হয়ে যেতো।

হিমালয়ে পায়ে-চলা দুর্গম পথ ভেঙে-চুরে তীর্থযাত্রীদের পথ-চলা ব্যাহত করতো। বর্ষার মাস দুয়েক পরই শীতের শুরু, শীতের তুষারপাত এসে পথের চিহ্ন মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো। মে মাস থেকে অক্টোবর এই ছয় মাসই তীর্থযাত্রা অব্যাহত থাকতো। অবশ্য এর মধ্যে বর্ষা, দৈবদুর্বিপাকে পথঘাট ভেঙে গেলে যাত্রার সময় আরও সংক্ষিপ্ত হতো। এই তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করতেন—হিমালয়ের দুর্গম পথ বেয়ে শুধুমাত্র সিদ্ধ মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত—এক তীর্থ থেকে অপর তীর্থে যাতায়াত করতেন অল্প সময়ের মধ্যে।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে বিদেশী ভ্রমণকারীরাও হয়তো এই ধরনের বিস্ময়কর কাহিনী শুনতেন তীর্থযাত্রী আর স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। ১৬২৪, ১৬৩১ ও ১৭১৫ সনে পর্তুগীজ মিশনারীরা বদ্রীনাথ দিয়ে নানা গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৮০৮ সনে ওয়েব ও র‍্যাপার গঙ্গোত্রীর পথে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। হিমালয়ের তীর্থপথে নানা কাহিনী শুনে-ছিলেন তাঁরা পথযাত্রীদের কাছ থেকে। প্রায় চার পাঁচশ বৎসর পূর্বে হিমালয় ভ্রমণ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। কৃচ্ছ্রসাধনা করে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তীর্থযাত্রীরা এই তীর্থে পেঁাছে যাওয়াকেই অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক বলে মনে করতেন।

সম্ভবত এই ধরনের নানা জনশ্রুতি প্রখ্যাত পর্বতারোহী অভিযাত্রী সি. এফ্. মিড্‌কেও আকৃষ্ট করেছিল। ১৯১২ সনে মিডসাহেব দুজন পর্বতারোহী সঙ্গী ও শেরপা, বদ্রীনাথ থেকে যাত্রা করেছিলেন অলকানন্দার উৎসের দিকে। তাঁর বিশ্বাস, বদ্রীনাথ থেকে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে উৎসস্থলে পেঁাছে যাওয়া যাবে অতি সহজেই। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে সামনের গিরিশিরা অতিক্রম করে পেঁাছে যাওয়া সম্ভব হবে গঙ্গোত্রী হিমবাহে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারলেও গঙ্গার উৎসস্থলে পেঁাছে যাওয়া সহজসাধ্য হবে। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী পেঁাছে যাওয়া অত্যন্ত সহজ হবে। অলকানন্দার উৎসস্থল থেকে হিমবাহ বেয়ে অগ্রসর হলে সামনের গিরিশিরার শীর্ষে উঠবার সহজ সাধ্য গিরিপথের সন্ধান খুঁজে বার করতে হবে। মিডসাহেব মনে করতেন—সেই প্রাচীন যুগের লুপ্ত গিরিপথ বেয়েই দুঃসাহসী পূজারী ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্যাসীরা গঙ্গোত্রী থেকে আসতেন বদ্রীনাথ। অথবা বদ্রীনাথ থেকে এই গিরিপথ বেয়েই গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণ করে পেঁাছে যেতেন গঙ্গার উৎস স্থলে। স্থানীয় অধিবাসী ও পাহাড়ী মানুষদের কাছ থেকেও হয়তো এই অতীত

যুগের লুপ্ত গিরিপথের হদিস্ করেছিলেন নিশ্চয়ই। যে যুগের হারানো গিরিপথের সন্ধান পুনরুদ্ধার করতে পারলে ভাগীরথী-অলকানন্দার জল-বিভাজিকা অতিক্রম করে সহজেই পেঁছে যাওয়া যাবে গঙ্গোত্রী। মিড-সাহেব দলবল নিয়ে বদ্রীনাথ থেকে মানাগ্রামে পেঁছে গিয়েছিলেন অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে। এই পথ দীর্ঘ ও সুদূর অতীত যুগের। তীর্থযাত্রীরা এই পথ বেয়ে মানা গিরিপথ অতিক্রম করে পেঁছে যেতেন তিব্বতে। সেখান থেকে তাঁরা পেঁছে যেতেন কৈলাস ও মানস-সরোবর। এই পথ বেয়েই তিব্বতী ব্যবসায়ীরা আসতো ভারত-বর্ষে।

মিডসাহেব মানাগ্রাম পেঁছে গিয়েছিলেন অলকানন্দার ওপরকার ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে। মানাগ্রাম থেকে পেঁছে গিয়েছিলেন বসুধারা। বসুধারার সুন্দর প্রপাত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই। বসুধারা থেকে কয়েক শ' ফুট অবতরণ, তারপর অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে পেঁছে গিয়েছিলেন উৎসস্থলে—ভগীরথ খড়ক হিমবাহের স্নাউটের সামনে। সেখান থেকে সামান্য উচ্চতায় মিডসাহেব সেদিনের পদযাত্রা সমাপ্ত করে প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলেন। ভগীরথ খড়ক হিমবাহের গ্রাবরেখার অসমান পাথর। তবু তার মধ্যেই দেখা গিয়েছিল পথের ক্ষীণ রেখা। এই পথ অনুসরণ করে মেষপালকরা এগিয়ে যেতো তুষার সীমার ওপরে। এই পদচিহ্ন লক্ষ্য রেখে তীর্থযাত্রীরা সুদূর অতীতে যেতো সত্যপদ বা সতোপন্থ হ্রদে। মিডসাহেব যেন অতীত যুগের স্বাক্ষর খুঁজে পেয়ে-ছিলেন। পরদিন ভোর হতেই দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাইল ছয়েক দূরে। গ্রাবরেখার অসমান পাথরের ঢাল বেয়ে এগিয়ে মোটামুটি সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড খুঁজে পেয়েছিলেন। মানা গ্রামের অধিবাসী জন কয়েক এসেছিল মিড সাহেবের সঙ্গে মাল বইতে আর পথ প্রদর্শকের কাজ করতে। তারাই দেখিয়ে দিয়েছিল বক্রিওয়ালাদের রাত্রিবাসের নিরাপদ স্থান। মিড্ সেখানে দু'নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন। শিবিরের স্থান থেকেই হিমবাহের ওপর দিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে গেলেই দক্ষিণ দিক থেকে আসা শাখা হিমবাহের সংযোগস্থল। শাখা হিমবাহের পার্শ্ব-দেশের পশ্চিমে বিশাল গিরিশিরা সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত হয়ে যেন বিশাল প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। গিরিশিরার দক্ষিণ প্রান্তে বদ্রীনাথ পর্বতমালার দুটি শিখর। শিখর দুটির সন্নিকটেই গিরিশিরার ওপরে দেখা যাচ্ছিল একটি অনামী শৃঙ্গ যার উচ্চতা আনুমানিক ২২২১০ ফুট। অনামী শিখরের ঢালু অংশ পেরুলেই অপর একটি ছোট পর্বত

শৃঙ্গ (১৮৮৪০ ফুট) মাথা উঁচু করে ছিল। মিডসাহেব প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে অনুমান করেছিলেন যে—অনামী শৃঙ্গ (২২২১০ ফুট) ও ছোট পর্বত শৃঙ্গের (১৮৮৪০ ফুট) সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার সবচাইতে ঢালু অংশের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটের চাইতে সামান্য বেশী হওয়াই সম্ভব। এই ঢালু অংশে পেঁছে যেতে পারলেই হয়তো গিরিশিরার অপর পার্শ্বে অবস্থিত গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণ সম্ভব হতে পারে। মিডসাহেব ভেবেছিলেন পথের নিশানা বুঝি পাওয়া গিয়েছে। অলকানন্দা উপত্যকা থেকে গঙ্গোত্রী উপত্যকায় পেঁছে যাবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথই তো সুদূর অতীতের লুপ্ত গিরিপথ।

দু নম্বর শিবির থেকেই স্থানীয় মালবাহীদের মজুরী মিটিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রায় সব কজনকেই। তারপর দুজন শেরপা ও সংগী পবর্তারোহীদের নিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে আসা শাখা হিমবাহের উৎসস্থলের সন্নিকটে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। উৎসের মুখের কাছে বরফের ঢাল বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিমবাহের মুখের দিকটার বরফের অবস্থা দেখা যাচ্ছিল খুবই বিপজ্জনক। মিডসাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে শাখা হিমবাহের সমস্ত বরফই নেমে এসেছে গিরিশিরার ঢালু অংশ থেকে। সেই ঢালু অংশের ওপরে আরোহণ করাই স্থির করেছিলেন মিডসাহেব। শাখা হিমবাহের উৎস স্থানটিতে ছিল বিপজ্জনক হিমপ্রপাত। সেই হিমপ্রপাতের ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে মিডসাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করেও পেঁছে গিয়েছিলেন ১৮০০০ ফুট উচ্চতায়। গিরিশিরার ওপরে উঠে বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি আদৌ গিরিপথ নয়। বড়জোর একে কল্ (Col)[১] বলা যেতে পারে। কল্ অতিক্রম করে অপর পার্শ্বে অবতরণ করা অসম্ভব। কারণ, কলের ওপর দিক থেকে ভয়াবহ বরফের ঢাল নেমে গিয়েছে ওপাশে পশ্চিম দিকটায়। আকাশ পরিষ্কার ছিল। মিডসাহেব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বরফের ঢাল দক্ষিণে বদ্রীনাথ শিখরের গা বেয়ে নেমে এসেছে গিরিশিরার ওপরে। সেখান থেকে প্রায় সমস্ত বরফই যেন নেমে গিয়েছে পর্বত শিখরের পশ্চিম ঢাল বেয়ে। পশ্চিম ঢালে নেমে আসা বরফ এক

১. কল্ (Col) একই গিরিশিরায় অবস্থিত দুটি উচ্চ পর্বত শিখরের মধ্যবর্তী অংশে গিরিশিরার ঢালু অংশকে কল্ বলা হয়। গিরিপথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য। কল্ অতিক্রম করা তেমন সহজসাধ্য নয়।

বিশাল ও ভয়াবহ হিমপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। মিডসাহেব বুঝেছিলেন এই হিমপ্রপাতই গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসমুখ। হতাশ হয়েছিলেন মিডসাহেব। কোথায় সেই লুপ্ত গিরিপথ যে গিরিপথ অতিক্রম করে অতীতযুগের দুঃসাহসী পূজারী ও সাধুসন্ন্যাসী বদ্রীনাথ থেকে গঙ্গোত্রী যাতায়াত করতেন।

মিডসাহেব বুঝেছিলেন ভাগীরথী অলকানন্দার জল-বিভাজিকা অতিক্রম করবার জন্য দীর্ঘ গিরিশিরার সর্বনিম্ন অংশ বেয়ে পশ্চিম পার্শ্বে অবতরণ অসম্ভব ও অবাস্তব। ব্যর্থ হয়ে সি-এফ্-মিড ফিরে এসেছিলেন দলবল নিয়ে। তার চিহ্নিত 'কল্'কে পরবর্তী কালের অভিযাত্রীরা মিডস্ কল্ বলে অভিহিত করেছিলেন।

মিডসাহেবের পর আর কোন দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই পথে আসবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই। ভাগীরথী-অলকানন্দার জল-বিভাজিকার বিশাল বাধা অতিক্রম করে অতীত যুগের সাধু সন্ন্যাসী ও পুরোহিত কোন্ পথ অনুসরণ করেছিলেন, সে তথ্য অজ্ঞাতই ছিল। ১৯১২ সনের পর থেকে দীর্ঘ দশ বছর আর কোন অভিযাত্রী আসেননি এই পথে।

১৯৩১ সনে গাড়োয়াল কুমায়ুনের সুউচ্চ পর্বত শিখরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পর্বতারোহী দল। কামেট পর্বত অভিযান সমাপ্তির পর অভিযাত্রীদের মধ্যে বার্নি, হোল্ডসওয়ার্থ, শিপটন ওডেল ও স্মাইথ ঘাসটোলী থেকে আরোয়া নদীর গতিপথ অনুসরণ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন আরোয়া হিমবাহে। আরোয়া হিমবাহের স্নাউটের মুখে অপরূপ হ্রদ—নাম আরোয়া তাল। সেই হ্রদের তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন অভিযাত্রীদল। কয়েক দিন অবস্থান করে বার্নি দলবল নিয়ে হিমবাহের জরিপকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর হিমবাহের বরফের ঢাল বেয়ে অভিযাত্রীরা ১৯৫১০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গিরিপথ অতিক্রম করে অবতরণ করেছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহে। চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে তাঁরা অবশেষে ভাগীরথীর উৎস গোমুখে হাজির হয়েছিলেন। গোমুখ থেকে অতি সহজেই অভিযাত্রীরা পেীঁছেছিলেন গঙ্গোত্রী। দীর্ঘ অতীতের পরেই সম্ভবত এই প্রথম পর্বত অভিযাত্রী দল ভাগীরথী অলকানন্দার জল-বিভাজিকার বিশাল বাধা জয় করে পৌঁছেছিলেন গঙ্গোত্রী। বার্নি'র চিহ্নিত গিরিপথকে বার্নি গিরিপথ বলা হত। কিন্তু পুরাণে তথ্য অনুসারে দেখা গিয়েছিল এই গিরিপথের নাম কালিন্দী খাল। সুদূর অতীত যুগের সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যেতেন এই গিরিপথ অনু-

স্মরণ করে। দুঃসাহসী সাধু সন্ন্যাসীরা কালিন্দী খাল পেরিয়ে যেতেন মানা গিরিপথে। মানা গিরিপথ পেরিয়ে যেতেন কৈলাস মানস-সরোবরে তীর্থ পরিক্রমায়। কালিন্দী খালই কি তবে সেই প্রাচীন যুগের লুপ্ত গিরিপথ? এ রহস্য উদঘাটিত হয়নি আজো।

বার্নি'র এই জরিপ কার্যের ফলে বোঝা গিয়েছিল যে অলকানন্দা-ভাগীরথীর জল-বিভাজিকা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য নয়। কালিন্দী খাল সুদূর অতীত থেকেই সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে অতি পরিচিত। বার্নি'র জরিপের ফলে আরোয়া হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের মোটামুটি প্রাথমিক মানচিত্র রচিত হয়েছিল।

১৯৩১ সনের ঠিক দু বৎসর পর ১৯৩৩ সনে প্রখ্যাত অভিযাত্রী মার্কোপালিস্ দলবল নিয়ে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহের উদ্দেশ্যে। এই অঞ্চলে সম্ভবত প্রথম জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল ১৮৪৭ সনে। অবশ্য তার পূর্বেই ১৮১৭ সনে সহকারী সার্ভেয়র জেনারেল হার্বার্ট্ গোমুখে এসেছিলেন ভাগীরথীর উৎস ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে। হার্বার্টের পর মারখম ১৮৫৭ সনে এসে-ছিলেন গোমুখ। বার্নি'র উৎসাহে অবশ্য আরোয়া ও চতুরঙ্গী হিমবাহের অবস্থান, প্রাথমিক জরিপ কার্য ও সমীক্ষা সম্পন্ন করে মানচিত্র অংকন করা হয়েছিল।

মার্কোপ্যালিস্ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে উপস্থিত হয়েই বেশ অসু-বিধায় পড়েছিলেন উপযুক্ত মানচিত্রের অভাবে। অবশ্য বার্নি'র মানচিত্র ও সংগৃহীত তথ্য তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। গোমুখে পেঁছেই মার্কোপালিস্ গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রবেশ মুখে অদূরে তিনটি তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি হয়তো গঙ্গোত্রী অঞ্চলের অন্যতম পর্বতশৃঙ্গ সতোপন্থর নাম শুনেছিলেন। তাই পর্বতশৃঙ্গ তিনটিকে সতোপন্থ পর্বতমালা অনুমান করেছিলেন। আসলে এই পর্বত শৃঙ্গগুলি ভাগীরথী পর্বতমালা। মার্কোপালিস্ স্থির করেছিলেন—ভাগীরথী দ্বিতীয় শৃঙ্গকে (২১৩৬৪ ফুট) সেণ্ট্রাল সতোপন্থ মনে করে সেই শৃঙ্গে আরোহণের উদ্দেশ্যে পেঁছে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগ স্থল নন্দন বনে (১৪২০০ ফুট)। সেখানে তাঁদের মূল শিবির স্থাপিত হয়েছিল। এই অভিযাত্রী দলে দলনেতা মার্কো-পালিস্ ছাড়া এফ্-ই-হিকাস্, সি-এফ্-কির্কাস আর-সি-নিকলসন ও ডাক্তার চার্লস্ ওয়ারেন। অবশ্য আকস্মিক প্রচণ্ড তুষার পাতের দরুন শৃঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হননি। পর্বত আরোহণে ব্যর্থ হবার পর

মার্কোপালিস্ দলবল নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের শাখা হিমবাহ রক্তবরণ অঞ্চলে সমীক্ষা করেছিলেন। সেখান থেকে এসেছিলেন চতুরঙ্গী অঞ্চলে। চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে তাঁরা গিয়েছিলেন উৎস মুখে। সেখান থেকে কালিন্দী খাল অতিক্রম করে তাঁরা পেঁছে গিয়েছিলেন আরোয়া উপত্যকায়। বার্নি'র পর সম্ভবত এই প্রথম একদল অভিযাত্রী গঙ্গোত্রী অঞ্চল থেকে অগ্রসর হয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে ভাগীরথী অলকানন্দার জল-বিভাজিকা অতিক্রম করেছিলেন।

মার্কোপালিসের পর প্রখ্যাত পর্বতারোহী এরিক্ শিপটন ও টিলম্যান এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে ১৯৩৪ সনে জুলাই মাসে। নন্দাদেবী পর্বত শিখরের চারপাশের দুর্ভেদ্য গিরিপ্রাকার অতিক্রম করে মূল শিখরের পাদদেশে পেঁছুবার জন্য সহজসাধ্য পথের নিশানা খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে সে অঞ্চলে মে ও জুন মাস অতিবাহিত করেছিলেন। জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে। তাঁরা স্থির করেছিলেন জুলাই আগস্ট এই দুই মাস গঙ্গোত্রী ও অলকানন্দা উপত্যকার বিভিন্ন পর্বত শিখরের অবস্থান, এই সব শিখরের সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরা যেগুলো গঙ্গা, অলকানন্দা জলবিভাজিকা ও অলকানন্দা মন্দাকিনীর জল-বিভাজিকার সঙ্গে যুক্ত সেগুলো পর্যবেক্ষণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

গঙ্গার তিনটি মুখ্য ধারা। ধারা তিনটির উৎস অঞ্চলে তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এ সম্পর্কে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। শিপটন ও টিলম্যান সে সব কাহিনী না শুনলেও নানা জনশ্রুতি শুনেছিলেন। যে সব পর্বতশৃঙ্গ ও গিরিশিখার সঙ্গে গঙ্গার তিনটি মুখ্য ধারা—ভাগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী তাদের কথা জানতেন শিপটন সাহেব। ধারা তিনটির উৎসমুখের দিকে যুক্ত গিরিশিরায় হয়তো গিরিপথ রয়েছে। সেই গিরিপথ অতিক্রম করতে পারলে অতি সহজেই ধারা তিনটির উৎসমুখে পেঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। মুখ্য ধারা গঙ্গার উৎস সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনেছিলেন শিপটন ও টিলম্যান। প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে গঙ্গার উৎসের কথা লেখা আছে। মিশরের নীলনদের উৎস সম্পর্কেও নানা কাহিনী লেখা আছে। সে যুগের দার্শনিক ও ভূগোলতত্ত্ববিদ টলেমি লিখেছিলেন যে—চন্দ্রপর্বতের পাদদেশে অবস্থিত দুটি গভীর কুণ্ড থেকেই উৎসারিত হয়েছে নীলনদ। দুহাজার বৎসর পর্যন্ত কোন দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই কাহিনীর সত্যতা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে নীলনদের উৎসের দিকে যায়নি। ডঃ হামফ্রে রুয়েনজুরী নদীর উৎস স্থান দেখবার উদ্দেশ্যে অভিযান

করেছিলেন। তিনি নদীর উৎস স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দুটি হ্রদের আবিষ্কার করেছিলেন। হ্রদ দুটি গভীর। সেই গভীর হ্রদ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল বিখ্যাত নদী। রুয়েনজুরীর নাম অনুসারে নদীর নাম হয়েছিল রুয়েনজুরী নদী।

অলকানন্দার উৎস স্থান সম্পর্কে শিপটন জনশ্রুতি সংগ্রহ করে-ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন—অলকানন্দা একটি অপরূপ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে নির্গত হয়েছে। তখনকার লোকে সম্ভবত বসুধারাকেই অলকানন্দার উৎস বলে মনে করতেন। হয়তো সেই জন্যই বসুধারাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। তীর্থযাত্রীরা বসুধারায় উপস্থিত হয়ে পুজো দেন। শিপটন গঙ্গার তিনটি ধারার উৎসমুখে গিরিশিরায় অবস্থিত অপ্রচলিত ও লুপ্ত গিরিপথ পুনরাবিষ্কার করা যেন রোমাঞ্চকর অভিযান বলে মনে করেছিলেন। শিপটন শুনেছিলেন যে—এই অপ্রচলিত ও লুপ্ত গিরিপথ বেয়েই সাধু-সন্ন্যাসী ও পূজারী ব্রাহ্মণ কেদারনাথ মন্দির থেকে বদ্রীনাথ মন্দিরে পেঁছে যেতেন। গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যেতেন গিরিপথ অনুসরণ করে। শিপটন অভিজ্ঞ ভূগোল-বিজ্ঞানী। তিনি এই অঞ্চলের জলবিভাজিকা অতিক্রম করবার জন্য সম্ভাব্য ভৌগোলিক তথ্য, স্থানীয় গাইড, বকরিওয়ালাদের কাছ থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করে-ছিলেন। লুপ্ত গিরিপথের নিশানা পুনরুদ্ধার করা পর্বতারোহণের চাইতে কম রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়নি। হিমালয়ের উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করার মধ্যে অদ্ভুত রোমাঞ্চ রয়েছে। সে রোমাঞ্চ যেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশপূর্ণ স্থান ও নতুন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ দর্শন করায়। তুষারাবৃত উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করতে হলে পর্বতারোহণের উন্নততর কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হয় সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চলে। ফলে, অপরিচিত অঞ্চল, যে স্থান সম্পর্কে নানা কল্পনা ও রোমাঞ্চকর পরিবেশের কথা ভাবা যায়, সেই নতুন দিগন্তে হাজির হওয়া যায়। শিপটন মনে করতেন কোন পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের চাইতে বেশী আনন্দ রয়েছে এতে। নতুন অপরিচিত গিরিপথ নতুন রাজ্যের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে। নতুন রাজ্যের পরিসীমা বিশাল…। সেই বিশাল ও ব্যাপ্তির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায় নিজেকে।

কিন্তু শৃঙ্গে আরোহণের সময় বিশাল ব্যাপ্তির ভেতর থেকে অগ্রসর হতে হয়। ধীরে ধীরে পরিসীমা সংক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষুদ্রতম অঞ্চলে পেঁছে যেতে হয়। সর্বশেষে বিশাল পরিসীমা যেন সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র

হয়ে ধরা পড়ে। তখন অত্যন্ত সন্তর্পণে সীমিত সময়ের মধ্যে বিশাল ব্যাপ্তির অস্পষ্ট চিত্র দেখতে হয় ভয়ে ভয়ে।

সবকিছু ভেবে শিপটন প্রথম বদ্রীনাথ থেকে যাত্রা করে বিশাল গিরিশিরা অতিক্রম করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পেঁছে ভাগীরথীর উৎসস্থলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। মধ্য হিমালয়ের সবচাইতে বিচিত্র ও দীর্ঘ হিমবাহের নাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ। এই হিমবাহের বরফ গলে উৎপন্ন হয়েছে পবিত্র নদী ভাগীরথী। সুদূর অতীত যুগে থেকেই তীর্থযাত্রীরা দলে দলে আসেন ভাগীরথীর উৎস দর্শন মানসে। এই নদীর তীরেই বসবাস করেন সাধু-সন্ন্যাসীরা।

১৯১২ সনে সি-এফ-ডি-মিড দুজন পর্বতারোহী, শেরপা ও মানা-গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে এসেছিলেন অলকানন্দার উৎসে। সেখান থেকে ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ অনুসরণ করে বিপজ্জনক হিমপ্রপাত পেরিয়ে দুর্গম খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন ভাগীরথী-অলকানন্দা জল-বিভাজিকায়। কিন্তু সেই গিরিশিরার অপর পার্শ্বে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পর্বতারোহণের কলাকৌশল অবলম্বন করে গিরিশিরার ওপরে উঠতে পারলেও অপর পার্শ্ব দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণের পথ খুঁজে পান নি। মিডসাহেব লিখেছিলেন—এ অসম্ভব, অবাস্তব। শিপটন ও টিলম্যান কিন্তু মিড্‌স কলে পেঁছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে অবতরণের পথ খুঁজে বার করাই অভিযানের প্রথম প্রয়াস মনে করেছিলেন। অলকানন্দার উৎসস্থল থেকে অগ্রসর হয়ে শিপটন, টিলম্যান, শেরপা ও স্থানীয় মালবাহকদের নিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন ভাগীরথী খড়ক হিমবাহে। মিডসাহেবের অনুসৃত পথ অনুসরণ করে তারা বহু কষ্টে, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন মিড্‌স কলের পাদদেশে। বদ্রীনাথ পর্বতমালার দীর্ঘ গিরিশিরা দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে। গিরিশিরার ওপরে সর্বনিম্ন ঢালু অংশই মিড্‌স কল্। মিড্‌স কলের পরে গিরিশিরার উত্তর প্রান্তে সর্বনিম্ন ঢালু অংশই কালিন্দী খাল। কালিন্দী খাল বহুল পরিচিত পথ। দীর্ঘ ও দুর্গম হলেও সাধু-সন্ন্যাসী ও পূজারী মানুষ গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যাতায়াত করতেন। কিন্তু মিড্‌স কল্ বেয়ে অবতরণ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহে পেঁছে যাবার কোন প্রাচীন তথ্য ছিল না। ১৯১২ সনে মিড্‌স কলের অবস্থা যা ছিল, দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর সে অবস্থা থাকা সম্ভব নয়। সেই গিরিশিরার ওপরকার মিড্‌স কল্ থেকে মুহুর্মুহু হিমানী সম্প্রপাতের বজ্রনির্ঘোষ শিপটন ও টিলম্যানের অগ্রগতি রুদ্ধ

করে দিয়েছিল। শিপটন তাই সেই বিপজ্জনক হিমানী সম্প্রপাত এড়িয়ে ভয়াবহ হিমপ্রপাত বেয়ে মিড্‌স কলের ওপরে আরোহণ করবার সমস্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ অঞ্চল দিয়ে অন্য কোন বিকল্প পথে মুখ্য জল-বিভাজিকা অতিক্রম করার চেষ্টা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। তারপর ভাগীরথী খড়ক হিমবাহের উত্তরাংশের কয়েকটি গিরিপথ আতক্রম করে তাঁরা পেঁছে গিয়েছিলেন আরোয়া হিমবাহে। পূর্বে এই হিমবাহ অঞ্চলে প্রায় দু সপ্তাহ অবস্থান করে-ছিলেন শিপটন, টিলম্যান ক্যামেট শৃঙ্গ জয় করে প্রত্যাবর্তনের সময়। আরোয়া হিমবাহ বেয়ে শেষে কালিন্দী খাল অতিক্রম করেছিলেন। সেখান থেকে চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে সর্বশেষে গঙ্গোত্রী হিমবাহে পেঁছে গিয়েছিলেন ভাগীরথীর উৎসে স্থানে। স্নাউট থেকে আবার তাঁরা পূর্ব পথ ধরে বদ্রীনাথ পেঁছে গিয়েছিলেন। এই অভিযানের অপর অংশ শুরু করেছিলেন বর্ষার পর। গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ যাত্রার পথ পর্যবেক্ষণ করবার পর শিপটন ও টিলম্যান বেরিয়ে পড়েছিলেন পরবর্তী অভিযানে অর্থাৎ বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ পেঁছুবার জন্য গুপ্ত গিরি-পথের পুনরাবিষ্কারে। অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসী, তীর্থযাত্রার মতো শিপটনও শুনেছিলেন, প্রাচীনকালে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দিরের পুজো সম্পন্ন করে একই দিনে যেতেন বদ্রীনাথ, সেখানকার পুজো করবার জন্য। শিপটন এ কাহিনীর বাস্তবতার দিক বিচার করে কোন যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ খুঁজে না পেলেও একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতেও পারেননি। এই মন্দির দুটিতে যাতায়াতের কোন সহজসাধ্য সংক্ষিপ্ত পথও নেই। কোন গিরিপথ দিয়ে যুক্ত নয় সংক্ষিপ্ত পথ। বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ যাবার সংক্ষিপ্ত দূরত্ব অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ ও উচ্চ গিরিশিরার দ্বারা যুক্ত। কিন্তু সেই দূরত্বকে পথ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ, বিশাল গিরিশিরা এই দুটি অঞ্চলকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে লুপ্ত গিরিপথের কথা পূর্বেও প্রচলিত ছিল। শিপটন ও টিলম্যান লুপ্ত গিরিপথ খুঁজে বার করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

শিপটন ও টিলম্যান শেরপাসহ স্থানীয় মালবাহক নিয়ে তারা পেঁছে গিয়েছিলেন অলকানন্দার উৎসস্থলকে ডান পাশে রেখে গিয়েছিলেন সতোপন্থ হিমবাহে। সেখানে সুন্দর শিবির স্থাপনের জায়গা ছিল। এই পথ অতি পরিচিত। তীর্থযাত্রীরা আসেন সতোপন্থ তালে পুজো দিতে। পুরাণে এই স্থানকে সত্যপদ বলে উল্লেখ করা রয়েছে। সতোপন্থ হিমবাহ

অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে। ডান দিকে বদ্রীনাথ পর্বতমালার একটি গিরিশিরা সোজা চলে গিয়েছে উত্তর দিকে, অপর একটি গিরিশিরা চলে গিয়েছে পূব দিকে। গিরিশিরার পাদদেশে পেঁছে গিয়ে শিপটন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—এই স্থানেই মূল জল-বিভাজিকা অতিক্রম করবার মতো সামান্য ঢাল রয়েছে। শিপটন দলবল নিয়ে ১৮৪০০ ফুট উচ্চতায় পেঁছে গিয়েছিলেন বিকেলবেলায়। সেখানে শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল। চারদিক থেকে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলেছিল স্থানটি। ভৌগোলিক অবস্থান অনুমান করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। গিরি-শিরার দুপাশে ঢালু অঞ্চল ও গাঢ় কুয়াশা ঢাকা। তাই আগামী ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পরদিন ভোরবেলায় উঠে ভালভাবে লক্ষ্য করে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। যে স্থানে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি কোন গিরিপথ নয়। বরং গিরিশিরার সামান্য ঢালু অংশ, যাকে স্যাড্‌ল বলা যেতে পারে। স্যাড্‌ল থেকে অপর পার্শ্বে দেখা যাচ্ছিল বিপজ্জনক হিমপ্রপাত। সেই হিমপ্রপাত প্রায় হাজার খানেক ফুট নীচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। সেখানে স্বল্প পরিসর স্থানে মোটামুটি খানিকটা সমতল স্থান। তারপর প্রায় আনুমানিক চার পাঁচ হাজার ফুট খাড়া উৎরাই। আকাশ পরিষ্কার, পূব দিক থেকে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। উৎরাইয়ের শেষ প্রান্তে তাই দেখা যাচ্ছিল ছবির মতো সবুজ উপত্যকার আভাস। শিপটন ও টিলম্যান যেন খানিকটা বিশ্বাস করেছিলেন প্রাচীন কালের পুরোহিত কি এই পথেই থামতেন কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথে। পুরো-হিতদের কথা ভাবতেই তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন শিপটন। এই দুর্গম পথে কি করে আসতেন তাঁরা এ যেন ভাবতেই পারছিলেন না। তবে সুদূর অতীতে হয়তো বা ভৌগোলিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছিল।

বেশ ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করবার পর শিপটন ও টিলম্যান দুর্গম হিমপ্রপাতের প্রথম পর্যায়ে অবতরণের পথ খুঁজে বার করেছিলেন। তার-পরের অংশ খুবই বিপজ্জনক। অবতরণ শুরু করতেই খাড়া বরফের ঢালের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অনেক স্থানে ছোটখাটো ঝুলন্ত উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সেখান দিয়ে অবতরণ অবাস্তব। নানা বাধা বিপত্তি এড়িয়ে অতি সাবধানে মোটামুটি পথ বানিয়ে মাত্র কয়েক শ' ফুট অবতরণ করবার পর হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ,

সামনেই বিশাল বরফের ফাটল। সেই ফাটল অতিক্রম করা অসম্ভব। তাই ফাটলের বাঁ দিক দিয়ে ঘেঁষে সংকীর্ণ বরফ ও পাথরের 'গালির' পাশ দিয়ে দড়ির সাহায্যে অবতরণ করেছিলেন একে একে সবাই। পোর্টারদের অবশ্য অবতরণের জন্য সাহায্য করা হয়েছিল। তুষারাবৃত হিমপ্রপাতের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল সবুজ বনানীতে ঘেরা সুদৃশ্য উপত্যকা। উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল সবাই। অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল, পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ক্রমে বরফের গা বেয়ে অবতরণ করতে করতে নীচে গভীর অরণ্যানীর সামনে পেঁছে গিয়েছিল সবাই। বন-ভূমিতে পেঁছিবার পূর্বে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে অবতরণ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কারণ, সেই পাহাড়ের গা ঘেঁষা পাথরগুলোর গা কেটে গভীর নালার সৃষ্টি করেছিল ছোট বড় জলধারা। ঢাল বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জলধারা উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এইসব জলধারা অতিক্রম করবার জন্য দু-এক স্থানে ছোটখাটো সেতুর মতো বানাতে হয়েছিল। আরো নীচে অবতরণের মুখে জলধারা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়ে দলবল নিয়ে দুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নিম্ন উপত্যকায় তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। বনভূমি থেকে মেঘ আর বৃষ্টি এগিয়ে আসছিল দ্রুতবেগে। ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। তাঁদের মালপত্র, খাদ্যবস্তুও ভিজে গিয়েছিল। অভিযানে যে পরিমাণ খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার চাইতে বেশীদিন অতিবাহিত হতে চলেছিল। ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সামান্য পরিমাণ ছাতু অবশিষ্ট ছিল, সেই সামান্য পরিমাণ ছাতুও আবার ক্যান-ভাসের থলিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ছাতু খেয়ে পেটে ব্যথা হয়েছিল সবারই। ওপর থেকে পাথরের টুকরো ছিটকে এসে দলমধ্যে শেরপা পাশাঙের পায়ে লেগেছিল। ফলে সে খালি হাত-পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অবতরণ করেছিল। গভীর জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করেই পথের নিশানা না পেয়ে শিপটন ও টিলম্যান দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল দিশেহারা হয়ে। খাদ্যের অভাব, আশ্রয় নেই, পথের চিহ্নমাত্র নেই, ভীত হয়ে পড়েছিল শেরপারা। হিমালয়ের জঙ্গলে বড় বড় ভাল্লুক বাস করে। ভাল্লুকগুলো খুবই হিংস্র। একদিন একটি বড় ভাল্লুক এগিয়ে আসছিল। খাদ্যাভাবে ও ভাল্লুকের ভয়ে কাবু হয়ে গিয়েছিল সবাই। খাদ্যাভাব লাঘব করবার জন্য শেরপারা জঙ্গল থেকে বাঁশের কচি গোড়াটুকু কেটে সেদ্ধ করে খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করতো। কচি বাঁশগুলো সাত আট ফুট দীর্ঘ। বাঁশগুলোর গোড়ায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি অংশ কচি।

সেইটুকুই শুধু খাদ্যোপযোগী ছিল। বৃষ্টির জন্য কচি বাঁশেরও অভাব। ভাল্লুকের ভয় তুচ্ছ করে শেরপারা কচি বাঁশের গোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো। সেই বাঁশের কচি অংশ ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে সামান্য লবণ দিয়ে সন্ধ্যায় ডিনার হিসাবে ব্যবহৃত হত। আঙথার্কে ও কুশাঙ্ বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাঁশ দিয়ে ছাওয়া রাত্রিবাসের আশ্রয় নির্মাণ করতো। সেখানে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত। প্রথম রাত্রিবাস বেশ কষ্টকর হয়েছিল। শুকনো বাঁশ, গাছের পাতা, ডাল সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাতে হত। সেই আগুন দু-তিন ঘণ্টা স্থায়ী থাকতো। আর আগুনের গরমে সবাই ভেজা পোশাক পরিচ্ছদ শুকিয়ে নিতো। মোটা-মুটি সবাই আগুনের মাঝখানে উষ্ণতার ভেতরে রাত্রিবাস করতো। ভোরের আলো দেখা দিতেই আবার চলতে শুরু করতো। সারাদিন চলতে চলতে মাত্র মাইল কয়েক চরাই উৎরাই পথ অতিক্রম করতেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তো। দিনের পর দিন পথ চলা, যাত্রা যেন শেষ হতে চায় না। এমনি অদ্ভুত দীর্ঘ অথচ রোমাঞ্চকর পদযাত্রা। দিন কয়েক অতিবাহিত করবার পর হঠাৎ সবাই সবিস্ময়ে কয়েকটি ঘর দেখতে পেয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল সবাই, এবার তাঁরা যথার্থই গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে। সেই গ্রাম থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে কেদারনাথ যাবার পথ।

এরিক্ শিপটন ও টিলম্যানের অভিযান ও সমীক্ষা—গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও অলকানন্দা উপত্যকা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পরবর্তীকালের অভিযাত্রীদের সহায়ক হবে। অলকানন্দা-মন্দাকিনী জল-বিভাজিকা অতিক্রম করা যে অবাস্তব নয়, শিপটনের অভিযানে সেই স্বাক্ষরই রেখে গিয়েছিল। এরিক শিপটনের পর ১৯৩৫ সনে বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ অডেন এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে ম্যাকডোনাল্ডকে সঙ্গী করে নিয়ে। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা করা, গোমুখ এর অবস্থা, গঙ্গোত্রী হিমবাহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সমীক্ষা অন্যতম উদ্দেশ্য। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে অডেন পৌঁছে গিয়েছিলেন মুসৌরী। তিনজন শেরপা—দা থণ্ডুপ, আঙশেরিং, পাশাঙ্ আঞ্জু ও পঁচিশজন পোর্টার সঙ্গে করে তাঁরা ৩রা অক্টোবর মুসৌরী ত্যাগ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন হারসিল। সেখানে স্থানীয় অধিবাসী জুইন সিংকে গাইড হিসাবে নিয়ে ১২ই অক্টোবর হারসিল ত্যাগ করেছিলেন গঙ্গোত্রীর পথে। জুইন সিং ১৯৩৩ সনে মার্কোপালিসের অভিযানে গাইডের কাজ করে অত্যন্ত পরিচিত হয়েছিল। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ পৌঁছে অডেন শিবির স্থাপন করেছিলেন। গোমুখ থেকে ম্যাক-

ডোনাল্ড্ এগিয়ে গিয়েছিলেন কেদারনাথ হিমবাহের[১] গতি প্রকৃতি সমীক্ষা করবার জন্য। অডেন ব্যাপৃত ছিলেন গোমুখ অঞ্চল জরিপ কার্যের জন্য। তিনি গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউটের অবস্থান, প্রান্তিক গ্রাবরেখা, ভাগীরথীর জলধারার উভয় তীরের উপরকার গিরিশিরার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। স্নাউট থেকে উপত্যকার দুই পাশেই সমীক্ষার পর স্নাউটের অবস্থান লক্ষ্য করে চিহ্নিত করেছিলেন স্থায়ীভাবে। অডেন স্নাউটের পশ্চাদপসারণ পরিমাপের জন্য জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর এই কার্যে সহায়তা করেছিলেন ভারতীয় জরীপ বিভাগের অফিসার জে-সি-রস্ ও ক্যাপ্টেন সি-ই-রাইট্। এই দল অক্টোবর মাসে গঙ্গোত্রী এসেছিলেন এই অঞ্চলে পুনরায় জরীপ কার্য সম্পন্ন করবার জন্য। অডেন প্লেন টেবল্ সার্ভের সময় সংগ্রহ করেছিলেন নানা তথ্য। সেই সব তথ্য সংশোধনের কার্যে সহায়তা করেছিলেন রস ও রাইট। অডেন গোমুখ থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউটের নিকটবর্তী অংশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট বেশ দ্রুতবেগে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। স্নাউটের সামনে ২৪০০ ফুট দীর্ঘ প্রায় সমতল গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর আর বালুকাপূর্ণ অংশ গত শতকে হিমবাহের বরফে আবৃত ছিল। স্নাউটের ওপরে বরফের গভীরতা পরীক্ষা করে অডেন লক্ষ্য করেছিলেন যে বরফের গভীরতা প্রায় ২০০ ফুট।

স্নাউটের আরো দূরবর্তী অংশে হিমবাহের বরফের গভীরতা আরো কম। সেখানে পার্শ্ব গ্রাবরেখার সদ্য বরফযুক্ত পাথরগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়ার প্রভাবে ভেঙে গিয়েছে। শীতের বরফ গলা জলে সিক্ত হওয়ার ফলে সেখানে তখনো কোনরূপ উদ্ভিদ বসবাস করতে শুরু করেনি। সেই অংশে হিমবাহ উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। হিমালয়ের হিমবাহ তুষারযুগে কত দূর নিম্ন অঞ্চলে অবতরণ করেছিল, সে যুগসন্ধিক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি অডেনের পক্ষে। এমন কি বর্তমান সময়ে ও হিমবাহের প্রবহমানতাজনিত উপত্যকার অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে আনুমানিক সময় ও কালের সামান্যমাত্র আভাস পাওয়া গিয়েছিল। গঙ্গোত্রী মন্দিরের মাইল খানেক ঢালু পথে ভাগীরথী উপত্যকার বাঁ দিকে পরিষ্কার গ্লেসিয়াল পেভমেন্টের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন অডেন। গোমুখ থেকে অবতরণের পথে গঙ্গোত্রীর ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় তিনি দেখেছিলেন সুস্পষ্ট তুষার যুগের স্বাক্ষর। গ্লেসিয়াল পেভমেন্ট ছাড়াও

১. কেদারনাথ হিমবাহের বর্তমান নাম—কীর্তিবামক

উপত্যকার উভয় পার্শ্বে উচ্চ গিরিশিরার ঢালের মুখেও দেখেছিলেন তুষার যুগের চিহ্ন। সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অডেন মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে—একদা গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ধারা এই চিহ্নিত অংশ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। গোমুখের দুপার্শ্বে গিরি গাত্রের ৫০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অংশে হিমবাহের পুরানো গ্রাবরেখার স্বাক্ষর রয়েছে। গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত মাঝামাঝি অংশে উপত্যকার পাদদেশ থেকে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে গিরিগাত্রে প্রাচীন গ্রাবরেখার চিহ্ন মুছে যায়নি আজো। বিশেষ করে গোমুখ থেকে সুখী পর্যন্ত ভাগীরথী ধারার উভয় পার্শ্বের গিরিগাত্র, উপত্যকা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছিলেন অডেন। তার মতে গঙ্গোত্রী থেকে জাংলা পর্যন্ত ভাগীরথী উপত্যকা প্রাচীন কালে হিমবাহ উপত্যকা ছিল। পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় হিমবাহ উপত্যকা পরিবর্তিত হয়ে নদী উপত্যকায় রূপান্তরিত হয়েছে ধীরে ধীরে। জাংলা থেকে হার্রসিল পর্যন্ত নদী উপত্যকা যেন আকস্মিক প্রশস্ত হয়েছে। অডেন এই ভৌগোলিক পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সুখীতে সাংঘাতিক ধস নেমে ভাগীরথীর গতিপথ রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে অবরুদ্ধ ধারা সঞ্চিত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য এমনি একটি নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় জলাধারের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে ভাগীরথী তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ভূমিক্ষয়, উপত্যকার পার্শ্বদেশ থেকে নেমে আসা পাথরগুলো এই জলাধারকে ভরাট করেছিল। অডেন বিশ্বাস করতেন, তুষার যুগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেমন সরস্বতী, আরোয়া, অলকানন্দা উপত্যকায় তুষার যুগের হিমবাহ বিস্তৃত ছিল বদ্রীনাথ পর্যন্ত।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট ও ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার পর অডেন যোগদান করেছিলেন ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কেদারনাথ পর্বতমালার অন্তত একটি আরোহণ করবেন। ম্যাক-ডোনাল্ড অবশ্য কেদারনাথ হিমবাহে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে ২১৫৮০ ফুট[১] উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতকে কেদারনাথ পর্বত বলে মনে করেছিলেন। এই পর্বতের গিরিশিরার এক স্থানে ঢালু অংশ লক্ষ্য করেছিলেন। সেই ঢালু অংশের পরই দুটি বিশাল পর্বত শিখর। তার একটিই মূল কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০

১. ২১৫৮০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশিখরের নাম ভারত খুণ্টা।

ফুট)। তাঁবু থেকে ম্যাকডোনাল্ড গঙ্গোত্রী হিমবাহের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন ২০000 ফুট থেকে ২১000 ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট সাতটি পর্বত শৃঙ্গ। সর্ব শেষে ম্যাকডোনাল্ড ও অডেন কোন পর্বত শৃঙ্গে আরোহণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

অডেন ও ম্যাকডোনাল্ড গঙ্গোত্রী হিমবাহ, হিমবাহের স্নাউট, ভাগীরথী উপত্যকায় ভাগীরথীর ধারা সম্পর্কে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নানা সমীক্ষার দ্বারা বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অডেন মূলতঃ ভূ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের গতিপ্রকৃতি, গ্রাবরেখার বৈশিষ্ট্য, হিমবাহ উপত্যকা সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টে ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

অডেনের পরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সম্পর্কে মূল্যবান সমীক্ষা ও জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন মেজর গর্ডন ওসম্যাস্টন। ১৯৩৬ সনে বর্ষার পূর্বেই ওসম্যাস্টন সদলবলে বেড়িয়ে পড়েছিলেন হিমবাহ অঞ্চলে জরীপকার্য সম্পন্ন করবার জন্য। তাঁর সঙ্গী ছিল দুজন সরকারী অফিসার, দশ জন সার্ভেয়র, পঞ্চাশ জন গাড়োয়ালী ও একশো পনের জন পোর্টার। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রচুর জরিপ কার্যের উপযোগী নানা যন্ত্রপাতি। ওসম্যাস্টন্ ২১শে এপ্রিল মুসৌরী ত্যাগ করে ২৩শে এপ্রিল পৌঁছে গিয়েছিলেন ধরাসু। ধরাসু থেকে উত্তর কাশী, সেখান থেকে ভাটোয়ারী হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন গাঙ্গনানী। গাঙ্গনানীতে অবস্থান করে—সেখানকার তপ্তকুণ্ডের পরিবেশ ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কুণ্ডের উৎস মুখে জলের তাপমাত্রা ১৫0° ফারেনহিট, কুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ছিল ১00° ফারেনহিট। কুণ্ডের জলে প্রচুর গন্ধকের গন্ধ অনুভব করা গিয়েছিল। গাঙ্গনানী থেকে ওসম্যাস্টন পৌঁছে গিয়েছিলেন হার্ষিল। সেখান থেকে ভৈরবঘাটি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ, গোমুখ থেকে এগিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গ্রাবরেখা অনুসরণ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগস্থলে। সেখানে ১৪২৩0 ফুট উচ্চতায় নন্দনবনে মূল শিবির স্থাপন করেছিলেন। গোমুখ থেকে নন্দনবন যাবার জন্য তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহের ডান দিকের পার্শ্ব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন বহু কষ্টে।

কারণ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা তাই হিমবাহ আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করেছিলেন। নন্দনবন থেকে ওসম্যাস্টন প্রথত গঙ্গোত্রী হিমবাহের

মূল উৎসস্থলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। মূল শিবির থেকে ভোরবেলায় রওনা হয়ে হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে এগুনো সম্ভবপর ছিল না। কারণ ভাগীরথী পর্বতমালার খাড়া গিরিশিরার পশ্চিম পার্শ্ব বেয়ে অনবরত পাথর পড়ছিল গ্রাবরেখার ওপরে। হিমবাহের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে অগ্রসর হওয়া বরং সহজসাধ্য ও নিরাপদ ছিল। বেলা দুটো নাগাদ কেদারনাথ পর্বতমালার পাশ দিয়ে মূল হিমবাহের বাঁকের মুখে শিবির স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী শিবিব স্থাপিত হয়েছিল স্বচ্ছন্দ বামকের দক্ষিণ পার্শ্বে। এই অঞ্চল সমীক্ষার পর ওসম্যাস্টন সদলবলে অগ্রসর হয়েছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহ অঞ্চলে জরীপ কার্যের জন্য। চতুরঙ্গী হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ্য শাখা হিমবাহ। এই শাখা হিমবাহের তেমন কোন নাম ছিল না। কিন্তু হিমবাহের গ্রাবরেখার বিচিত্র বর্ণের পাথর দেখে ও স্থানীয় অধিবাসীদের পরিচিত নাম অনুসারে ওসম্যাস্টন চিহ্নিত করেছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহ বলে। চতুরঙ্গী শব্দের অর্থ চার রঙ অর্থাৎ হিমবাহের গ্রাবরেখার সঞ্চিত পাথরগুলোর মধ্যে চার রঙের পাথরগুলোই দেখা যায়। ওসম্যাস্টনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয় জরিপ বিভাগ এই হিমবাহের নাম চতুরঙ্গী হিমবাহ বলেই মেনে নিয়েছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রায় সমস্ত অঞ্চল জরিপ কার্য সম্পন্ন করে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পর্বত শৃঙ্গগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করার পর ওসম্যাস্টন চতুরঙ্গী হিমবাহের সমস্ত অঞ্চল জরিপ করেছিলেন। জরিপ কার্যের সুবিধার জন্য তিনি ২০৯৭০ ফুট উচ্চতায় একটি সার্ভে স্টেশন করেছিলেন। ফলে সেই অঞ্চলের অনেক অপরিচিত অংশের জরিপ কার্য সম্পন্ন সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত অংশের সুউচ্চ পর্বত শিখরগুলোর অবস্থান ও উচ্চতাও চিহ্নিত হয়েছিল। চতুরঙ্গী হিমবাহের শাখা হিমবাহগুলোর পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছিল তাঁদের। ওসম্যাস্টন একটি অনামা শাখা হিমবাহ পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করে জরিপ করেছিলেন। জরিপ কার্যের পর শাখা হিমবাহের নামকরণ করেছিলেন খালিপেট বামক।[১] এই বামকটি জরিপ কার্যের সময় ওসম্যাস্টন ভোরবেলায় গাড়োয়ালী পোর্টারদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নীচের শিবির থেকে। তাড়াহুড়োর সময়, পোর্টাররা খাবার না খেয়েই বেরিয়েছিল। সময়ের অভাবে সঙ্গে

---

১. বামক শব্দের অর্থ ছোট শাখা হিমবাহ। বামক শব্দটি স্থানীয় নাম।

করে খাবারও নিয়ে আসতে পারেনি। ওস্‌ম্যাস্‌টনের সঙ্গে সারাদিন বরফের মধ্যে কাজ করেছিল অভুক্ত অবস্থাতেই। সমস্ত ঘটনাটি অবশ্য শুনেছিলেন ওস্‌ম্যাস্‌টন সাহেব। কোন কিছু না খেয়ে খালিপেট অবস্থায় পোর্টাররা বিনা প্রতিবাদে এই জরিপ কার্যে ওস্‌ম্যাস্‌টনকে সাহায্য করেছিল বলে, ওদের অনাহারজনিত কষ্টের কথা স্মরণ করেই শাখা হিমবাহের নামকরণ করেছিলেন খালিপেট বামক। এই নাম অবশ্য ভারতীয় জরিপ বিভাগ মেনে নিয়েছিল।

গঙ্গার উৎস স্থল গঙ্গোত্রী হিমবাহ। কতকাল পূর্ব থেকে এই হিমবাহের নামকরণ হয়েছিল সে তথ্য জানা নেই। ওস্‌ম্যাস্‌টন হয়তো তাই গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। জরিপ কার্যের সময় সার্ভেয়রদের মধ্যে একজন ফজল এলাহী চারজন পোর্টার নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেছিল। জরিপ কার্যের সময় একদিন প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল। ফলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তাঁবুর মধ্যে। তুষার ঝড় বন্ধ না হওয়ায় তাঁবুর ভেতরে আটকে পড়ে থাকতে হয়েছিল তাদের। ইতিমধ্যে তাদের খাদ্যবস্তু, ও জ্বালানীর প্রচণ্ড অভাব শুরু হতেই বাধ্য হয়ে তাঁবু পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল গোমুখ যাবার উদ্দেশ্যে। দুটি করে কম্বল সঙ্গে করে ফজল এলাহী চারজন পোর্টারকে নিয়ে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। তাঁবুর স্থান থেকে গোমুখের দূরত্ব ছিল পনের মাইল। কোমর অবধি নরম বরফের ভেতর দিয়ে অবতরণ করছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, রাত্রিতে অবস্থান করবার মতো কোনরূপ আশ্রয় ছিল না। ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় তারা বরফের ওপরে রাত্রি বাস করেছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। পরদিন তারা এত দুর্বল ও ক্লান্ত হয়েছিল যে-দুখানা করে কম্বল নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল গোমুখের উদ্দেশ্যে। গতি তাদের মন্থর থেকে মন্থরতর হতে শুরু করেছিল। সারাদিন চলে মাত্র তিন চার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছিল। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বরফের ওপরেই রাত্রি বাস করতে হয়েছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

দ্বিতীয় রাত্রি অতিবাহিত করবার পর তারা তাদের শেষ কম্বল পরিত্যাগ করে খালি পায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছিল। কয়েক পা চলবার পরই তারা বসে পড়েছিল বরফের ওপরে। পোর্টারদের মধ্যে দু-একজন শুয়ে পড়েছিল নরম বরফের ওপরেই। ফজল এলাহী বহু কষ্টে মাত্র একজন পোর্টারকে নিয়ে চলে এসেছিল গোমুখ। গোমুখ

থেকে অবশ্য উদ্ধারকারী দল মৃতপ্রায় অশক্ত পোর্টার তিনজনকে নিয়ে চলে এসেছিল গোমুখে। প্রচণ্ড তুষারপাতে, অনাহার অনিদ্রায় তারা যেন মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল অসহায় অবস্থায়। ফজল এলাহীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছিল। তার পা দুটো অসাড় হয়ে ফুলে গিয়েছিল হিম শীতল বরফের জলে। জুতো কেটে পা বার করতে হয়েছিল শেষটায়।

ওসম্যাসটনের জরিপ কার্য পূর্ববর্তীকালের জরিপকার্যের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে ফেলতে সাহায্য করেছিল। তাঁর সমীক্ষার ফলে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গতি প্রকৃতি, সেখানকার উল্লেখযোগ্য পর্বত শিখর-গুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। ওসম্যাসটনের পর ১৯৩৭ সনের জুন মাসে জে. টি. গিবসন্ ও জে. এ. কে. মার্টিন্ এসেছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে। গোমুখ থেকে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে। চতুরঙ্গী হিমবাহের উৎসের কাছেই এগিয়ে এসে চতুরঙ্গী হিমবাহের শাখা কালিন্দী বামকে উপস্থিত হয়েছিলেন। কালিন্দী বামক অনুসরণ করে তাঁরা মানা হিমবাহে অবতরণ করেছিলেন 'কল' অতিক্রম করে। অবশ্য তাঁরা কালিন্দীখাল অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ। গিবসন্ ও মার্টিন্ কালিন্দী বামক থেকে মানা হিমবাহে অবতরণের পথ খুঁজে বার করে পরবর্তী অভিযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৩৭ সনের পর গঙ্গোত্রী অঞ্চলের জরিপকার্য ও সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোন তথ্য অনুসন্ধানী না এলেও ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মান অভিযাত্রীরা এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গগুলি আরোহণ করা।

অস্ট্রোজার্মান দলের নেতা ছিলেন অধ্যাপক স্কুয়ার্জ গ্রুবার। দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন এডিএলমথালার, ডঃ ওয়ালটার ফ্রাউয়েন্ বারগার, টনি মেসজনার, লিও স্প্যানরাফট্ ও ডাক্তার রুডলফ্ জোনাস্। ওসম্যাসটন বিভিন্ন তথ্য ও নতুন সার্ভে ম্যাপ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এই দলকে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে গোমুখ থেকে অভিযাত্রীদল যাত্রা করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগ-স্থল নন্দনবনে (১৪২৩০ ফুট) মূল শিবির স্থাপন করেছিলেন। অভি-যানের উপযোগী খাদ্যবস্তু জ্বালানী ও পর্বতারোহণের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে গুছিয়ে নিতে তাঁদের বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিল। পরে, ৮ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা এলমথালার

ও মেসজ্নার মূল শিবির থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গে (২১৩৬৪ ফুট) আরোহণের জন্য। ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁরা শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন শেষ ২০০০ ফুট খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে। শৃঙ্গে আরোহণের জন্য উত্তর পূর্ব গিরিশিরা অনুসরণ করেছিলেন।

৮ই সেপ্টেম্বর অপর একটি দল—স্প্যানরাফ্ট্ ও ফ্লাউয়েন্ বার্গার্ চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে বাসুকী পর্বত (২২২৮৫ ফুট) শৃঙ্গের উত্তরে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলেন। পরদিন অর্থাৎ ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁরা দু-নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন সুরালয় বামক ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগ স্থলে ১৭০০০ ফুট উচ্চতায়। ১০ই সেপ্টেবর অভিযাত্রী দুজন চন্দ্রাপর্বতের (২২০৭৩ ফুট) পশ্চিম গিরি-শিরার ওপরে ১৯৯০০ ফুট উচ্চতায় তিন নম্বর শিবির স্থাপন করে-ছিলেন। সেখান থেকে সোজা ২১৭৩ ফুট উচ্চতায় বরফের ঢাল বেয়ে তাঁরা চন্দ্রাপর্বতের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন ১১ই সেপ্টেম্বর দুপুর বেলায়। শীর্ষ থেকে অবতরণের পর তাঁরা তিন নম্বর শিবির গুটিয়ে সোজা গিয়েছিলেন দু নম্বর শিবিরে। পরদিন অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁরা শিবির গুটিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন মূল শিবিরে। ফ্লাউয়েন্ বার্গার্ ও স্প্যান্রাফ্ট্ চন্দ্রাপর্বত জয়লাভ করবার পর মূল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেই মেস্জনার ও স্প্যানরাফ্ট্ চৌখাম্বা (২৩৪২০ ফুট) পর্বত শৃঙ্গে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহ অনুসরণ করে ১৫ই সেপ্টেম্বর হিমবাহের উৎসমুখে পেঁছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখে ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় স্যাডল্-এ আরোহণ করা। সেই 'স্যাডল্-এ আরোহণ করতে সমর্থ হলে অভিযাত্রী দুজন চৌখাম্বার পশ্চিম গিরিশিরা বেয়ে শীর্ষে পেঁছে যেতে পারবেন। কিন্তু গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎস মুখে পেঁছে যাওয়া অসম্ভব। সেখানকার বিপজ্জনক হিমপ্রপাত পর্যবেক্ষণ করে ফ্লাউয়েন্ বার্গার্ ও স্প্যান্রাফ্ট্ ২০শে সেপ্টেম্বর গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ দিক থেকে মান্দানী পর্বত শৃঙ্গে (২০৩২০ ফুট) আরোহণ করেছিলেন। একটানা দশ ঘণ্টা বরফের ঢাল বেয়ে তাঁরা পেঁছে-ছিলেন শীর্ষে। অবশ্য তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ স্থান থেকে চৌখাম্বার (২৩৪২০ ফুট) গিরিশিরা পর্যবেক্ষণ করে শীর্ষে আরোহণের সম্ভাব্য পথের সন্ধান খুঁজে পাওয়া। উদ্দেশ্য সার্থক না হলেও তাঁরা হাতের কাছে মান্দানী পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। অবতরণের

পর তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর পার্শ্বে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বচ্ছন্দ বামকের সংযোগ স্থলে। সেখানেই তাঁরা শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পিরামিডের মতো আকৃতি বিশিষ্ট তুষারাবৃত স্বচ্ছন্দ পর্বতের (২২০৫০ ফুট) শীর্ষে পেঁৗছেছিলেন দক্ষিণ গিরিশিরার গা বেয়ে। ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁরা পেঁৗছে গিয়েছিলেন মূল শিবিরে।

এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য অভিযাত্রীদের কয়েকজন শিবলিঙ্গ পর্বতে (২১৪৬৬ ফুট) আরোহণের সম্ভাব্য পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সার্থক হয় নি। সেখান থেকে অভিযাত্রীরা গনহিম বামকে পেঁৗছে খরচাকুণ্ড (২১৮৫০ ফুট) ও সুমেরু পর্বতে (২০৭৭০ ফুট) আরোহণের পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সার্থক হয়নি। অভিযাত্রীদের মধ্যে এল্‌মথালার্ ও ফ্রাউয়েন বর্‌গার্ মূল শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সতোপন্থ পর্বত শৃঙ্গে (২৩২১৩ ফুট) আরোহণের উদ্দেশ্যে। তাঁরা সুন্দর বামকের উৎসের কাছাকাছি সতোপন্থের পাদদেশের কাছেই শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা প্রথম সতোপন্থের উত্তরপূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ করে পর্বত শিখরে পেঁৗছে যাবার সম্ভাব্য পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন পরবর্তী শিবির স্থাপন করতে। সতোপন্থের উত্তর পূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উত্তর পশ্চিম গিরিশিরা অনুসরণ করে সতোপন্থের শীর্ষে আরোহণের পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু পরিশ্রম করে উত্তর পশ্চিম গিরিশিরায় আরোহণ করে তাঁরা ২০০০০ ফুট উচ্চতায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশিরার শেষ প্রান্তের দিকে খাড়া পাথরের দেওয়ালের সামনে পেঁৗছে গিয়েছিলেন তাঁরা। আর অগ্রসর হবার পথ না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এল্‌মথালার ও ফ্রাউয়েন বারগার পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করেছিলেন সতোপন্থ আরোহণের চেষ্টা প্রাক বর্ষায় করা উচিত। কমপক্ষে চার থেকে ছয় জন অভিযাত্রী উত্তর পূর্ব গিরিশিরা অনুসরণ করে শীর্ষে পেঁৗছে যাবার চেষ্টা করলে অভিযান সফল হতে পারে।

সতোপন্থ অভিযান ব্যর্থ হবার পর মূল শিবির থেকে স্প্যানরাফ্‌ট ও মেসজ্‌নার্ ৩০শে সেপ্টেম্বর বার্নি গিরিপথ বা কালিন্দী খাল অতিক্রম করে ভাগীরথী খড়ক হিমবাহে পেঁৗছে গিয়েছিলেন। ৯ই অক্টোবর তারিখে তাঁরা চৌখাম্বা (২৩৪২০ ফুট) পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথের

সন্ধান করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে চৌখাম্বার উত্তর পূর্ব গিরিশিরা বেয়ে ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় স্যাডল্-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। সাংঘাতিক বিপজ্জনক হিমানী সম্প্রপাতের জন্য আর অগ্রসর হতে পারেন নি তাঁরা। পরে ১৯শে অক্টোবর আবার কালিন্দী খাল অতিক্রম করে মূল শিবিরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এল্‌মথালার্, ফ্রাউয়েন বার্গার্, জোনাস ও দলপতি চতুরঙ্গী হিমবাহের দক্ষিণ পাড়ে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁরা দু নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায় চতুরঙ্গী পর্বতের (২০৯৮১ ফুট) দক্ষিণ গিরিশিরায়। ১লা অক্টোবর তারিখে দু'নম্বর শিবির থেকে অতি সহজেই চতুরঙ্গী পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। শীর্ষে পৌঁছে অভিযাত্রীরা শ্রীকৈলাস পর্বতের (২২৭৪২ ফুট) দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চতুরঙ্গী হিমবাহ অঞ্চল থেকে ফিরে এসে অভিযাত্রীরা মিলিত হয়েছিলেন মূল শিবিরে। সেখান থেকে একটি দল ৯ই অক্টোবর কেদারনাথ পর্বত আরোহণের (২২৭৭০ ফুট) চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আবহাওয়া ভাল না থাকায় ও বরফের অবস্থা আদৌ অনুকূল না থাকায় তাঁরা ফিরে এসেছিলেন ব্যর্থ হয়ে। এই সময় তাঁরা কেদারনাথ পর্বতের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে—কেদারনাথ পর্বত আরোহণ করবার চেষ্টা সম্ভব হতে পারে কেদারনাথ পর্বত সংলগ্ন বিশাল ডোম থেকে। সেই ডোমের উচ্চতা ২২৪১০ ফুট। এই পর্বত আরোহণের চেষ্টা প্রাক বর্ষায় হওয়া উচিত। কেদারনাথ পর্বত আরোহণের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর অভিযাত্রীরা মূল শিবিরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা ১৩ই অক্টোবর শ্রীকৈলাস পর্বত (২২৭৪২ ফুট) আরোহণের জন্য রক্ত-বরণ হিমবাহ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা অগ্রসর হয়ে রক্তবরণ হিমবাহ ও পিলাপানি বামকের সংযোগ স্থলে দু নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় ১৪ই অক্টোবর তারিখে। পরদিন ভোরবেলা বরফের ঢাল পেরিয়ে তাঁরা ২০২০০ ফুট উচ্চতায় শেষ শিবির স্থাপন করেছিলেন। ১৬ই অক্টোবর বেলা ১টা ৪৪ মিনিটে শ্রীকৈলাস পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে এই অঞ্চলের অভিযানের সমাপ্তি ঘটান।

অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রী দল দেড় মাস গঙ্গোত্রী হিমবাহ, চতুরঙ্গী হিমবাহ ও রক্তবরণ হিমবাহ অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই অঞ্চলের মুখ্য পর্বত শৃঙ্গগুলির মধ্যে ছয়টি শৃঙ্গে আরোহণ করে

বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া এই অঞ্চলের অধিকাংশ শাখা হিমবাহ, বিভিন্ন অংশের বরফের অবস্থা, ভোগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে সুন্দর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এই অঞ্চলে অবস্থান কালে।

অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রীদের অভিযান সমাপ্তির চার পাঁচ মাস পরে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ অডেন এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে। তিনি অবশ্য জানুয়ারী মাসে মোটর যোগে পেঁছে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে দেরাদুন। ২৮শে জানুয়ারী দেরাদুন, ঋষিকেশ, টেহরী, দানচুয়া, শ্রীনগর, নাগনাথ, পোখরী ও কর্ণপ্রয়াগ পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে সময় বাস রাস্তা ছিল না। পোর্টার আর দার্জিলিঙ থেকে আনা শেরপাদের নিয়ে সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৩২ সনে অডেন এই পথ দিয়ে রাণীক্ষেত গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ধানপুরে তামার খনি পরি-দর্শন করে উত্তর দিকের গিরিশিরা অতিক্রম করেছিলেন। মার্চ মাসের শুরু, উচ্চ হিমালয়ের শীতের বরফ তখনও গলা শেষ হয়নি। রাস্তা ঘাট দিয়ে খচ্চর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই ৪ঠা মার্চ তারিখে ধানোলটির গিরিপথ (৯,৪০০ ফুট) অতিক্রম করতে হয়েছিল বরফের ওপর দিয়ে। সেখান থেকে ল্যান্সডাউন নেমে যেতে হয়েছিল অডেনকে। বরফাবৃত গিরিপথ অতিক্রম করবার সময় খচ্চরের পিঠের মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেয়েছিলেন তিনি। ল্যান্সডাউন থেকে নতুন পোর্টার সংগ্রহ করে ৩রা এপ্রিল তারিখে অডেন গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ, টেহরী, নাকোরী। সেখান থেকে সিঙ্গোটি হয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন যমুনোত্রী। ১লা মে তারিখে তিনি যমুনোত্রীতে শিবির স্থাপন করে-ছিলেন—মন্দির অঞ্চল ছাড়িয়ে ১২০০০ ফুট উচ্চতায়। সমস্ত পথ ধরে ভাগীরথীর ধারা ও নদী উপত্যকা পর্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন যমুনোত্রী উপত্যকায়। সেখান থেকে যমুনোত্রী মন্দিরের উত্তর পূর্ব অংশে ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় হিমবাহে পেঁছে গিয়েছিলেন 'কল' পর্যন্ত। এই 'কল' অতিক্রম করে সম্ভবত ভাগীরথী উপত্যকায় পেঁছে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। এই 'কলে'র কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে টনস্ নদী বা তমসা নদী। 'কল' অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফিরে এসে যমুনোত্রী মন্দিরের কাছেই শিবির স্থাপন করে অডেন দুদিন ছিলেন যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ডের পাশেই। সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য তীর্থ-যাত্রীরা আসতেন—স্নান করতেন তপ্ত কুণ্ডে। সেই কুণ্ডের জলের তাপ-মাত্রা ছিল ১০৫° ফারেনহিট্।

যমুনোত্রী থেকে অডেন কুরুপা হয়ে উচ্চ গিরিশিরার ওপর দিয়ে

পৌঁছে গিয়েছিলেন থাড়োলে (১৩৩৬২ ফুট)। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন উপ্রিকোট্। উপ্রিকোটের পুরনো বন বিভাগের বাংলো বারাহাতের সন্নিকটেই অবস্থিত। উপ্রিকোট থেকে অডেন এগিয়ে গিয়ে শিবির স্থাপন করেছিলেন কালিথানায়। সেখান থেকে পুরো পথ উৎরাই, অডেন পরবর্তী শিবির স্থাপন করেছিলেন ভাগীরথীর তীরে থানোর গ্রামে (৪৩৮৪ ফুট)। ১০ইমে তারিখে সকালবেলা রওনা হয়ে ভাগীরথীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভাটোয়ারী। এমনি করে ভাটোয়ারী থেকে গাংগনানী, ঝালা হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন হারসিল্।

হারসিল্ বা হরিপ্রয়াগ এই অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাশ দিয়ে ভাগীরথী বয়ে গিয়েছে। উত্তর দিক থেকে আসা ছোট নদী মিলিত হয়েছে হারসিলে ভাগীরথীতে। এই ছোট জলধারার স্থানীয় নাম শ্যাম গঙ্গা। অডেন অবশ্য এই জলধারাকে শিয়াম গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছিলেন। শিয়াম গঙ্গা বা শিয়াম গড়ের উৎস স্থল শিয়াম হিমবাহ। কয়েকদিন বিশ্রাম করেই অডেন দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন শিয়াম উপত্যকায়। এই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। জলধারা অনুসরণ করে অডেন ১৪৫০০ ফুট উচ্চতায় শিয়াম হিমবাহের ওপরে প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলেন।

শিয়াম বা শ্যাম হিমবাহ থেকে ২৩শে মে অডেন জালান্দার উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ১৫৯০০ ফুট উচ্চতায় একটি 'কল' অতিক্রম করে। এই কলের ওপর থেকে নেলা বা ছোটথাগা গিরিপথের দৃশ্য অডেনকে আকৃষ্ট করেছিল। দলবল নিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন গিরিপথে। গিরিপথের ওপর থেকে অবতরণ করেছিলেন উত্তর পার্শ্ব বেয়ে খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে। তিনি হারসিলের অধিবাসী জুইন্ সিং, জগ্রু সিং, মোর সিং ও সিঙ্গিয়া সিংকে নিয়ে প্রায় ৩০০০ ফুট বরফের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছিলেন গ্লিসেড্ করে। অবতরণের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হিমশীতল বাতাসে শেরপাগুলো প্রচণ্ড কাশিতে ভুগছিল। বাধ্য হয়ে অডেন তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দার্জিলিঙ্।

হারসিলে ফিরে এসে অডেন জাড্ গঙ্গা বা জাহ্নবী গঙ্গার উৎস স্থলে অগ্রসর হয়ে সমস্ত উপত্যকা সমীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ওট্লে সবেমাত্র জাড্গঙ্গা উপত্যকা থেকে ফিরে এসে উইলসনের ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। অডেন ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিয়ে ওট্লের অতিথি হয়েছিলেন। অবশ্য কয়েকদিম বিশ্রাম নেবার

পর ওট্‌লে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন নেলা'র দিকে। অডেন দলবল নিয়ে কানিতালে পেঁছে গিয়েছিলেন। সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিলেন রাত্রি বাস করবার জন্য। কানিতাল কোকর উপত্যকায় অবস্থিত। ভোর হতেই দলবল নিয়ে অডেন পেঁছে গিয়েছিলেন দাদাপোখরী সার্ভে স্টেশনে। স্থানটির উচ্চতা ১৪৮১২ ফুট, সেখান থেকে শ্রীকান্ত পর্বত (২০১৩০ ফুট) ও গঙ্গোত্রী পর্বতমালার দৃশ্য অপূর্ব দেখায়। কোকর উপত্যকার শীর্ষে আরোহণ করে সমীক্ষার পর অডেন অবতরণ করেছিলেন হারসিলে। শ্রীকান্ত পর্বত থেকে সঞ্চিত বরফ গলে দুধ গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। সেই দুধ গঙ্গার ধারা এসে ধারালীর পাশ দিয়ে বয়ে ভাগীরথীর বুকে মিলিত হয়েছে।

হারসিল থেকে পরবর্তী অভিযান নেলাঙ্‌ অঞ্চলে জাহ্নবী গঙ্গা উপত্যকায়। অডেন এই অঞ্চল জরিপ, সমীক্ষা ও ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য পাঁচ সপ্তাহ সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। নেলাঙ্‌ গ্রাম থেকে এগিয়ে গেলেই গিরিপথ পেরিয়ে তিব্বতে পেঁছে যাওয়া যায়। জাহ্নবী গঙ্গার উৎস স্থল ও শাখা নদীগুলোর উৎস তিব্বত সীমান্তেই অবস্থিত। জাহ্নবী গঙ্গার সমস্ত সঞ্চিত জল এসে ভাগীরথীর বুকে ঢেলে দিয়েছে ভৈরবঘাটিতে।

হারসিল থেকে জাহ্নবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে নেলাঙ্‌ গ্রামে পেঁছে যেতে অডেনের লেগেছিল তিন দিন। ৩১শে মে থেকে আরো তিন দিন গ্রামে অবস্থান করতে হয়েছিল উচ্চ উপত্যকায় অগ্রসর হবার প্রস্তুতির জন্য। গ্রাম পেরিয়ে অবশ্য একদিনেই উচ্চ গিরিশিরা বেয়ে ১৮২০ ফুট উচ্চতায় পেঁছে গিয়েছিলেন জাহ্নবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে। সেখান থেকে আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন পুলমাসুমদা। এই স্থানটি বকরিওয়ালাদের রাত্রি বাসের জন্য অতি মনোরম স্থান। সেখান থেকে কিছুটা উৎরাই পেরিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন মিণ্ডি। স্থানটির উচ্চতা ১৫৭০০ ফুট। আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তুষারপাত আর হিমশীতল বাতাসের মধ্যেই রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু স্থাপন করতে হয়েছিল। পরদিন ৮ই জুন তারিখে প্রচণ্ড তুষার ঝড় অগ্রাহ্য করেই অডেন পেঁছে গিয়েছিলেন বিখ্যাত গিরিপথ সাঙ্‌ চোখ্‌-লা (১৭৫০০) ফুট। সাঙ্‌ চোখ্‌-লা পেঁছেই অডেন ভেবেছিলেন—সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা সহজসাধ্য হবে। সেখান থেকে হোপ গড়ের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে গ্রীস্‌ব্যাচ্‌ ব্যর্থ হয়েছিলেন খারাপ আবহাওয়ার জন্য। হোপগড়ের ধারা এসে জাহ্নবী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে।

হোপগড়ের উৎস স্থল, সেখানকার বরফের অবস্থান, কোন কিছুই পর্য-বেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি খারাপ আবহাওয়ার জন্য।

এই উচ্চ গিরিপথ থেকে জাহ্নবী গঙ্গা উপত্যকার ঢালু অংশ বেয়ে ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পেরিয়ে জাংলা পর্যন্ত সমস্ত অংশকে গুমু গুমু নালা বলা হত। এই পথ অনুসরণ করে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা আসতো পসরা নিয়ে। হার্রসিলে তাদের অস্থায়ী আস্তানা গড়ে উঠতো।

সাঙ্ চোখ্-লা পরিত্যাগ করে অডেন পেঁছে গিয়েছিলেন পুনুমা-সুমুদা। সেখান থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন চৌরাজি উপ-ত্যকায়। প্রচণ্ড তুষারপাত ও বৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিজে ভিজে পিচ্ছিল পাথর আর গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর, কাদা ভেঙে পেঁছে গিয়েছিলেন সেতুরগড় বুগিয়ালে (১৫০০০ ফুট)। মোটামুটি নির্ভরশীল পরিবেশ লক্ষ্য করে সেখানেই রাত্রিবাসের জন্য শিবির স্থাপন করেছিলেন। এই অঞ্চল বিশেষ করে সুন্দু দু সুমুদার (যে অংশ জাহ্নবী গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত) ভৌগোলিক পরিবেশ ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ হয়নি। জরিপ কার্য সম্পন্ন না হওয়ার ফলে বিশ্বাসযোগ্য কোন মানচিত্র রচিত হয়নি। ফলে জাহ্নবী গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট জলধারার উৎস ও গতিপথের ভৌগোলিক অবস্থানও পর্যবেক্ষণ করা হয় নি। অডেন সে জন্য নির্দিষ্ট পথের নিশানা না পেয়ে চৌরাজি উপত্যকার দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে চাঙানসু (পররর্তী মানচিত্রে নীলপানি গড়) পর্যন্ত অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। অডেন জানতেন, এই পথ বেয়ে পূর্বদিক এগিয়ে গেলে তিব্বতে অবতরণ করতে হতে পারে অথবা কোনক্রমে রঙবুজি উপত্যকায় অবতরণ হতে পারে। রঙবুজি উপত্যকায় অবস্থিত তিরপানিতে জাহ্নবী গঙ্গার ধারা এসেছে। অডেন জাহ্নবী গঙ্গার ধারা, এই ধারার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধারা ও সেই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত উপত্যকাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

৯ই জুন তারিখে ১৫৭০০ ফুট উচ্চতায় প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে বহুকষ্টে তাঁবু স্থাপন করে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। পরদিন সকাল হতেই উপত্যকা অনুসরণ করে চড়াই ভেঙে অগ্রসর হয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্বে। তারপর সোজা দক্ষিণে এগিয়ে গিয়েছিলেন 'কলে'র (Col) উদ্দেশ্যে। অডেনের অবশ্য ধারণা হয়েছিল তিনি যথার্থই চুঙানুমু'র দিকে এগিয়ে চলেছেন। পাঁচদিন ধরে একনাগাড়ে তুষারপাত চলছিল। নরম তুষার দানাবেধে শক্ত হতে শুরু হয় নি। ফলে নরম তুষার সবার জুতোয় জমে পা দুটো ভারী হয়ে গিয়েছিল। খাড়া গিরিশিরার গা বেয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। যে কোন সময় পা

পিছলে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। 'কলের' (Col) দিকে এগুতেই তাঁরা আবার নতুন করে তুষার ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বেলা তিনটের সময় 'কলের' (Col) ওপরে পেঁছে গিয়েছিলেন। তুষারপাতের বেগ কিছুটা কমতেই পূর্বদিকের উপত্যকা অস্পষ্ট ছবির মতো দেখা যাচ্ছিল। আকাশ আরো পরিষ্কার হতেই পূর্বদিকে বহু নীচে ছবির মতো যে উপত্যকা দেখা যাচ্ছিল, সেটি তিব্বতের কোন উপত্যকা। অডেনের বিশ্বাস হয়েছিল এই অংশটি হোপগড়ের উচ্চ অংশ। এই হোপগড়ের জলধারা জাহ্নবী গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আকাশ আরো পরিষ্কার হতেই দক্ষিণ দিকটায় আরো একটি 'কল' (Col) দেখা গিয়েছিল। 'কল'টি সম্ভবত সোনামধরের দিকে। অডেন দলবল নিয়ে দক্ষিণ পূর্বে অবতরণ করেছিলেন। নিম্ন উপত্যকায় তখনও বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রচুর তুষার গিরিগাত্র ও গিরিখাদের গায়ে সঞ্চিত হয়েছিল। সেই গিরিখাদ চুঙানমু (নীলাপানি) ১৫৫০০ ফুট পর্যন্ত যুক্ত ছিল। আরো দক্ষিণে যে 'কল' (Col) দেখা যাচ্ছিল, তার উচ্চতা ১৯৩০০ ফুট। সেই 'কলে' (Col) আরোহণ করে অডেন তাঁর আনিরয়েড ব্যারোমিটারে উচ্চতা লক্ষ্য করেছিলেন ১৮৫০০ ফুট। কারণ চুরাজি উপত্যকার ১৬০০০ ফুট উচ্চতা থেকে কলে আরোহণ করতে যতটা সময় লেগেছিল, তাতে 'কলে'র উচ্চতা ১৯৩০০ ফুট না হওয়াই উচিত।

১১ই জুন তারিখে অডেন দলবল নিয়ে চুঙানমু ও মানাগড়ের সঙ্গম স্থলে নীলাপানিতে (১২৯৫০ ফুট) অবতরণ করেছিলেন। শেষের মাইল তিনেক পথে গ্র্যানাইট পাথরের ওপরে ছড়ানো গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর। বৃষ্টির জলে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। সেই পিচ্ছিল ও খাড়া পথ ধরে অবতরণ বেশ কষ্টকর ও ক্লান্তিকর হয়েছিল। গ্রীচ্ব্যাচ্ ১৮৮৩ সনে নেলাঙ্ থেকে মুনিঙ্ গিরিপথে যাবার সময় হোপগড়ের ওপর দিয়ে ১৯০০০ ফুট উচ্চ গিরিপথ জাডফু যাওয়াই সহজসাধ্য মনে করেছিলেন। কারণ, চুঙানমু গিরিখাত অনুসরণ করে এই পথে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য মনে করেছিলেন। সোনামধরের ওপর দিয়ে যাবার সময় অডেন যে 'কল' অতিক্রম করেছিলেন, মুনিঙ্ গিরিপথ তার পূর্বে। গ্রীচ্ব্যাচ্ এই সম্পর্কে লিখেছিলেন নেলাঙ গ্রামের অধিবাসীরা ভেড়া বকরি নিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর পূর্বে এই পথে যাতায়াত করতো। কিন্তু পরে, এই পথ (অর্থাৎ চুঙানমু গিরিখাত অনুসরণ করে) অপ্রচলিত হয়েছিল পথ দুর্গম বলে। অডেনও অবশ্য নেলাঙ্ গ্রামে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলেন যে

চুঙান্‌মু মানাগড়ের পাঁচ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে কোন গ্রামবাসী ভেড়া বক্‌রি নিয়ে যায় না। অডেনের দলের সঙ্গীদের অনেকেই প্রতি বছরই নেলাঙ যায় কিন্তু মানাগড়ের ওপরে যায় না কেউই। মুনিঙ গিরি-পথ অতিক্রম করার খবরও রাখে না তারা।

নীলাপানির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে অডেন এগিয়ে গিয়েছিলেন মানাগড়ের দিকে। এই পথে পুরনো গ্রাবরেখার পাথরগুলো বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে বেশ কিছুটা রঙের পরিবর্তন হয়েছিল। এই সব পাথরগুলো সমীক্ষা করতে করতে পেঁছে গিয়েছিলেন মানা বামাকের একটি অংশে। সেই বামাকের অতি পুরনো বরফে ও পাথরে সুদূর অতীতের তুষার যুগের স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল। অবশেষে তারা ত্রিধারার পশ্চিমে শিবির স্থাপন করেছিল ১৪৮০০ ফুট উচ্চতায়।

শিবিরের স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে অডেন মানা বামাক থেকে আরোয়া বামাকে পেঁছাবার জন্য সম্ভাব্য ২০৩০০ ফুট উচ্চ গিরিপথ চিহ্নিত করেছিলেন। এই গিরিপথ পেরুতে পারলে অতি সহজেই পেঁছে যাওয়া সম্ভব হবে চতুরঙ্গী উপত্যকায়। তারপর চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে যাওয়া যাবে গঙ্গোত্রী। অবশ্য ১৯৩৭ সনে মার্টিন এই গিরিপথ অনুসরণ করে পেঁছে গিয়েছিলেন কালিন্দী বামাক। সেখান থেকে 'কল' অতিক্রম করে পেঁছে গিয়েছিলেন চতুরঙ্গী হিমবাহে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অডেন পরবর্তী শিবির স্হাপন করেছিলেন মানা বামাকে ১৮০০০ ফুট উচ্চতায়। পরদিন ভোরে আকাশ খুবই পরিষ্কার ছিল। তাই মানা বামাকের দক্ষিণ পশ্চিম শাখা অনুসরণ করে পেঁছে গিয়েছিলেন ১৯০০০ ফুট উচ্চতায়। সমোন্নতি রেখা (contour) অনুসারে স্হানটির বরফের ঢাল ৩০° ডিগ্রী হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেখা গিয়েছিল বরফের ঢাল আরো বেশী, তাই 'কলে'র ওপর পর্যন্ত শেষ ১০০০ ফুট উচ্চতায় আরোহণ খুবই কষ্টকর হয়েছিল। টপোশীটে যে ভাবে চিহ্নিত ছিল আসলে তা ঠিক না হওয়ায় অডেনকে বেশ ভুগতে হয়েছিল। কারণ, গিরিপথটি আরোয়া ও মানা বামাককে যুক্ত করেনি। বরং গিরিপথটি যুক্ত করেছে মানা বামাকে অপর একটি শাখার সঙ্গে। সামনেই আর একটি সহজ সাধ্য 'কল' দেখা যাচ্ছিল। 'কলের' উচ্চতা ১৯৫০০ ফুট। তার শেষ প্রান্তে মানা বামাকের দক্ষিণ পূর্বে ঢাল। সেই ঢাল বেয়ে চার মাইল পূর্বে এগিয়ে গেলে সরস্বতী উপত্যকায় অবতরণ করা যায় অতি সহজেই। সেই সরস্বতী উপত্যকা থেকে সহজেই পেঁছে যাওয়া যায় আরোয়া উপত্যকায়। সেখান থেকে কালিন্দী খাল

বেয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে পেঁৗছে যায় গঙ্গোত্রী। অডেন সময় হিসেব করে নিরস্ত হয়েছিলেন এই পথ অনুসরণ করে গঙ্গোত্রী যেতে। তিনি অবশ্য গঙ্গোত্রী যাবেন। তাই মানাগড় হয়ে জাদাফুগড় দিয়ে পেঁৗছে গিয়েছিলেন নেলাঙ্। সেখান থেকে পেঁৗছে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী।

গঙ্গোত্রীতে স্বল্প কালের জন্য অবস্থান করে ২৩শে জুন তারিখে অডেন কেদার গঙ্গা উপত্যকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেদার গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে খাড়া পাথরের ঢাল বেয়ে এগুতে হয়েছিল। দু মাইল পথ পেরুতে অডেনের লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা। তখন একটানা বৃষ্টি পড়ছিল। পিচ্ছিল খাড়া পথ, ক্লান্ত হয়ে অডেন দলবল নিয়ে সুদৃশ্য কেদার তালের ধারে শিবির স্থাপন করেছিলেন। গাঢ় মেঘ ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার হতেই দক্ষিণ পূর্বে ২২৬৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ ফাটিঙ্ পিথোয়ারা দেখা যাচ্ছিল। এমনি এক অপরূপ পর্বতশৃঙ্গের এই অদ্ভুত নাম রেখেছিল ভারতীয় জরিপ বিভাগ। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে, এই স্থানে বিখ্যাত ভৃগু ঋষি তপস্যা করবার জন্য অবস্থান করেছিলেন। তদনুযায়ী পর্বত শিখরটির নাম ভৃগুকোটি হওয়া উচিত ছিল। ঠিক এই পর্বত শিখরের উত্তরে অপর একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। তার নাম ভৃগুপন্থ অর্থাৎ ভৃগু ঋষি যে পথ অনুসরণ করে গিয়েছিলেন পর্বতশিখরের দিকে তার নাম ভৃগু পন্থ।

পরদিন কেদার তাল থেকে তিন মাইল পথ পেরিয়ে পেঁৗছে গিয়েছিলেন হিমবাহের ওপরে। উপত্যকার শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছিল গণেশ পর্বত (২১২১০ ফুট)। কিন্তু মেঘ এসে সমস্ত অঞ্চল ঢেকে ফেলায় শৃঙ্গটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তবে গণেশ পর্বত আরোহণের চেষ্টা করতে হলে কেদার গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

২৫শে জুন তারিখে আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। অডেন দলবল নিয়ে ১৬৫০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কেদার গঙ্গা উপত্যকা ও রুদ্র গঙ্গা উপত্যকার মধ্যবর্তী 'কলে' পেঁৗছে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকলে গঙ্গোত্রী শৃঙ্গগুলোর অপরূপ দৃশ্য দেখা যেতো। 'কলে'র ওপর থেকে সোজা পশ্চিমে অবতরণ করতে শুরু করেছিল সবাই। শেষ পর্যায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরের ঢাল বেয়ে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় সুন্দর রাত্রি বাসের উপযোগী স্থান

নির্বাচন করা হয়েছিল। সেখানেই শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। স্থানটি রুদ্রগঙ্গা উপত্যকার মধ্যে। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। একটানা বৃষ্টি। ষাট ঘণ্টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পর আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করেছিল। ২৭শে জুন তারিখে ভোরবেলায় অডেন দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল হিমবাহের দিকে। সেখান ১৫৯০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিল। উদ্দেশ্য, পরদিন রুদ্রগঙ্গা উপত্যকা ও খার্টালিঙ্ উপত্যকার মধ্যবর্তী 'কল' অতিক্রম করে খার্টালিঙ্ উপত্যকায় অবতরণ করা। পর দিন ২৮শে জুন সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যার দিকে আকাশ পরিষ্কার হতেই আকাশে চাঁদ উঠেছিল। চাঁদের আলোয় তুষার মণ্ডিত গণেশ পর্বত অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

১৯৩৫ সনে অডেন ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে রুদ্রগঙ্গা উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, আর ম্যাকডোনাল্ড বন্দর পুঞ্চ পর্বত অভিযানের জন্য পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই খার্টালিঙ্ হিমবাহে অবতরণের 'কল' সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে ভারতীয় জরিপ বিভাগ ১৯৩৬ সনের জরিপ অনুযায়ী মানচিত্রে এই 'কল' চিহ্নিত করে কলের উচ্চতা ১৮০০০ ফুট বলে নির্দেশিত করেছিল। মূল গিরিশিরার দক্ষিণাংশে সেই 'কলে'র অবস্থান। অডেন পর্যবেক্ষণ করে কলের অবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় ৬-১০ মিনিটে দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আবহাওয়া খুবই ভাল, পরিষ্কার আকাশে তাঁরা বেলা ৮-২০ মিনিটে কলের ওপরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বরফের ঢাল বেয়ে আরোহণ তেমন কষ্টকর ছিল না। শুধু বরফের ফাটল এড়িয়ে সন্তর্পণে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়েছিল। 'কলে'র ওপর থেকে অবতরণ সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, খাড়া বরফের ঢাল। সহজ-ভাবে অবতরণ করতে গেলে শক্ত বরফে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দড়ির প্রয়োজন হয়েছিল তাই। বরফের ধাপ বানিয়ে দড়ির সাহায্যে নামতে সাহায্য করতে হয়েছিল। এর মধ্যেই মাঝে মাঝে পা হড়কে যাচ্ছিল অনেকেরই। অবশেষে বরফের খাড়া ঢাল পেরুতেই তারা এক বিশাল তুষারক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিল। বেলা ৯-৪৫ মিনিটে, সূর্য প্রখর হতে চলেছিল। সদ্য জমা বরফ নরম হয়ে গিয়েছিল। তাই খার্টালিঙ্ হিমবাহ বয়ে দু মাইল পেরুতেই সবাই ভস্‌ভসে নরম বরফে চলতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। হিমবাহটি পূর্বদিকে মোড় নিয়েছে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখা গিয়েছিল ১৬৬০০ ফুট উচ্চতা থেকে

১৪৬০০ ফুট পর্যন্ত এই হাজার খানেক ফুটে হিমপ্রপাত। হিমপ্রপাতের আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কিছুই নির্দেশিত ছিল না মানচিত্রে। জরিপ করবার সময় হয়তো হিমবাহের বরফ ভাঙাচোরা লক্ষ্য করেছিল দূর থেকেই। যাই হোক হিমপ্রপাতের মুখোমুখী পেঁছিই জুইন্ সিং এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বরফের বিশাল বিশাল স্তূপগুলো লাফ দিয়ে ধাপে ধাপে অবতরণ করেছিল। বরফের ফাটলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লাফ দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে অনুসরণ করেছিল সবাই। পিঠে ভারী রুকস্যাক নিয়ে পিচ্ছিল শক্ত বরফের ধাপ পেরিয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে অবতরণ করা খুবই কৃতিত্বের বিষয়। হিমপ্রপাত পেরুবার পরই স্তূপীকৃত পাথরের ঢাল। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে জুইন্ সিং সবার আগে আগে গিয়েছিল। ঢালের শেষ প্রান্তে বড় বড় পাথর, অনেকগুলো পাথরই আবার জলে অর্ধ নিমজ্জিত। পাথরের ওপরে শেওলার মতো। সাংঘাতিক পিচ্ছিল সেই পাথর টপকে সন্ধ্যা নাগাদ ১৪২০০ ফুট উচ্চতায় খাটলিঙ হিমবাহের বাঁ-পাশের দেয়াল ঘেঁষে (উত্তরে) নিরাপদ রাত্রি বাসের স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। সবাই ক্লান্ত, তবু দ্রুত তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হয়েছিল। আকাশ পরিষ্কার।

পরদিন খাটলিঙ্ হিমবাহের স্নাউটে পেঁছে গিয়েছিল। স্নাউট থেকে মোড় ঘুরতেই দক্ষিণ পশ্চিমে বেশ নীচে সবুজ উপত্যকা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল সবাই। উৎসাহিত হয়ে দ্রুত অবতরণ করতে শুরু করেছিল সামান্য বিশ্রাম নেবার পরই। একটানা চার ঘণ্টা পাথরের ঢাল পেরিয়ে সবাই পেঁছে গিয়েছিল সুদৃশ্য তৃণাঞ্চলে। তারপর ভূজগাছ ও উইলো গাছের ঝোপঝাড় ভেঙে কোথায় ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল খাটলিঙের জলধারা অনুসরণ করে। খাটলিঙ্ হিমবাহের বরফ গলা জলধারার নাম ভীল গঙ্গা। সেই ভীল গঙ্গা বা ভিলাঙ গঙ্গার বাঁ দিকের তীর ধরে এগুনো সহজসাধ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু এই পথের প্রথম গ্রাম গাঙ্গী—ভীল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে। বাম তীর ধরে এগিয়ে গেলে নদী পেরুতে হবে গ্রামে পেঁছবার জন্য। সে ক্ষেত্রে নদী পেরুবার জন্য বরফের সেতু থাকলেও এই সময়ে বরফ হয়তো বা গলে যেতে পারে। অবশ্য এই পথে তিনটি বফফের সেতু ছিল। সর্বশেষ সেতু ছিল ১০৮০০ ফুট উচ্চতায়। যাই হোক, অডেন কিন্তু বরফের সেতুর ভরসা না করে নদীর দক্ষিণ তীর অনুসরণ না করে ১লা জুলাই তারিখে পেঁছে গিয়েছিলেন গাঙ্গীগ্রামে। গ্রামের অধিবাসীরা তাঁদের অভ্যর্থনা করেছিল সেদিন। গ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকেই অডেন

শুনেছিলেন নানা কথা। গ্রামের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এই পথ ধরে 'কল' অতিক্রম করে পেঁছে যেতেন রুদ্রগঙ্গা উপত্যকায়। সেখান থেকে পেঁছে যেতেন গঙ্গোত্রী। সে সব অনেককালের কথা। সেকালের পথ তেমন দুর্গম ছিল না। অর্থাৎ 'কল' অতিক্রম করা তেমন দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল না। তখন 'কল' অনেকটা দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল।

অডেন অবশ্য মনে করেছিলেন—প্রবাদ যদি সত্যই হয়, তাহলে হিমবাহের গতি প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, অতীত যুগের তথ্য অনুসারে তুষারাবৃত কল অতিক্রম করে গাঙ্গী গ্রামের অধিবাসীরা গঙ্গোত্রী তীর্থ দর্শনে যেতেন।

গাঙ্গী গ্রামে দু'একদিন অবস্থানের পর অডেন দলবল নিয়ে ছয় দিনে পায়ে হেঁটে পেঁছে গিয়েছিলেন মুসৌরী।

অডেন যে সময় গঙ্গোত্রী, জাহ্নবী গঙ্গা উপত্যকা, কেদার গঙ্গা উপত্যকা, রুদ্র গঙ্গা উপত্যকা ও ভীল গঙ্গা উপত্যকা সমীক্ষায় ব্যাপৃত ঠিক সেই সময় সুইস্ অভিযাত্রীদল এসেছিলেন পর্বতারোহণ উপলক্ষ্যে। দলের নেতা ছিলেন আন্দ্রে রস্। তিনি নন্দাদেবীর উত্তর গিরিশিরায় অবস্হিত—দুনাগিরি (২৩১৮৪ ফুট), কোশা হিমবাহ অঞ্চলে অবস্থিত হাতী পর্বত (২২০৭০ ফুট), গৌরী পর্বত (২২০১০ ফুট), রতবন পর্বত (২০২৩০ ফুট) ও সর্বশেষে চৌখাম্বা পর্বত (১) ১৩৪২০ ফুট, শৃঙ্গে আরোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে রামণী হিমবাহে পেঁছে ৫ই জুলাই তারিখে ২১৬৫০ ফুট উচ্চতায় শেষ শিবির স্হাপন করে দুনাগিরি পর্বতে আরোহণ করেছিলেন। ৮ই আগস্ট তারিখে রতবন পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছিলেন অভিযাত্রীরা। গৌরী পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছিলেন ১৮ই আগস্ট। কুমায়ুন অঞ্চল থেকে রস দলবল নিয়ে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে পেঁছে গিয়েছিলেন সতোপন্থ হিমবাহে। সেখান থেকে ১৮৮৮০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্হাপন করেছিলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর আকস্মিক সাংঘাতিক হিমানী সম্প্রপাতে সমস্ত তাঁবুগুলো ভেসে গিয়েছিল। বরফের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল গোম্বু। অভিযান পরিত্যক্ত হয়েছিল।

১৯৩৯ সনে নাঙ্গা পর্বতে আরোহণের জন্য সহজসাধ্য পথের সন্ধানে গিয়েছিলেন জার্মান অভিযাত্রী পিটার আউস্‌নেইতার ও হেইনরিখ্ হেরার। তাঁদের কাজ সমাপ্তির শেষে করাচী অপেক্ষা করেছিলেন ১৯৪০

সনে দেশে ফিরবার আশায়। ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বৃটিশ সৈন্যদল তাঁদের দুজনকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে দেরাদুনে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

১৯৪৩ সনে হেইনরিখ হেরার ও পিটার দুজনে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সারারাত ধরে চলতেন তাঁরা দুজনে. দিনের আলোয় গভীর বনের মধ্যে থাকতেন আত্মগোপন করে। এমনি করে পেঁছে গিয়েছিলেন হারসিল। হারসিলের ডাকবাংলোয় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে ফেরত পাঠিয়েছিল দেরাদুনে বন্দী শিবিরে। পরের বৎসর ১৯৪৪ সনে মে মাসে আবার পালিয়েছিলেন দেরাদুন থেকে। সারারাত ধরে চলতেন, গভীর বনে উচ্চ পর্বত শিখরে থাকতেন আত্মগোপন করে। এমনি করে হারসিল পেরিয়ে জাহ্নবী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পেঁছে গিয়েছিলেন নেলাঙ্ গ্রামে। সেখান থেকে আরো এগিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন সাঙ্চোখ-লা। ১৭ই মে তারিখে সাঙ্চোখ-লা পেরিয়ে পেঁছে গিয়েছিলেন তিব্বতে। তিব্বতে দীর্ঘ একুশ মাস বিভিন্ন উচ্চ-গিরি পথ অতিক্রম করে পেঁছে গিয়েছিলেন লাসা। হেরারে এই দুঃসাহসী ভ্রমণের সময় সুন্দর একটি মানচিত্র রচনা করেছিলেন।

মহাযুদ্ধের জন্যই হয়তো ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অভিযাত্রী আসেননি গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে। ১৯৪৭ সনের মে মাসে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে একদল অভিযাত্রী শিবির স্থাপন করেছিলেন সতোপন্থ হিমবাহের কাছে! অভিযাত্রীদলের নেতা হলেন উইলি—নীলকণ্ঠ পর্বত (২১৬৪০ ফুট) শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ঠিক সেই সময় জুন মাসে সুইস অভিযাত্রীদল গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে এসেছিলেন পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যে। ১১ই জুন তারিখে নন্দনবনে পেঁছেছিলেন। সেখান থেকে কীর্তি হিমবাহ অনুসরণ করে কেদারনাথ ডোম (২২৪১০ ফুট) আরোহণ করেছিলেন ২৫শে জুন। সেখান থেকে তারা কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ করবার সময় শেরপা সর্দার ওয়াংদিও সুটার পা হড়কে ৭০০ ফুট নীচে পড়ে যান। ওয়াংদির আঘাত গুরুতর দেখে তাকে দ্রুত নীচে পাঠিয়ে দেরাদুন হাসপাতালে পেঁছে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১১ই জুলাই তারিখে রস, ডিটার্ট, গ্র্যাভেল, সুটার ও তেনজিং নোরগে কেদারনাথ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। সেখান থেকে দলবল নিয়ে দলনেতা রস চতুরঙ্গী হিমবাহে পেঁছে যান। সেখানে সুন্দর বামাকে শিবির

স্থাপন করেন। ১লা আগস্ট তারিখে ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় গিরিশিরার ওপরে শিবির স্থাপন করে সতোপন্থ পর্বত (২৩২১৩ ফুট) শৃঙ্গ আরোহণ করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা কালিন্দী খাল অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সরস্বতী উপত্যকায়। সেখানে বালবালা পর্বত শিখরে আরোহণ করেছিলেন। সেখান থেকে বদ্রীনাথ হয়ে চলে এসেছিলেন যোশীমঠ। ১৯৪৭ সনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অভিযানের পর আর তেমন কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি।

১৯৪৭ সনের পর ১৯৫১ সনে নিউজীলাণ্ড দলের নেতা এড্‌মণ্ড্‌ হিলারী, রিডিফোর্ড, লো আর আর কটারকে নিয়ে অলকানন্দা উপত্যকায় এসেছিলেন। সেখানে সতোপন্থ হিমবাহে নীলকণ্ঠ পর্বতে (২১৬৪০ ফুট) আরোহণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন সরস্বতী উপত্যকায়। এই অঞ্চল থেকে মুকুট পর্বত (২৩৭৬০ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। ১৯৫২ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রী দল এসেছিলেন গঙ্গোত্রী অঞ্চলে। দলনেতা টাইসন্‌ দলবল নিয়ে গঙ্গোত্রী পর্বতমালার প্রথম (২১৮৯০ ফুট) ও তৃতীয় (২১৫৬২ ফুট) শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন।

ঠিক সেই সময় ফরাসী অভিযাত্রী দল অলকানন্দা ধারা অনুসরণ করে এসে চৌখাম্বা (২৩৪২০ ফুট) পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন ডি-রাসেলবার্জার ও এল জর্জেস্‌।

১৯৫২ সনের পর আর কোন বিদেশী অভিযাত্রী এই অঞ্চলে প্রবেশ অধিকার পায় নি। কিন্তু এই অভিযানকে স্মরণ করেই হয়তো ভারতীয় অভিযাত্রী দল ১৯৫৯ সনে চৌখাম্বা (১) ২৩৪২০ ফুট উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। অভিযাত্রীদের সবাই ছিলেন ভারতীয় সামরিক অফিসার। ১৯৫৯ সনের পর থেকে শুরু করে প্রায় প্রতি বৎসরই গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক দল এসেছেন। পর্বতারোহীদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও এসেছেন তথ্য সংগ্রহ ও সমীক্ষা পরিচালনার জন্য। এই প্রসঙ্গে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষা সংস্থার তরফ থেকে অভিযাত্রীরা ১৯৫২ সন থেকে শুরু করে ১৯৫২ সন পর্যন্ত গঙ্গোত্রী হিমবাহ্‌ ও তার শাখা প্রশাখা অঞ্চলে প্রবেশ করে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভূবিজ্ঞানী, উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানী, শারীর বিজ্ঞানী ও ভূগোল বিজ্ঞানী। গঙ্গার ধারার সঙ্গে জড়িত অনেক অঞ্চলের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এই সমীক্ষার ফলে।

১৯৩১ সন থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত বিভিন্ন বিদেশী অভিযাত্রী ও ভূ-বিজ্ঞানী গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা প্রশাখা অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছেন। ভাগীরথীর বিভিন্ন ধারার উৎস স্থান ও শাখা প্রশাখা পর্যবেক্ষণের ফলে নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছেন সেকালের ভূ-বিজ্ঞানীরা।

॥ ১৭ ॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
তচ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥

হে মেঘ! তুমি যদি তোমার দেহের পশ্চাদ্ভাগ আকাশে প্রসারিত করে দিগ্‌গজের মতো ভাগীরথীর নির্মল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল বক্রভাবে পান করতে শুরু করো, তোমার কৃষ্ণবর্ণের ছায়া গঙ্গার শুভ্র জলে প্রতিফলিত হবে। তোমার মনে হবে, বুঝি অন্য কোন স্থানে গঙ্গা যমুনার সংগম ঘটেছে ॥ ৫২ ॥

মেঘদূত। পূর্বমেঘ-৫২।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল অনেক পেছনে ফেলে মাঝে মাঝেই গঙ্গার পথ বেয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে উৎসের সন্ধানে। গঙ্গার সেই উৎস কোথায়? রামায়ণ, মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণের পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে যেতেই হারিয়ে ফেলেছি সব পথের নিশানা। গঙ্গা কোথা হতে এসেছে, এ প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাসা আজো আমার সর্বক্ষণের। হরিদ্বারে গঙ্গাকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৫৯ সনে। সকাল-সন্ধ্যায় বসে থাকতাম গঙ্গার তীরে। গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সব কিছু ভুলে যেতাম। কনখলে দক্ষরাজার প্রাচীন কালের স্বাক্ষর দেখেছি বারবার। পুরনো মন্দির, প্রাসাদ—গঙ্গা গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ধারা পিছিয়ে গিয়েছে দূরে। সেই জলধারা চন্ডী পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রবাহিত। এই হরিদ্বারেই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধেছিলেন ঋষি অগস্ত্য। সঙ্গে ছিলেন বিদর্ভ রাজকন্যা বিদুষী লোপামুদ্রা। আজন্ম ভোগবিলাসে লালিতা, নৃত্যগীত বিদ্যায় পটীয়সী অপরূপা লোপামুদ্রা স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছিলেন

বল্কল ধারণ করে হীরা, মণি মাণিক্যের আভরণ ত্যাগ করে। গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি তার দেহমনকে ভরিয়ে রাখতো।

এই হরিদ্বার থেকেই যাত্রা শুরু হত গঙ্গার উৎস সন্ধান করবার জন্যে। হরিদ্বার থেকে দেবপ্রয়াগ—এই বিয়াল্লিশ মাইল পার্বত্য পথ বেয়ে প্রবাহিত জলধারার নাম গঙ্গা। সেখান থেকেই গঙ্গার শুরু। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত। দুইটি ধারার নাম ভাগীরথী ও অলকানন্দা। সুদূর অতীতকাল থেকেই এই পবিত্র ধারা দুটিকে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গা বলেই অভিহিত করতেন। রামায়ণ, মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণে এই ধারা দুটির নাম বারবার উল্লেখ করেছে। বহুদূর থেকে আসা বরফ গলা জলধারা। পুরাণকাররা বলেছেন গঙ্গার অজস্র নাম, গঙ্গার অজস্র ধারা। তার মধ্যে মুখ্য দুটি ধারার নাম—ভাগীরথী আর অলকানন্দা। এই দুটি ধারার মধ্যে কোন ধারাটি মুখ্য ধারা—এ প্রশ্ন বিতর্কের বিষয়।

অলকানন্দার পথ ধরে আমি প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলাম হিমালয়ের অভ্যন্তরে। বাস পথ, তাই দীর্ঘপথ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। দেবপ্রয়াগ থেকে প্রথম গিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ। বরফ গলা ধারা মন্দাকিনী দূর থেকে এসে অলকানন্দায় মিলিয়ে গিয়েছে রুদ্রপ্রয়াগে। মন্দাকিনীর পরিচয় রয়েছে—রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলোয়। মন্দাকিনীর উৎস স্থল—প্রাচীন যুগের তুষার তীর্থ কেদারনাথেরও পেছনে। বাস রাস্তা আরো এগিয়ে গিয়েছিল কর্ণপ্রয়াগ। অলকানন্দার ধারার সঙ্গে মিশে গেছে দূর থেকে আসা আর একটি ধারা পিণ্ডারগঙ্গা। এমনি করেই নন্দপ্রয়াগে—অলকানন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, যোশীমঠের পাদদেশে বিষ্ণুপ্রয়াগ—অলকানন্দা ও ধৌলী গঙ্গার সঙ্গম। পিণ্ডার গঙ্গা, নন্দাকিনী ও ধৌলী গঙ্গার কথা কিন্তু রামায়ণ মহাভারত বা কোন পুরাণে উল্লেখ নেই।

অলকানন্দার উৎসের কাছাকাছি প্রাচীন তীর্থ বদরিকাশ্রম। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলোয় এই তীর্থের কথা বারবার লেখা আছে। অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা এইসব পথ বেয়ে আসতেন মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে। বদরিকাশ্রম অতিক্রম করে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়েছিলাম মানা গ্রামে। সেখানে আরো উত্তর থেকে আসা সরস্বতী নদী অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে বসুধারা, আরও দূরে তুষার সীমার ওপরে দুর্গম হিমালয়ে ভাগীরথী খড়ক ও সতোপন্থ হিমবাহ। এই হিমবাহের বরফ গলে জন্মলাভ করেছে অলকানন্দা। উৎস স্থলে কোন মন্দির নেই, অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসেন না এই দুর্গম পথে।

অলকানন্দা পবিত্র নদী। কবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য মেঘদূত বারবার অলকানন্দার উল্লেখ করেছেন। কুবেরের আলয়—অলকানন্দার সন্নিকটে। মানা গ্রামের সন্নিকটে ডানদিকের গিরিশিরার ওপরে নারায়ণ পর্বত। তার কাছেই কুবের হিমবাহ। জানি না ধনরত্নের অধিষ্ঠাতা যক্ষরাজ কুবেরের বাসস্থান কোথায়।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর ধারা অনুসরণ করে বত্রিশ মাইল দূরে টিহরীর পাদদেশে দেখা যাবে ভীল গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল। ভীল গঙ্গার উৎপত্তি স্থল খাটলিঙ্ হিমবাহ। তীর্থযাত্রীদের কাছে এই স্থানটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভাগীরথীর পথ অনুসরণ করে টিহরী থেকে ধরাসু। ১৯৫০ সনে ঋষিকেশ থেকে ধরাসু পর্যন্তই বাস রাস্তা হয়েছিল শুনেছি। ভাগীরথীর ধারা সারা পথ থেকে দেখতে দেখতে দুচোখ ভরে যায়। কলকাতায় বসে বসে মহারাজা ভগীরথের কথা বারবার মনে পড়তো। গঙ্গা সাগরে মহারাজা ভগীরথের বয়ে আনা পবিত্র গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে সমুদ্রে। মহারাজা ভগীরথের বয়ে আনা পবিত্র গঙ্গার ধারার নাম ভাগীরথী। সেই ভাগীরথীর পরিচয় রয়েছে ফারাক্কার কাছ থেকে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত। ভাগীরথীর পরিচয় নতুন করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে দেবপ্রয়াগ থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখ পর্যন্ত। সুদূর অতীত থেকে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গার উৎসকে গোমুখ বলে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিসাবে আসতেন দুর্গম পথ পেরিয়ে।

আজ থেকে প্রায় সতেরো বৎসর পূর্বে প্রথম এসেছিলাম গঙ্গোত্রী। ভাগীরথীর জল কল্লোলের সামনে বসেছিলাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। গঙ্গোত্রী আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথম দর্শনেই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে গঙ্গার উৎস স্হল গঙ্গোত্রী বা গঙ্গোত্তরী। গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গেলে গোমুখ। মহারাজ ভগীরথের স্মৃতিবিজড়িত পথ বেয়ে আমি এসেছিলাম ভগীরথ শিলার কাছে। স্হানীয় অধিবাসী আর তীর্থযাত্রী-দের বিশ্বাস—মহারাজা ভগীরথ এই শিলার ওপরে উপবেশন করে গঙ্গার আরাধনা করেছিলেন। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আর আরতির সঙ্গে সঙ্গে পূজারীর সুরেলা কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ শুনে ঘুম ভাঙতো খুব ভোরে। মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখতাম অপলক নেত্রে সূর্যের লোহিত আভায় রঞ্জিত সুদর্শন পর্বত শিখর। ভাগীরথীর জলধারার বুকের মাঝখানে রক্তিম আভা। সূর্য উঠবার আগেই হিমশীতল জলধারার মাঝখানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নগ্নদেহী মৌনী, বিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীকে মাঝে মাঝে দেখতাম। তাঁর কুঠিয়ায় গিয়ে বসে থাকতাম

তাঁর সামনে। গঙ্গার কথা শুনবার আশায় অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরতাম। উত্তর পেতাম—নীরবে গোপন ইশারায়। তারপর আবার এসেছি গঙ্গোত্রী, কতবার এসেছি। একবার শুনি, মৌনী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী ভাগীরথীর উচ্ছল জলধারায় মাঝখানে চির সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। নীরবতা, অসংখ্য প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর ভাগীরথীর বুকের মাঝখান থেকে ভেসে আসে। গঙ্গা কোথা হতে এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর বুঝি ভাগীরথীর জল কল্লোলের মাঝখানেই লুকিয়ে রয়েছে।

স্বামী সারদানন্দজী, যিনি ঋষিকেশের শিবানন্দ আশ্রম থেকে একদিন এসেছিলেন গঙ্গোত্রী, ভাগীরথীর কলকণ্ঠ অহরহ শ্রবণ করবার জন্য কুঠিয়া বেঁধেছিলেন। গঙ্গোত্রী থেকে মাঝে মাঝেই যেতেন গোমুখ। শীতে গ্রীষ্মে আর বর্ষায় গঙ্গোত্রীতে অবস্থা করে ভাগীরথীর বিভিন্ন রূপ দর্শন করতেন। শীতে তুষার এসে গঙ্গোত্রীকে ঢেকে ফেলতো। তুষারপাত হত দিন রাত, সূর্যের মুখ ঢেকে যেত কালো মেঘে। এমনি এক বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্যে ও নরম তুষার পেরিয়ে এগিয়ে যেতেন গৌরীকুণ্ডের কাছে। তুষারে অবরুদ্ধ ভাগীরথীর জলধারা দুচোখ ভরে দেখতেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে শুনতাম গঙ্গার কথা। গঙ্গার উচ্ছল ধারার মধ্যে স্বামী সারদানন্দজী বিলীন হয়ে গেছেন অনন্তকালের জন্য।

১৯৬৬ সনে এসেছিলাম ভাগীরথীর পথ ধরে। ঋষিকেশ থেকে বাসে বিকেল বেলায় এসে পেঁছেছিলাম উত্তরকাশী। আমার সঙ্গী ছিল—হিমাদ্রি ভট্টাচার্য, সুজল মুখার্জি, বরেণ্য মুখার্জি। আমরা স্থির করেছিলাম, গঙ্গোত্রীতে কয়েকদিন অবস্থান করে এগিয়ে যাবো গোমুখ। সেখানে দিন কয়েক অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করবো ভাগীরথীর উৎস স্থান। সেখান থেকে আরো এগিয়ে যাবো গঙ্গোত্রী হিমবাহে। পর্বতারোহণের উপযোগী সামান্য সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলাম। উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিট্যুট অফ মাউণ্টেইনীয়ারীং এর রেজিস্ট্রার ও ইকুইপমেণ্ট অফিসার প্রখ্যাত পর্বতারোহী আমাদের বন্ধু কে পি শর্মা আমাদের নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছিলেন। ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারমিটের জন্য দুদিন অবস্থান করতে হয়েছিল উত্তরকাশী। মিনিস্ট্রি অফ্ ডিফেন্সের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ সত্ত্বেও ক্যামেরা পারমিশন না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে ক্যামেরাগুলো শর্মার কাছে জমা রেখে ভোর হতে না হতেই রওনা হয়েছিলাম

উত্তরকাশী থেকে। উত্তরকাশী থেকে নিয়মিত বাস চলতো ভাটোয়ারী পর্যন্ত। যাত্রী সংখ্যা দেখে বাস গাঙ্গনানী, কখনো কখনো সুখী পর্যন্ত বাস চলাচল করতো। ১৮০৮ সনে র‍্যাপার ও ওয়েব হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন ভাটোয়ারী। ভাটোয়ারী থেকে গাঙ্গনানী পর্যন্ত পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক থাকায় আর এগিয়ে যেতে পারেন নি। ১৯৫০ সনে বাস রাস্তা ছিল ধরাসু পর্যন্ত। ১৯৬০ সনের পর থেকে বাস রাস্তা নির্মাণ-কার্য দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৬০ সনে মোটামুটি বাস রাস্তা পাকা হয়েছিল ভাটোয়ারী পর্যন্ত। তার মধ্যেও মাল্লার কাছে বর্ষা ধস নেমে রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতো। ১৯৬০ সনে আমাদের বাস এসেছিল মাল্লা অবধি। তারপর থেকেই পায়ে হাঁটা পথের শুরু। ভাটোয়ারী পেরিয়ে, গাঙ্গনানীর মাইল দুয়েক আগে প্রতি বর্ষায় বিরাট ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬০ সনে পায়ে হেঁটে ভাটোয়ারী থেকে গাঙ্গনানী যাবার পথে সাংঘাতিক ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে ওপর থেকে বড় বড় পাথর নিয়ে ধস নামছিল আমাদের চোখের সামনেই। এই মারাত্মক বিপদের মধ্যেই রাত্রির অন্ধকারে গাঙ্গনানী পেঁছিতে হয়েছিল। সুদূর অতীত-যুগের তীর্থযাত্রীরা এমনি দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এগিয়ে যেতেন গঙ্গোত্রী দর্শনের আশায়। গঙ্গোত্রী যেয়েও তৃপ্ত হতেন না তাঁরা। আরো দুর্গম পথ পেরিয়ে এগিয়ে যেতেন গোমুখ। মাঝ পথে চীর-বাসায় আশ্রয় দিতেন সাধু সন্ন্যাসীরা···যাঁরা গঙ্গার পবিত্র জলধারা অহরহ দর্শন করবার মানসেই অবস্থান করতেন। ক্লান্ত, অসুস্থ যাত্রী-দের সেবা করতেন, উৎসাহ দিতেন, সাহস দিতেন আরো এগিয়ে যাবার জন্য।

১৯৪৯ সনে বিজ্ঞানী অধ্যাপক এইচ. এল্. চিব্বর্ এই ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এসেছিলেন গোমুখের পথে। টিহরী থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে। ভাগীরথীর ধারা অনু-সরণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন ভাগীরথীর উৎস মুখে। বিভিন্ন উচ্চতায় ভাগীরথী উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশ, উপত্যকার পার্শ্ববর্তীর উদ্ভিজ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নভেম্বর মাস পর্যন্ত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন টিহরী থেকে ধরাসু পর্যন্ত ভাগীরথীর বক্র গতিপথ। নদী উপত্যকা প্রসারিত হয়ে নদীতটে সারি সারি সমতল ধাপের সৃষ্টি করেছে। এইসব ধাপগুলি চাষের উপযোগী। ধরাসুর পর থেকে ভাগীরথী উপত্যকাকে সংকীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে। উত্তরকাশীর দিকে এগুতেই দেখা গিয়েছে ভাগীরথী গভীর গিরিখাত বেয়ে প্রবাহিত।

মানেরীতে ভাগীরথী উপত্যকা অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে। নদীতটের ওপরে দেখা গিয়েছে বড় বড় ধাপ। সেই ধাপের গায়ে চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি লক্ষণীয়। মানেরি থেকে মাল্লা পর্যন্ত ভাগীরথী উপত্যকা মোটামুটি প্রশস্ত। এই অংশে মানেরি জলাধার নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সনের পর থেকেই। ভাগীরথীর ঢাল অনুযায়ী জলস্রোতের গতি তেমন দ্রুত নয় বলেই হয়তো মানেরি প্রজেক্ট-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। মাল্লার পর থেকে ভাগীরথীর গতি কিঞ্চিৎ দ্রুত। জলস্রোতের বৃদ্ধির ফলে তটভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি হয়েছে, ফলে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়েছে। মাল্লা থেকে ভাটোয়ারী, সেখান থেকে আরো এগিয়ে গাঙ্গনানী পর্যন্ত ভাগী-রথীর ঢাল বৃদ্ধির ফলে নদী স্রোতের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গিরিখাতের গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে তদনুযায়ী। গাঙ্গনানীতে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, অতীত যুগের তীর্থযাত্রীরা দুর্গম পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতেন ধর্মশালায়। উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে সুস্থ হয়ে উঠতেন। সামনেই পথ আবার দুর্গম হতে শুরু করবে। গাঙ্গনানী থেকে কয়েক ফার্লং পথ পেরুতেই ভাগীরথীর ওপরকার ছোট সেতু পেরুতে হয়। সেখানেই দেখেছি ভাগীরথীর বিক্ষুব্ধ রূপ। ভাগীরথীর জলধারা আকস্মিক ঢালের মুখ থেকে দুর্বার বেগে অবতরণ করেছে। জলধারার মাঝখানে বড় বড় পাথর পড়ে থাকায় জলধারা বাধা অতিক্রম করে শখানেক ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গাঙ্গনানী থেকে লোহারীনাগ পর্যন্ত ভাগীরথীর ধারাকে দুবার অতিক্রম করতে হয়। লোহারীনাগের পূর্বে ভাগীরথীর সেতু পেরুবার পূর্বের অঞ্চলের নাম ডাবরাণী। এই অঞ্চলের গিরি-শিরার গঠন প্রকৃতি এমন যে বর্ষার শুরুতেই ধস নিয়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। লোহিয়ানাগের কাছে ভাগীরথীর পুরনো সেতু ১৯৬৬ সন পর্যন্ত ছিল। তারপর সেই স্থানে বেশ বড় সেতু তৈরী হয়েছিল বাস রাস্তার সুবিধার জন্য। ভাগীরথীর জলধারা এই অংশে হঠাৎ ঢাল অতিক্রম করতে হয়েছে। গিরিখাতের ওপরে বড় বড় পাথর পড়ে জলধারা অবরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। হয়তো অতীতে কোন এক সময়ে গিরিগাত্র থেকে পাথর খসে পড়েছিল ধস নামার সময়।

লোহারিনাগ থেকে সুখীর পাদদেশ পর্যন্ত ভাগীরথীর জলধারা মোটামুটি সমতল গিরিখাত বেয়ে প্রবাহিত। এই অগভীর গিরিখাতের একপাশের গিরিশিরার ওপরে বড় বড় পাথরের মাঝে মাঝে গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত অংশই হয়তো কোন এক সময়ে প্রস্তরময় ছিল। পরিবেশ, জলবায়ু, ও শীতাতপের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত

হয়ে কঠিন পাথরে ফেটে চৌচির হয়েছিল। বৃষ্টি ও তুষারপাত এসে সিক্ত করে কঠিন শিলা নরম করে মাটিতে রূপান্তরিত করেছে। এই অংশের গিরিশিরার গা থেকে ছোটবড় পাথর গড়াতে গড়াতে ভাগীরথীর তটভূমি পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছে। ভাগীরথীর জলাধারা অগভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ধীরবেগে। নদীগর্ভে ছোট বড় পাথরগুলো অর্ধনিমজ্জিত। নদী উপত্যকার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় ডাবরাণীর কাছ থেকেই। তারপর যেন আকস্মিক নদীর ঢাল বৃদ্ধি, জলস্রোতের গতিবেগ বৃদ্ধি বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। লোহারিনাগ থেকে শুরু করে সুখীর পাদদেশ পর্যন্ত ভাগীরথীর ধারা ও তটরেখার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে মনে হয় নদীর উপত্যকা যেন পরিবর্তনের ফল। এই অংশে তটভূমি প্রশস্ত হয়ে মোটামুটি সমভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সমতল ভূমির ওপর দিয়েই অতীত কালের পদযাত্রার নিশানা। এই সমতল অংশ জুড়ে অজস্র ছোটবড় পাথর ছড়ানো রয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে—ভাগীরথীর জলধারা কোথাও অবরুদ্ধ হয়েছিল। সেই অবরুদ্ধ জলধারা এক সময়ে দুর্বার বেগে ভেঙে চুরে বহির্গমনের পথ সৃষ্টি করতে গিয়ে বিশাল বিধ্বংসী বন্যা ঘটিয়েছিল। বন্যার ফলে জলস্রোত প্রচণ্ড বেগে বড় বড় পাথর মাটি ভাসিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল সর্বত্র। জলস্রোতের প্রচণ্ড শক্তি অসমান উপত্যকা সমতল করে ফেলেছিল। এ অনুমান অসম্ভব বলে মনে হবে না। সুখীর চড়াই পেরিয়ে ঝালায় যাবার সময় ভাগীরথী উপত্যকার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেই। লোহারি নাগ থেকে সুখীর পাদদেশ পর্যন্ত পথ চলার শুরুতেই দেখা যাবে পুরনো দিনের চটির চিহ্ন। সুখীর চড়াই অতিক্রম করবার পূর্বে তীর্থযাত্রীরা রাত্রিবাস করে নিতেন লোহারিনাগের চটিতে। তারপর ভোর হতেই পদযাত্রা শুরু হত। সুখীর চড়াই পেরুবার অর্ধেক পথেই সুখী গ্রাম, পুরনো চটি। সারা পথেই পাইন-চীর গাছের মাঝে মাঝেই অজস্র আখরোটের বড় বড় গাছ। চড়াইয়ের শীর্ষে উঠলেই দেখা যাবে—সুখীর উচ্চভূমি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। দক্ষিণ অংশ ক্রমে ঢালু হয়েছে ভাগীরথীর ধারা পর্যন্ত। সুখীর চড়াই পেরুবার পরই ভাগীরথী উপত্যকার নতুন চিত্র দেখা যায়। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্র জাংলা সেতুর কাছ থেকেই লক্ষণীয়। জাংলা সেতুর কাছে ভাগীরথীর ধারা প্রায় ত্রিশ থেকে তেত্রিশ ফুট প্রশস্ত। তারপর থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন। কঠিন গ্র্যানাইটের সংকীর্ণ গভীর গিরিখাতের পরিবর্তে নদী উপত্যকা প্রশস্ত হতে শুরু করেছে। নদীর

তটভূমি বিস্তৃত হবার ফলে জলধারা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ঝালা পেরিয়ে সুখীর উচ্চভূমির পাদদেশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। সুখীর পর থেকেই ভাগীরথীর উপত্যকা আবার সংকীর্ণ হয়েছে।

জাংলার পর থেকেই নদী উপত্যকার পরিবর্তন শুরু। ভাগীরথীর প্রশস্ত তটভূমি, নদীগর্ভ প্রসারিত হবার ফলে জলধারা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বালুকাময় ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কোন কোন ভূ-বিজ্ঞানী মনে করেন—ঝালার নীচে প্রলম্বিত শৈলের নিকট কোন এক অতীতে বড় ধরনের ধস নেমেছিল। সেই ধসের মাটি পাথরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাগীরথীর গতিপথ রুদ্ধ করে আড়াআড়িভাবে প্রাকৃতিক বাঁধের সৃষ্টি করেছিল। জলধারা অবরুদ্ধ হবার ফলে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশাল জলধারাই প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথী উপত্যকার প্রশস্ত হবার বৈজ্ঞানিক কারণ। কালক্রমে ভাগীরথীর সঞ্চিত জলধারা নির্গমণের পথের সন্ধান খুঁজে বার করে নিয়েছিল। সুখীর পাদদেশের দুর্বল অংশ এক সময় জলের বিশাল চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অবরোধ মুক্ত হতেই বিশাল জলাধার থেকে সমস্ত জল প্রচণ্ড বেগে সমস্ত মাটি পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনে হয় লোহারী-নাগে ভাগীরথী উপত্যকার প্রাকৃতিক চিত্র—এই বন্যার ফলস্বরূপ। প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী অডেন এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ১৯৩৫ সনে। জাংলা থেকে সুখী পর্যন্ত নদী উপত্যকা প্রসারিত হবার কার্যকারণ উল্লেখ করেছিলেন তাঁর ভ্রমণ বিবরণে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে—সুখীতে কোন এক অতীতে বিশাল ধস নেমেছিল। সেই ধসের সমস্ত মাটি, পাথর স্তূপীকৃত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে। ফলে—ভাগীরথীর ধারা অবরুদ্ধ হয়েছিল আড়াআড়িভাবে বাঁধের সৃষ্টি করে। সেই প্রাকৃতিক বাঁধ সৃষ্টির ফলে অবরুদ্ধ ভাগীরথীর জলধারা সঞ্চিত হয়ে হ্রদের জন্ম হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীই নির্গমনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। বাঁধের দুর্বল অংশ ভেঙেচুরে জলধারা দুর্বার বেগে বেরিয়ে পড়েছিল। হ্রদের তলদেশে অনেক দিনের সঞ্চিত মাটি পাথর আর বালুকণা জলাধারের গভীরতা হ্রাস পেয়েছিল কালক্রমে। ভাগীরথীর ধারা অব্যাহত হবার পর থেকেই হ্রদের গভীরতা হ্রাস পেয়েছিল দ্রুতবেগে। এমনি করেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল হ্রদটি। অডেন গঙ্গোত্রী থেকে জাংলা পর্যন্ত ভাগীরথী উপত্যকায় সুস্পষ্ট হিমবাহ উপত্যকার চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জাংলায় ভাগীরথী উপত্যকার পূর্বে হিমবাহ উপত্যকা ছিল। কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে নদী উপত্যকার

রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯৪৯ সনে প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী চিব্বর এই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জাংলা থেকে সুখী পর্যন্ত ভাগীরথী উপত্যকার বিস্তার বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করেছিলেন তাঁর ভ্রমণ বিবরণে। এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অডেনের ভ্রমণ বিবরণ তিনি নিশ্চয়ই পাঠ করেছিলেন। ভাগীরথী উপত্যকার এই লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অডেনের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

১৯৬৮ সনে ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন এই অঞ্চলে। তিনি ঝালা থেকে জাংলা পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল ভাগীরথী উপত্যকা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জাংলা থেকে ধারালী পর্যন্ত প্রায় চার মাইল পর্যন্ত ভাগীরথীর জলধারা সামান্যই বিস্তার লাভ করেছে। তারপর থেকে নদীর উভয় তটরেখা প্রসারিত হয়েছে। তারপর থেকেই তটরেখা বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ঝালায় ভাগীরথী উপত্যকা সবচাইতে বেশী প্রশস্ত হয়েছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় ভাগীরথী উপত্যকার প্রসারিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করেছেন। তিনি অডেনের বিবরণও পাঠ করেছিলেন। হ্রদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অডেনের বক্তব্য তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হ্রদ সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে তিনি অডেনের মতকে মেনে নিতে পারেন নি। ডঃ মুখোপাধ্যায় সুখীর ওপারের দীর্ঘ গিরিশিরা পর্যবেক্ষণের সময় গিরিশিরার ওপরে কয়েকটি ঝুলন্ত উপত্যকার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। এই ঝুলন্ত উপত্যকাগুলো থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তুষার যুগের প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের ওপরে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হয়তো বা সুখী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই হিমবাহের স্নাউট ছিল সুখীতে। অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর বারো তেরো মাইল দূরে অবস্থিত গোমুখ—সুদূর অতীত যুগে অবস্থিত ছিল সুখীতে। তখন গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো সঞ্চিত হয়ে স্তূপীকৃত হয়েছিল। ভাগীরথী প্রবাহিত হত সুখীর পর থেকেই। যুগের পরিবর্তনে হিমবাহ সংকুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহে স্নাউট পিছিয়ে গিয়েছিল। তখন হিমবাহের বরফ গলা জলধারা স্তূপীকৃত প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরের বাধা অতিক্রম করে প্রবাহিত হতে পারছিল না। স্তূপীকৃত পাথর হয়তো এক সময় প্রাকৃতিক বাঁধের সৃষ্টি করে ভাগীরথীর জলধারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। ফলে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়। সেই হ্রদের জলধারা মোটামুটি সুখী থেকে ধারালী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পরে

জলাধারে জলের চাপ সাংঘাতিক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাঁধের দুর্বল অংশ থেকে ভাগীরথীর ধারা নির্গমণের পথ খুঁজে নিয়েছিল। পরে বাঁধ ভাঙা জল দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাটি পাথর। সেই দুর্বার জলস্রোতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় নাগানিগড় পর্যন্ত। হিমবাহ সংকুচিত হয়ে গেলে স্নাউট পিছিয়ে গেলে, প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথরগুলো অবরোধ সৃষ্টি করে হ্রদের জন্ম হওয়ার প্রমাণ অনেক স্থানেই দেখা যেতে পারে। হিমালয়ে এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তন অবাস্তব বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় একথা বলা চলে না।

১৯৬০ সনে বাসে করে গাঙ্গনানী অতিক্রম করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুখী। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে গিয়ে সুখীর পেছনের দীর্ঘ গিরিশিরার আড়ালে চলে যাবার তোড়জোড় চলছিল। পায়ে হাঁটা পথ শুরু হয়েছিল ভাগীরথীর ঝালার প্রশস্ত উপত্যকা পেরিয়ে সংকীর্ণ নালা বেয়ে সুখীর উচ্চভূমি পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে লোহারীনাগের দিকে। সেখানে সেতু পেরুলেই বাস চলার কাঁচা রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে ধারালী পর্যন্ত। সুখী থেকে পায়ে চলা পথ পুরনো দিনের পথ।

সুখী থেকে তিন মাইল দূরে ঝালা গ্রাম।

ঝালা গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে শ্যামপ্রয়াগ।

শ্যামপ্রয়াগ থেকে দেড় মাইল দূরে গুপ্তপ্রয়াগ।

গুপ্তপ্রয়াগ থেকে আধ মাইল দূরে হরিপ্রয়াগ বা হারসিল।

সমস্ত পায়ে হাঁটা পথ ভাগীরথীর ডান পাড় দিয়ে। হারসিল গ্রাম পেরিয়ে ভাগীরথীর ছোট্ট সেতুর ওপারে বাস পথ, নির্মাণ কার্য শেষ হয় নি। সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে ধারালী গ্রাম।

হারসিল বোধ হয় এই অঞ্চলের সব চাইতে মনোরম স্থান। পাইন, দেওদার আর চীর গাছের ঘন ছায়া…আর আপেলের বাগান। এই শান্ত শীতল পরিবেশের মাঝখান দিয়ে ছোট বড় জলধারা ভাগীরথীর বুকে এসে পড়েছে। এই পরিবেশের মাঝখানে পুরনো ডাকবাংলো—উইলসনের কুটির। সামনেই আপেলের বাগান, কাছেই শ্যামগঙ্গার ধারা। উইলসনের কুটিরের অদূরে শ্যামগঙ্গার ধারা, ছোট বড় প্রান্তরময় ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত। শ্যামগঙ্গার জলধারা ঘোলাটে। জলের বর্ণ লক্ষ্য করে মনে হয় উৎস স্থলের দূরত্ব খুব বেশী নয়। শ্যামগঙ্গার অপর নাম শিয়ানগড়। হারসিল থেকে শিয়ানগড় মোড় ঘুরে গিয়েছে। শিয়ান

উপত্যকা মোটামুটি প্রশস্ত। উপত্যকার পূব উত্তর দিকের গিরিশিরা-গুলোর নাম ধুমধার। এখানে একটি গিরিপথ অতিক্রম করে তমসা উপত্যকায় পেঁছে যাওয়া যায়। এই অঞ্চলের শৃঙ্গ দাদেরি (৫৩২০ মিঃ)। এই পথেই নেলা অতিক্রম করে হিমাচল অঞ্চলে পেঁছে যাওয়া যায়।

হারসিলের সৌন্দর্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে সুইজারল্যাণ্ড বলে অভিহিত করতে চান। এই গ্রাম থেকে ভাগীরথীর ধার ঘেঁষে পথ সোজা চলে গিয়েছে ঝালা। হারসিলের উইলসনের কুটিরে বিখ্যাত জার্মান অভিযাত্রী হেনরিখ হেরার দেরাদুন থেকে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসে-ছিলেন ১৯৩৯ সনে। উইলসন কুটির থেকে ধরা পরে আবার দেরাদুনে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল। অবশেষে দ্বিতীয়বার দেরাদুন থেকে পালিয়ে হেরার সারারাত পায়ে হেঁটে চলতেন। দিনের বেলায় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতেন। এমনি করেই সবার অলক্ষ্যে নেলাং অতিক্রম করে পেঁছে গিয়েছিলেন তিব্বত ভূখণ্ডে।

১৯৬৬ সনে সুখী থেকে পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় পেঁছে গিয়েছিলাম ধারালী গ্রামে। মালপত্র কাঁধে করে নিয়ে ধারালী পেঁছিবার আগে দুধ-গঙ্গার ওপরকার সেতু পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ধর্মশালায়। বেশ বড় ধর্মশালা, আমাদের মতো অনেক তীর্থযাত্রী হাজির হয়েছে নানা প্রদেশ থেকে। তাঁরা সবাই গোমুখ দর্শন করে ফেরত যাবার জন্য প্রস্তুত। মাঝে মাঝেই "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনি তাঁদের মুখে। গঙ্গার উৎস দর্শন করে সার্থক করেছেন তাঁদের জীবন। এবার ফিরে যাবেন। ফেরবার পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে ভাটোয়ারী পর্যন্ত। অনেকেই উনোন ধরিয়ে ডাল রুটি বানিয়ে নিচ্ছিলেন। নানা প্রদেশ থেকে আসা যাত্রী, যাদের দেশে গঙ্গা নেই, যাঁরা গঙ্গার জলধারা দেখেন নি কখনো, সেই সব দেশের লোকও বসেছিলেন ধর্মশালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে। সূর্যাস্তের অন্ধকার নেমে আসতে বেশ সময় লাগে। তাই আলোয় আলোয় সবাই রান্নায় ব্যস্ত। আমরাও রান্নার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলাম। উত্তরকাশী থেকে সকালে রওনা হবার পর তেমন কিছু খাওয়া হয় নি। অথচ পরিশ্রম হয়েছিল প্রচুর। ধর্মশালার দোতলার বারান্দায় আশ্রয় নিতে গিয়েই চমকে উঠে-ছিলাম সবাই। পাহাড়ী গরু, তাই হয়তো অবলীলাক্রমে দোতলায় উঠেছিল। অনেক যায়গা দখল করে শুয়েছিল সপরিবারে। আমাদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে ব্যস্ত হয় নি বিন্দুমাত্র। চোখ মেলে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখেই আবার নিশ্চিন্তে রোমন্থন করছিল। ধারালী বেশ

পুরনো জায়গা। ভাগীরথীর জলধারা স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রাম মোটামুটি বড়। কয়েক শ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের ঢালের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ি ছড়ানো। সেখান থেকেই পায়ে হাঁটা পথ দুধগঙ্গা উপত্যকার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। দুধগঙ্গার উৎপত্তিস্থল একটি ছোট হিমবাহ। সেই হিমবাহ বরফ সংগ্রহ করে শ্রীকান্ত পর্বত শৃঙ্গ থেকে। দুধগঙ্গার ধারা ধারালীতে এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সেই নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরটির অর্ধেক অংশ মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। শোনা যায় অনেক কাল পূর্বে ভূমিকম্পে মন্দিরের অর্ধেকটি প্রোথিত হয়েছিল। ধারালী থেকে পরদিন রওনা হয়েছিলাম সব কিছু গুছিয়ে। ধারালী থেকে জাংলার দূরত্ব প্রায় চার মাইল। ভাগীরথীর ডান পাশ দিয়ে পথ। মোটামুটি উচ্চ গিরিশিরার ঢালের দিকটায় পাথর ফাটিয়ে পথ বানানো হয়েছিল। পথের বাঁ ধারে ভাগীরথীর জলধারা গিরিখাত বয়ে চলেছিল। নদীর স্রোতবেগ মোটামুটি দ্রুত। জাংলার কাছাকাছি স্থান থেকে জলের গভীরতা লাভ করেছে। জাংলার ওপর থেকে গভীর গিরিখাত দু চোখ যেন জুড়িয়ে দেয়। গিরিখাতের গা বেয়ে উচ্চ গিরিশিরার খাড়া ঢাল। গ্র্যানাইট পাথরের গিরিগাত্র যেন পরিষ্কার করে কাটা, তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে বেয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। উচ্চ গিরিশিরার গা বেয়ে উঠেছে পাইন, দেওদার গাছের সমারোহ। সমস্ত পথ মোটামুটি সমতল। জাংলার সন্নিকটে ভাগীরথীর ওপর থেকে কাঠের সেতু পেরিয়ে চড়াই ভেঙে পেঁছে গিয়েছিলাম জাংলা চটিতে। জাংলার পুরনো চটির চিহ্ন বর্তমান। বেশ প্রশস্ত অঞ্চল জুড়ে স্থানটি। জাংলা চটির পর পথ পুরো চড়াই প্রায় লংকার কাছাকাছি, সেখান থেকে পথ গিয়েছে নেলাং-এর দিকে জাহ্নবী গঙ্গার ধার দিয়ে। জাহ্নবী গঙ্গার গিরিখাত ভূ-বিজ্ঞানী-দের আকর্ষণীয় তো বটেই, যাত্রীদের চোখেমুখেও বিস্ময় জাগে। পুরো চড়াই পেঁছতেই ঠিক জাহ্নবী গঙ্গার ধারের ওপরটায় ভৈরব ঘাটির দোকান-পাট, ধর্মশালা দেখা যায়। তারপরই পথ নামিয়ে নিয়ে গেছে জাহ্নবী গঙ্গার তটভূমির কাছে। সেখানে কাঠের সেতু পেরুবার সময় একবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে জাহ্নবী গঙ্গার স্বচ্ছ নীলাভ জলধারা আর ভাগীরথীর ঘন নীলাভ জলধারা ও জাহ্নবী গঙ্গার ধারের সম্মেলন। পুরো চড়াই ভেঙে ভৈরবঘাটি পেঁছতেই ছায়ায় ঘেরা হিমশীতল পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। সূর্য অস্ত গিয়েছিল। পুরনো পাইন আর দেওয়ার গাছের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। ধর্মশালায় রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম ক্লান্ত হয়ে। সকাল হতেই

স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে সবকিছু গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু করেছিলাম গঙ্গোত্রীর জন্য। ভৈরব ঘাটি থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। সমস্ত পথে চড়াই উৎরাই খুবই কম। চীর, পাইন আর দেওদার গাছের ছায়ায় পথ অত্যন্ত মনোরম। পথের ডান পাশে কয়েকশ ফুট নীচে ভাগীরথীর জলধারা খাড়া গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। সেই গিরিখাত খুবই সংকীর্ণ। মনে হয় যেন বিশাল গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে ভাগীরথী কঠিন গ্র্যানাইট পাথর গভীরভাবে কেটে প্রবাহিত হয়েছে। এমনি খাড়া সংকীর্ণ গিরিখাত হিমালয়ে আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

গঙ্গোত্রীর নিকটে ভাগীরথী প্রায় ৯৯৫০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবাহিত। অবশ্য মন্দিরের কাছাকাছি স্থানটির উচ্চতা আরো একশো-দেড়শো ফুট। গঙ্গোত্রী মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথীর ধারা অতিক্রম করবার জন্য কাঠের সেতু আছে। সেখানে ভাগীরথীর ধারার বিস্তার ১৯ মিটার বা ৬২ ফুটের মতো। মন্দিরের দক্ষিণাংশে বিশাল বেলাভূমি ছোটবড় অজস্র উপল খণ্ডে আবৃত। এইসব উপল খণ্ড নদীর তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথী বেশ মোড় ঘুরে সামান্য উত্তরাভিমুখী প্রবাহিত হয়েছে। তারপর প্রশস্ত মার্বল পাথরের ওপর দিয়ে ভাগীরথীর ঘোলা জল আকস্মিক অজস্র ধারায় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শখানেক ফুটের বেশী নীচে। জলপ্রবাহের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায় কাছাকাছি গেলেই। এই অংশের নাম মহাদেবের জটা। জলপ্রবাহ নীচে প্রচণ্ডবেগে পতিত হয়ে একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে, সেই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। মহাদেবের জটার কাছে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত কেদার গঙ্গা এসে পতিত হয়েছে গৌরীকুণ্ডে। মহাদেবের জটার ওপরের অংশে মার্বল পাথরের সমস্ত অংশ ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে গ্লেসিয়াল পেভমেণ্ট ছাড়া কিছুই নয়। সুদূর অতীতে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এই অংশ দিয়ে প্রবাহিত হত। কঠিন প্রস্তর যুক্ত স্থান দিয়ে কঠিন বরফের ধারা প্রবাহিত হবার ফলে ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ে-প্রস্তর সুন্দর মসৃণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে হিমবাহ সংকুচিত হয়ে গেলে—মসৃণ পাথরের ওপর বরফের ধারার ঘর্ষণ বন্ধ হলেও জলধারার ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়ে সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। গৌরীকুণ্ড পেরিয়ে ভাগীরথীর ওপরে গিয়ে আরো প্রায় আধমাইল গেলে ভাগীরথীর প্রবাহ কঠিন ক্ষয়ে গভীর গিরি-খাতের সৃষ্টি করেছে। কোন কোন স্থানে নরম পাথর ক্ষয়ের ফলে জলধারা গভীর সংকীর্ণ খাতের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভাগীরথী প্রায় অদৃশ্য

হয়েছে। এই অংশের গ্লেসিয়াল পেভমেণ্ট দেখা যায়। স্থানীয় পাণ্ডারা একে বলে পাটাঙ্গনা। পাটাঙ্গনার পর ভাগীরথী পূর্বাভিমুখী প্রবাহিত। তারপরই ভাগীরথীর গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাত বেয়ে চলে গিয়েছে। জলধারা এত নীচে দিয়ে প্রবাহিত যে প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। মহাদেবের জটা থেকে শুরু করে ভাগীরথীর সমস্ত প্রবাহের দৃশ্য হিমালয়ে আর কোথায়ও আছে কিনা জানি না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশালতা ও পরিবেশ, তীর্থযাত্রীদের মনে গভীর রেখাপাত করে। রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণ বর্ণিত ভাগীরথীর কথা তীর্থযাত্রীদের স্বর্গলোকের চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গঙ্গোত্রীর মন্দিরের পরিবেশ স্হানীয় সাধু সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ সব মিলিয়ে এমন স্বর্গীয় দৃশ্য যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রীদের ডেকে আনে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই মন্দিরের আরতি, স্তোত্রপাঠ...সব কিছুর সমাপ্তির পর সব কোলাহল শেষ হয়ে গেলে ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস শুনি ধর্মশালার বারান্দায় বসে বসে। পরদিন ভোর হতেই এগিয়ে যাই ভগীরথ শিলার কাছে, মহারাজা ভগীরথ এই শিলাখণ্ডের ওপরে উপবেশন করে গঙ্গার আরাধনা করেছিলেন। সূর্য উদয় থেকে শুরু করে সূর্যের তাপ প্রখর হওয়া পর্যন্ত গঙ্গোত্রীকে ঘুরে ঘুরে দেখি। ভাগীরথীর ধারা, মহাদেবের জটা, পাটাঙ্গনা, দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে বসি ধর্মশালার বারান্দার সামনে।

একদিন ধর্মশালার সামনে বসেছিলাম। এমন সময় একজন তরুণ বাঙালী এসে বললেন—মন্দিরের কাছে একটি ঘরে একজন বাঙালী সন্ন্যাসিনী রয়েছেন। তিনি ডেকেছেন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য। বাঙালী সন্ন্যাসিনী শুনে অবাক হয়েছিলাম। আগ্রহ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সন্ন্যাসিনীকে সবাই মাতাজী বলে ডাকেন। যথারীতি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। মন্দিরের কাছেই একটি ঘরে তিনি থাকতেন। তিনি বসে বসে পরোটা বানাচ্ছিলেন। যত্ন করে খাইয়েছিলেন সেদিন। খাবার শেষে বসে গল্প করেছিলেন গঙ্গোত্রীর। গঙ্গোত্রীতে অনেক সন্ন্যাসী রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজী, রামানন্দ অবধূত. সারদানন্দজী—গঙ্গোত্রী তীর্থের প্রধান আকর্ষণ। তীর্থযাত্রীরা তাঁদের দর্শন না করলে তীর্থের ফল যেন সম্পূর্ণ হয় না। মাতাজী বলতেন—রামানন্দজী খুবই জ্ঞানী, এই দুর্গম তীর্থে সন্ন্যাসিনীর বসবাস করার ব্যাপারে তিনি প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। যে কদিন

গঙ্গোত্রীতে ছিলাম, আমার ভাল লেগেছিল। নানা হাসি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনায় ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী, উচ্চ শিক্ষিতা। হিন্দি, ইংরেজী ভাষায় অনর্গল বলেন। কথাচ্ছলে বুঝতে পেরেছিলাম—খুব সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম, উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আধুনিক বিলাস ব্যসনের ভেতর দিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন। অভাব ছিল না কিছুই তবু কেন সবকিছু ত্যাগ করে দুর্গম হিমালয়ে এমন অজ্ঞাতবাস করেন জানতে চাইনি। গঙ্গাকে ভালবেসে—দীর্ঘ দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। তার পূর্বে তিনি বহু স্থান ঘুরেছিলেন। অনেক তীর্থ দর্শন করে এসে কিছুকাল দিল্লীর কাছে যমুনা নদীর তীরে বসবাস করেছিলেন। সেখান থেকে এসেছিলেন ঋষিকেশ। ঋষিকেশেও ছোট্ট কুঠিয়া বানিয়ে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। একদিন ঋষিকেশের কল-কোলাহল পরিবেশ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী। তাঁর তেজদৃপ্ত চেহারা, সারল্য, স্নেহপ্রবণ স্পর্শকাতর মন দরিদ্র পূজারী, পাণ্ডা আর স্থানীয় মানুষদের হৃদয় জয় করেছিল। তিনি মাতাজী হয়েছিলেন। মায়ের মতো স্নেহ, ভালোবাসা, বিদ্যা বুদ্ধি, স্থানীয় সন্ন্যাসীদের স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন। মাতাজী গঙ্গোত্রীতে কুঠিয়া বানাবার কথা ভেবেছিলেন। মাতাজীর ইচ্ছার কথা পাণ্ডারা জানবার সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়ার স্থান নির্বাচন করেছিলেন—ভাগীরথীর জলধারা আর কেদারগঙ্গার ধারার মাঝখানে স্বল্প পরিসরযুক্ত উচ্চ স্থানটুকু। কয়েকটি চীর গাছ, তারই তলায় পাণ্ডারা দিনরাত পরিশ্রম করে কুঠিয়া বানাতে শুরু করেছিল। তার পূর্বে উত্তর কাশীতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে থেকে অনুমতি নিয়েছিল পাণ্ডারাই। মাতাজীর কুঠিয়া নির্মাণের শেষের দিন কটি আমি মাতাজীর সঙ্গে বসে বসে দেখতাম। মাতাজী গঙ্গার কথা বলতেন। স্তোত্র পাঠ করতেন সুর করে। সামান্য নীচেই মহাদেবের জটাজাল, ভাগীরথীর জলধারার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ওপর থেকে কুয়াশার মতো জলকণা ভেসে বেড়াতো, সূর্যের আলো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রামধনুর সাতরঙ ছড়িয়ে পড়তো। গৌরীকুণ্ডও দেখা যায় সামান্য দূর থেকেই।

১৯৬৬ সনের পর ১৯৬৭ সনে আবার এসেছিলাম গঙ্গোত্রী। হাঁটা পথ ছিল মাল্লা থেকে। প্রচণ্ড ধস নেমে বাস পথ বন্ধ হয়েছিল। তাই পায়ে হেঁটে ভাটোয়ারী যেতে হয়েছিল। সেখানে খাবার খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছিলাম গাঙ্গনানী যাবার জন্য। মাঝপথে প্রচণ্ড ঝড়, শিলাবৃষ্টি, রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছিল। তার মধ্যেই প্রচণ্ড

শব্দে ধস নেমেছিল। এমনি সাংঘাতিক বিপর্যয় মাথায় নিয়ে পেঁছে গিয়েছিলাম গাঙ্গনানী। পরদিন ভোর বেলায় আবার পদ যাত্রা। সুখীর চড়াই পেরিয়ে হারসিলে পেঁছে গিয়েছিলাম রাত্রিবেলায়। উইলসন সাহেবের কুটিরে রাত্রিবাস করে পরদিন ধারালী, ভৈরবঘাটি সর্বশেষে পেঁছে গিয়েছিলাম গঙ্গোত্রী। ভাগীরথীর ওপারে ডাকবাংলোয় সব মালপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়েছিলাম মাতাজীর সন্ধান নেবার জন্য। মাতাজী তাঁর নব নির্মিত কুঠিয়াতেই ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই কুঠিয়া মোটামুটি সাজিয়ে নিয়েছিলেন। আমাকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যেন। খাবার দেবার মতো এমন কিছুই নেই, তবু ব্যস্ত হয়ে খুঁজে পেতে—পাণ্ডাদের হারসিল থেকে নিয়ে আসা আধপাকা আপেল দিয়েছিলেন আমার হাতে।

হেসে বলেছিলেন—নাও বীরেন্দ্রজী, খেয়ে নাও।

—কেমন আছেন? মাতাজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—সন্ন্যাসিনীর দেহের খবর রাখতে নেই। তবে আনন্দেই আছি।

—তাই নাকি! আমি অবাক হই।

মাতাজী বলেন—কয়েকদিন আগে ভুজবাসায় দিনকয়েক কাটিয়েছি। প্রতিদিনই যেতাম গোমুখ। গোমুখে স্নানও করেছিলাম। গত শীতটা এখানেই কাটিয়েছি।

—কষ্ট হয় নি?

—কিসের কষ্ট!

—প্রচণ্ড শীত, তুষার ঝড়, তারও পরে নিঃসঙ্গতা!

মাতাজী হাসেন উচ্চৈঃস্বরে—তুমি একেবারে ছেলে মানুষ! প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রচণ্ড শীত—শেষটায় সয়ে যায়। আর নিঃসঙ্গতা··· এতে ভয়ের কি আছে। নিঃসঙ্গতাকে জয় করবার জন্যও তো সাধনার প্রয়োজন। মাতাজী একবার চুপ করে থেকে বলেন—জানো, এর মধ্যে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছিলেন গোমুখ দর্শন লাভের জন্য।

—একা একা!

—হ্যাঁ, একা বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন। যমুনার তীরেই বসবাস করেন। যমুনা দর্শন করেন দিনরাত। ইচ্ছে হয়েছিল গঙ্গা দর্শন করবেন। গঙ্গার অর্থ গঙ্গার উৎস গোমুখ। গোমুখ দর্শন করবার পর আমার এখানে দিন কয়েক ছিলেন। গঙ্গাস্তোত্র শুনতেন আমার কাছ থেকে। সুন্দর কণ্ঠে কীর্তন শোনাতেন আমাকে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একা একা চলাফেরা করা, একাকী বাস করায় কষ্ট

হয় না ? তিনি হেসে বলতেন—ঈশ্বরের দর্শন, অনুভূতি এসব কিছু বুঝি না। তবে ভয় আমার কমে গেছে, এমন কি মৃত্যু ভয়। নিঃসঙ্গতার ভয় থেকে মুক্ত হতে চলেছি।

চুপ করে থাকি মাতাজীর দিকে তাকিয়ে। মাতাজী জিজ্ঞাসা করেন—এবার কজন এসেছ ?

আমি বলি—অনেক ! সবাই আসবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

মাতাজী হাসেন—গঙ্গোত্রীতে আসতে তো হবেই। এ তো মহাতীর্থ।

আমি বলি—গঙ্গাতীরে বাস করবেন বলেই কি গঙ্গোত্রী এসেছিলেন ?

মাতাজী বলে—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—ঋষিকেশেও গঙ্গা রয়েছে।

—ঋষিকেশে ভীষণ ভীড়। কৌতূহলী মানুষের ভীড় আর ভাল লাগে না। তীর্থযাত্রীরা এই পথে এলেই হাজির হন আমার কাছে। বিশেষ করে বাঙালী যাত্রী। তাঁরা নাম, ধাম, পূর্ব বাসস্থান সবই সংসারী মানুষের প্রশ্নে বিব্রত করে তোলেন।

আমি বলি—এ সমস্যা এখানেও থাকবে।

—হ্যাঁ জানি। এখানেও অনেকেই আসেন। এমনকি জিজ্ঞাসা করেন—কেন আমি এই বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছি।

মাতাজী হাসেন। আমার দিকে তাকিয়ে গভীর দৃষ্টি মেলে বলেন—তোমারও এই প্রশ্ন আছে না কি ?

—নাঃ। আমি বলি।

—সে কি !

—সংসারী মানুষকে যে প্রশ্ন করা যায়, সংসার ত্যাগীর কাছে সে প্রশ্ন করার কোন যুক্তি নেই।

মাতাজী উচ্চস্বরে হাসেন—প্রশ্ন করে দেখতে পারতে।

ডাকবাংলোয় সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে মাতাজীর কাছে গিয়েছিলাম এক সুযোগে। দেখি অনেক তীর্থযাত্রী এসেছেন মাতাজীর দর্শন লাভের জন্য। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতাজীর কাছেই বসি। একে একে সবাই চলে গেলে মাতাজী হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন। যাত্রীরা সবাই নিয়ে এসেছিলেন মিষ্টি, চিনি, সুজি, ঘি, নানা রকমের শুকনো ফল। কিছু মিষ্টি আর শুকনো ফল আমার হাতে দিয়ে বলেন—নাও, এগুলোর সদ্গতি করো। এ সব উৎপাত বাড়বেই জানি। একজন মানুষের প্রয়োজন নেই তবু এসব আসে আমার কাছে।

আমি হাসি—ভীড় আরো বাড়বে, সে তো বলেছিই।

—জানি, তার জন্য ব্যবস্থাও করে রেখেছি।

—কি রকম!

তখন কুঠিয়া বন্ধ করে চলে যাবো ভুজবাসার ওপারে ভৃগু গঙ্গার কাছে। সেখানে সাধারণ মানুষ আসবে না সহজে। সেখানে মহারাজ বিষ্ণুদাসের কুঠিয়া রয়েছে। তার কুঠিয়ার পাশেই আরো দুটো ছোট ছোট কুঠিয়া রয়েছে। সেগুলো পরিত্যক্ত। তেমন বুঝলে সেখানেই চলে যাবো।

১৯৬৮ সনে আবার এসেছিলাম গঙ্গোত্রী। মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল গঙ্গোত্রীতে তাঁর কুঠিয়ায়। এর মধ্যে মাতাজী তপোবন গিয়েছিলেন। ভৃগু পর্বতের পাদদেশ থেকে সুন্দর ধারা এসে ভাগীরথীতে মিশেছে। এই সঙ্গমস্থল থেকে একটু উঁচুতে মাতাজীর কুঠিয়া। খুবই নির্জন স্থান…কাছেই একমাত্র সঙ্গী বিষ্ণুদাস মহারাজ। বিষ্ণুদাস তাঁর কুঠিয়ার পাশেই সামান্য প্রাঙ্গণে শাক-সব্জীর চাষ করেছিলেন। মাতাজীকে স্নেহ করতেন তিনি। শীত চলে যেতেই ভৃগু গঙ্গার ধার ফুলে ফুলে ভরে যেতো। মৌমাছি আর প্রজাপতির ভীড় হত সেখানে। গঙ্গোত্রীর চাইতে মাতাজী এই স্থানটিকেই বেশী পছন্দ করতেন।

১৯৬০ সন থেকে মাতাজী গঙ্গোত্রীর কুঠিয়া বন্ধ করে বাস করতেন ভৃগু গংগার কাছেই সেই পুরনো কুঠিয়ায়। আমরা গোমুখ যাবার পথে ভাগীরথীর তীরে এগিয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকতাম। একবার যেন দেখেছিলাম মাতাজীকে। তিনি যেন দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করেছিলেন। সাড়া দিয়েছিলেন আমাদের ডাকে। ১৯৬০ সনে মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল গঙ্গোত্রীতে তাঁর কুঠিয়ায়। মাতাজীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাই ঋষিকেশ রওনা হয়েছিলেন কয়েকদিন পরই। আমরা ফিরে এসে ঋষিকেশে দেখেছিলাম তাঁকে। গঙ্গোত্রীকে প্রথম দর্শনের পরই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন।

গোমুখ আমি অনেকবার গিয়েছি। সেখানে অবস্থান করেছি বেশ কয়েক দিন ধরে। ১৯৬০ সনের গোমুখ দর্শন আমার স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পূর্বে গোমুখ যাবার পথ ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে। পথ দুর্গম ছিল। তীর্থযাত্রীরা একদিনে গংগোত্রী থেকে গোমুখ যেতে পারতেন না। মাঝপথে চীরবাসায় রাত্রিবাস করতে হতো। তারপর দিন পৌঁছে যেতেন ভুজবাসায়। ভুজবাসায় রাত্রিবাস করে সকালবেলায়

গোমুখ দর্শন করে সোজা চলে আসতেন গঙ্গোত্রী। সেজকার কাছে এই পথের কথা শুনেছিলাম। গোমুখের যাত্রী খুবই কম হতো, যাত্রীদের মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী। গোমুখ তীর্থ দুর্গম বলে দর্শনী দিতে হতো। সে দর্শনী পথশ্রমের অবর্ণনীয় কষ্ট। মহারাজা ভগীরথের তপোভূমি এখন আর সাধারণের অগম্য নয়। শঙ্কুদার লেখা "বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা"র সম্বন্ধে অনেক পাঠক পাঠিকারা অবাস্তবতার ত্রুটি উল্লেখ করেন। লেখকের বর্ণিত গোমুখের অতীত দিনের চিত্র যথার্থই ভয়াবহ ছিল। ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে সংকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাবধানে এগোতে হতো। গোমুখের কাছাকাছি অংশ সে মাসে বরফে ঢাকা থাকতো। সেই বরফের অনেক অংশই ভাগীরথীর ধারা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই বরফের ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়া আর বরফের মধ্যে ডুবে যাওয়া আদৌ বিচিত্র নয়। আজকের গোমুখের চিত্র অন্যরূপ।

১৯৩৫ সনে অডেন সমীক্ষা করে গোমুখের অবস্থান নির্দেশ করে চিহ্ন করে রেখেছিলেন। সে স্বাক্ষর আজো রয়েছে। সুদূর অতীতে গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা সুখীতে ছিল বলে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভাগীরথীর উপত্যকার দুপাশের গিরিশিরার মাঝখানের সুখীর উচ্চভূমি সেকালের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চাৎপসারণের ফলে প্রান্তিক গ্রাবরেখার সঞ্চিত শিলারাশির ওপরে জলবায়ুর প্রভাবের ফলে বেশ মজবুত প্রাকৃতিক বাঁধে রূপান্তরিত হয়েছিল। সে বাঁধই ভাগীরথীর ধারা অবরুদ্ধ করে হ্রদের সৃষ্টি করেছিল।

গঙ্গোত্রী থেকে চীরবাসার পথ পাইন, চীর আর দেওদার গাছের ছায়ায় ঢাকা। অজস্র ছোট বড় ঝরনা, গাছের নীচে, বিশাল পাথরের পাশে ক্লান্ত পথযাত্রীকে আশ্রয় দেয়। অদূরে সুদর্শন পর্বত, ভৃগু পর্বত। চীরবাসায় পৌঁছবার পূর্বে বেশ বড় ধরনের জলধারা পেরুতে হয়েছিল কাঠের সেতুর সাহায্যে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ভাগীরথীর তটভূমি প্রসারিত। হিমবাহ দ্বারা বাহিত শিলাখণ্ডগুলির বিন্যাস দেখে বোঝা যায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ পিছিয়ে যাবার সময় তার চিহ্নগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে। এইসব শিলাখণ্ডের মাঝে মাঝে বালুকাপূর্ণ নরম মাটিযুক্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায় চীরবাসার ধারে ধারে। চীরবাসায় বনবিভাগের ডাকবাংলো—ভাগীরথীর ওপারে পুরনো ঘর দেখা যাচ্ছিল। হয়তো সে যুগের ধর্ম-শালা। চীরবাসায় কিছুটা বিশ্রাম নিয়েই আবার পদযাত্রা শুরু হয়েছিল। চীরবাসা ছাড়বার পরই দেখেছিলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদের পথের

গিরিশিরার গা বেয়ে বিরাট বিরাট মাটি আর পাথরের জমানো পিলার। প্রকৃতি দেবী এমন নিপুণভাবে এই পিলারগুলো তৈরী করে রেখেছেন। তারই ধার দিয়ে এগুতে হয়েছিল। কোন কোন পিলার বেশ উঁচু। আসলে এগুলো ক্ষয়ীভূত গিরিপথের অংশবিশেষ। অনেক সময় ছোট ছোট পাথর ও মাটি দিয়ে গঠিত গিরিগাত্র আবহাওয়ার প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তাপ ও বাতাসের প্রভাবে ক্ষয়ীভূত মাটি ও পাথর উড়ে গিয়েছে, কোন কোন অংশ হয়তো বা বৃষ্টিতে ভিজে গলে গেছে। কঠিন পাথর ও শক্ত মাটি দিয়ে গড়া অংশটুকু দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিলারগুলোর উচ্চতা কোথাও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট। পিলারের শেষে আলগা পাথরগুলো এমন বিপজ্জনকভাবে রয়েছে যে সেগুলো যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে। সেগুলো পড়ে গিয়ে বা পিলারগুলো ধসে পড়ে তীর্থ-যাত্রীদের প্রাণ হারিয়েছে এমন নজির পাওয়া যায়নি।

হিমালয় বিশাল, বিরাট—অনন্ত তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার। সেই সৌন্দর্য ভাণ্ডার প্রবেশদ্বারে বিপদ আছে। সে বিপদ তাদের, যারা অসতর্ক, দাম্ভিক, সব বাধা বিপত্তি জয় করবার দম্ভ নিয়ে যারা বিশালের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। আমরা তুচ্ছ। বিপদ আপদ আমাদের পথের নিত্য সাথী, নির্জন ও দুর্গম পথে এরাই আমাদের আগে আগে চলে।

প্রচণ্ড রৌদ্র, অপরদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া। মাতৃনালা পেরিয়ে রোডো-ডেনড্রন গাছের ছায়ায় বসি সবাই। জল খেয়ে নেয়া হল। পথ চলা, ক্লান্ত হলেই ছায়ায় বসে বসে শীতল ঝরনার জল পান করা—সব ক্লান্তি চলে যায়। এরপর থেকেই আর বিশ্রাম নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি ভুজবাসার দিকে। মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি আর গুঁড়িগুঁড়ি তুষারপাত শুরু হচ্ছিল। বিকেলবেলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। ততক্ষণে ভুজবাসায় পৌঁছে যাই। লালবেহারীর আশ্রমের কাছেই ভুজগাছের ডাল পাতা আর পাথর সাজিয়ে ছোট ঘর তৈরী করা ছিল। ১৯৬৬ সনে আমি হিমাদ্রি, সুজল, বরেন সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভাগীরথীর জলধারা একেবারে সামনেই। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল গাঢ় কুয়াশায়। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, হিমশীতল পরিবেশ। পরদিন ভোরে পৌঁছোই গোমুখ। আমাদের প্রতিদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকালে চা, মোটামুটি খাবার খেয়ে গোমুখ চলে যাওয়া। বরফের গুহামুখে যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব ততটা এগিয়ে বরফের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করা। বরফের ঘনত্ব, ভাগী-রথীর জলস্রোতের গতিবেগ, জলের গভীরতা অনুমান করা। গঙ্গার

মুখ্যধারা ভাগীরথী, এই মুখ্য ধারাই রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গা। এই বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করা।

গোমুখ থেকে নির্গত জলধারা সুদূর অতীত থেকেই ভাগীরথী নামে প্রচলিত। রামায়ণে বর্ণিত মহারাজা ভগীরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করে যে ধারা এনেছিলেন মর্ত্যলোকে—সে ধারার নাম ভগীরথ। গোমুখ দর্শন করেছিলেন ক্যাপ্টেন হজসন ১৮১৭ সনে। তিনি গোমুখে অবস্থান করে বরফের গুহা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গোমুখের কঠিন বরফ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সেই স্তরীভূত বরফ কঠিন হয়ে খাড়া দেওয়ালের সৃষ্টি করেছিল। সেই দেওয়ালের উচ্চতা তিনশত ফুটেরও বেশী। বরফের গুহার ভেতর থেকে জলধারা প্রচণ্ডবেগে নির্গত হচ্ছিল। এই ধারাই ভাগীরথী। ক্যাপ্টেন হজসন লক্ষ্য করেছিলেন যে গোমুখের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ১২০১৪ ফুট। গোমুখ পেরিয়ে তিনি গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। হিমবাহের বিশালতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। হিমবাহ দেড় মাইলেরও বেশী প্রশস্ত·· চারপাঁচ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। হিমবাহের ডাইনে ও বাঁয়ে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলো মনোমুগ্ধকর। হিমবাহের গড়পড়তা ঢাল ৭° ; অধিকাংশ স্থানে বরফের ওপরে ছোটবড় পাথর ছড়ানো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হিম সরোবর। ছোটবড় পাথরসহ বরফের স্তূপ মাঝে মাঝেই সরোবরের মধ্যে পড়ে। হজসন গঙ্গোত্রী হিমবাহের সম্পূর্ণ অংশ পর্যবেক্ষণ করেন নি। কিন্তু ১৯৩৫ সনে অডেন ভূ-বিজ্ঞানী হিসাবে সুন্দরভাবে জরিপ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গঙ্গোত্রী হিমবাহ বিশাল। তার বিশালতা সুদূর অতীতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিমবাহ তুষার যুগে গঙ্গোত্রী পেরিয়ে হয়তো ঝালা অবধি ছিল। ১৯৩৫ সনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রী মন্দির পেরিয়ে প্রায় মাইল দেড়েক ঢালের দিকে গেলে পাটাঙ্গনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। গ্লেসিয়াল পেভমেণ্টগুলো তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। গঙ্গোত্রী পেরিয়ে চীরবাসা ও ভুজবাসার দিকে এগিয়ে গেলে লক্ষ্য করা যায় ভাগীরথীর ধারা থেকে হাজারখানেক ফুট উচ্চতায় উপত্যকার উভয় পাশের গিরিশিরার গায়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পুরনো যুগের পার্শ্ব গ্রাবরেখার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ পার্শ্ব গ্রাবরেখার চিহ্ন গোমুখে লক্ষ্য করা যায় চারশ ফুট উচ্চতায়। অনুমান করা যায় কি বিশাল বরফের প্রবাহ নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এগিয়ে গিয়েছিল গঙ্গোত্রী পেরিয়ে আরো দূর পর্যন্ত।

১৯৪৯ সনে অধ্যাপক চিম্বর গঙ্গোত্রী হিমবাহের দৈর্ঘ্য তিরিশ কিলোমিটারের চাইতেও বেশী বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতবর্ষের হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত হিমবাহের মধ্যে দীর্ঘতম হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহ। তার পরই বলা চলে—সিকিম হিমালয়ের জেমু হিমবাহ। জেমু হিমবাহের দৈর্ঘ্য পঁচিশ কিলোমিটারের চাইতেও বেশী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত শাখা হিমবাহগুলোর সংখ্যাও কম নয়। সমস্ত হিমবাহগুলোর উৎপত্তিস্থলে অনেকগুলো পর্বতশিখর দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে তেইশ হাজার ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি পর্বতশিখর, বাইশটি বাইশ হাজার ফুটেরও বেশী পর্বতশিখর, ছব্রিশটি একুশ হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর আর ত্রিশটি বিশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতশিখর ছড়িয়ে রয়েছে গঙ্গোত্রী উপত্যকায়।

১৯৬০ সনে গোমুখ পেরিয়ে ভূজবাসা ধর গিরিশিরার গা বেয়ে মাইল কয়েক এগিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। ১৯৬০ সনে কেদারনাথ পর্বত অভিযানের সময় ভূ-বিজ্ঞানী শ্রী এ. পি. তেওয়ারী ভূ-বিজ্ঞানী হিসাবে মোটামুটি মানচিত্র রচনা করেছিলেন। গোমুখ থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম সকালবেলায়। ঠিক গোমুখের ওপর দিয়েই অসমান গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথর পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহ আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছিলাম। পেঁৗছে গিয়েছিলাম ঠিক মেরুনালার ধারে। তারপর গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিম পাশ দিয়ে এগিয়ে ঠিক শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে ২৩শে সেপ্টেম্বর মূল শিবির স্থাপন করেছিলাম। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিম পার্শ্বে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার গিরিশিরা। এই গিরিশিরার পাদদেশে সুদৃশ্য মোটামুটি প্রশস্ত তৃণভূমি। তার নাম তপোবন। তপোবনের নাম শুনেছিলাম অনেকবার। তপোবনের শুরু ১৪২০০ ফুট উচ্চতা থেকে, শেষ হয়েছে ১৫৬০০ ফুট পর্যন্ত। হিমালয়ের এমনি উচ্চতায় সুন্দর তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যাবে। তৃণভূমির ধার ঘেঁষে পূর্বে দেখা যাবে বিশাল গঙ্গোত্রী হিমবাহ। তৃণভূমি থেকে প্রায় পাঁচশ ফুট খাড়া নীচে হিমবাহের মূল ধারা।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের চেহারা গোমুখ থেকে দেখলে বিস্ময়কর মনে হবে। দূর থেকে মনে হবে বিশাল প্রস্তরময় অঞ্চল। প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল অবশ্য ভুজবাসা থেকেই দেখা যায়। গোমুখটি প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়। জলের ধারার রঙও বদলে যায়। গোমুখের যতই কাছাকাছি যাওয়া যায় তখন সামনে অতীতের প্রান্তিক গ্রাবরেখার

স্তূপীকৃত পাথর আর তার সামনে স্বল্প পরিসর বালুকাপূর্ণ অঞ্চল দেখা যাবে। হিমবাহ পিছিয়ে যেতে শুরু করলে তার চিহ্নস্বরূপ ছেড়ে যায় স্তূপীকৃত পাথর, আর বালুকাময় অংশ। সেগুলো পেরিয়ে গোমুখের পাশ থেকে খাড়া প্রান্তিক গ্রাবরেখার অসমান পাথর ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ভুজবাসা ধরেই গিরিগাত্র ঘেঁষে হিমবাহের ওপর ওঠা অনেকটা সহজসাধ্য। হিমবাহের ওপরে উঠলেই নির্বাক হয়ে বসে থাকতে হয়। যে কোন প্রস্তরময় বিশাল বিশাল পর্বতমালা কোন এক অদৃশ্য শক্তির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। মনে হবে, কোন এক অমোঘ শক্তিশালী কারিগর হিমালয়কে দিনরাত ভাঙার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত। সেই ভাঙার কাজ কি সাংঘাতিক ও সুপরিকল্পিত। দূর থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্তূপীকৃত প্রস্তররাশি—আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোর আয়তন অনুমান করা যায় না। আবহমান কাল থেকে তীর্থযাত্রীরা যারা গঙ্গোত্রী পেরিয়ে আসতেন গোমুখ, তাঁরাই এই দৃশ্য দেখে হতবাক্ হয়ে থাকতেন। ভীত হতেন, পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন এমন এক ধ্বংসের দেবতার সামনে। সন্ন্যাসীরা বলতেন—এই তো রুদ্রদেবতার কাজ। হিমালয়ের সমস্ত অঞ্চলই মহাদেব…তাঁরই এক ইঙ্গিতে ধ্বংসের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রস্তরখণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বালিকণা…শেষটায় মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। মহাদেবের জটা থেকে নিঃসারিত গঙ্গা এই মৃত্তিকা বুকে করে বয়ে নিয়ে চলেছে মর্ত্যলোকের জন্য। মর্ত্যলোক ফলেফুলে শস্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে চলেছে।

দূরে ভগীরথ পর্বতমালা, আর চারপাশে বিক্ষিপ্ত স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড। গোমুখের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১২৭৭০ ফুট। গোমুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট। হিমবাহের বরফ যেখানে গলে জলধারার সৃষ্টি করে…সেই অংশই হিমবাহের স্নাউট। হিমালয়ের অধিকাংশ হিমবাহের স্নাউটে বিশাল বিশাল বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যাবে। সেই বরফের গুহামুখ থেকেই নদীর জন্ম। ভাগীরথীর জন্ম গোমুখে—বরফের গুহামুখ থেকে। হিমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ড এসে স্তূপীকৃত হয়ে থাকে ঠিক স্নাউটের কাছেই। এইসব প্রস্তরখণ্ডের স্তূপীকৃত অংশই প্রান্ত-গ্রাবরেখা। হিমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলো গ্রাবরেখা। হিমবাহের পার্শ্বদেশে—হিমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলো পার্শ্বগ্রাবরেখা। হিমবাহের প্রবহমান বরফ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঢাল অনুসারে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রবাহিত বরফ হিমরেখার নীচে পেঁছিতে না

পৌঁছতেই তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য বরফ গলে জলে পরিণত হতে থাকে। সন্ন্যাসীরা বলেন—গোমুখ গঙ্গার জন্মস্থান। সুদূর অতীতের তীর্থযাত্রীরা বলতেন গোমুখ ভাগীরথীর উৎস স্থান। ভাগীরথীরই আর এক নাম গঙ্গা। গোমুখে বরফের বিশাল গুহামুখের ভিতর দিয়ে গঙ্গার জলধারা দুর্বার বেগে নির্গত হয়ে চলেছে। প্রান্তিক গ্রাবরেখার বড় বড় পাথর জলের স্রোতে আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নিম্নে প্রবাহিত হয়েছে। কালক্রমে এইসব ছোট ছোট পাথরগুলো জলস্রোতের আঘাতে আরো ভেঙে ভেঙে নিম্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। এমনি করে পাথর অবশেষে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। গঙ্গার নিম্নউপত্যকায় পলিমাটির দিকে তাকালে বিশ্বাস করা যায় না এই সৃষ্টির কাজে যোগান দিয়ে চলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। এই গঙ্গোত্রী হিমবাহের বিচিত্র গঠন প্রকৃতি, গ্রাবরেখার বিশালতা ও ভয়াবহতা ঠিক সামনাসামনি প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। মাইলের পর মাইল স্তূপীকৃত বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড ঢেউয়ের মতো গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ওপরে আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে। প্রান্তিক গ্রাবরেখার নিকটবর্তী অংশই সবচাইতে বেশী ভাঙাচোরার কাজে ব্যস্ত থাকে। সে অংশের কোথায়ও কোথায়ও বড় বড় বরফের ফাটল দেখা যায়। কোথায়ও স্তূপীকৃত পাথরের ঢালের শীর্ষের উচ্চতা দু-তিনশ ফুটেরও বেশী। গ্রাবরেখার ওপরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই এক অভাবনীয় জিজ্ঞাসা মনে জেগে ওঠে। এই অনন্তকাল ধরে পাথর ভাঙাচোরার কাজে যোগান দিতে গিয়ে গিরিরাজ হিমালয় কি নিঃস্ব হয়ে যাবে না? জানি না এই জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে কি না।

১৮১৭ সনে হজসন সাহেব গোমুখ পেরিয়ে, গ্রাবরেখার অসমান পাথরের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠেছিলেন। অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ বৎসর পূর্বের কথা ভাবা যাক। তখন গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট কোথায় ছিল নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ভুজবাসার পর থেকেই উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট ভুজবাসার কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। ভুজবাসা থেকে গোমুখ যাবার পথে প্রথম দেখা যাবে ভুজবাসাগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে পুরনো গ্রাবরেখার ছোট ছোট পাথর আর বালুকণা। এই পুরনো গ্রাবরেখা অঞ্চলের পাথরগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তে সেখানে মাটি মিশ্রিত বালুকণা থাকায় ভূমি উর্বর হয়েছে। ভুজবাসা সংলগ্ন অনেক জায়গা জুড়ে লালবেহারী সুন্দর আলু ও সব্জীর

চাষ করেছে। আরো মাইলখানেক গোমুখের দিকে এগিয়ে গেলে বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাকে ঘিরে রেখেছে স্তূপীকৃত ছোটবড় প্রস্তরখণ্ড। হজসন সাহেব তার বর্ণনায় ভুজবাসার উল্লেখ করেন নি। মারখম সাহেবের গোমুখ দর্শনের মধ্যেও এই স্থানের বর্ণনা করেন নি. গঙ্গোত্রীর মন্দিরের অবস্থান কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব কম ছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌঁছে হিমবাহের কয়েক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেড়শ বছর পরে গোমুখের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়েছে। প্রান্তিক গ্রাবরেখার অনেক বড় বড় পাথর বরফ থেকে মুক্ত হয়েছে। শীতাতপ, তুষারপাত, ধস নামার ফলে বড় বড় পাথরগুলো ভেঙে ছোট হয়েছে। ধীরে ধীরে সেখানে নানাধরনের গুল্মের জন্ম হয়েছে। দেড়শ বৎসর পরে আমাদের গোমুখ পেরিয়ে গ্রাবরেখার আরোহণ করতে গিয়ে আলগা পাথরের স্তূপগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সব স্তূপীকৃত পাথরের ঢাল…পাথরগুলোর আকৃতি বড় বড় একটি পাথর পেরিয়ে আর একটি পাথরের ওপর উঠতে গেলেই ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হিমশিম হতে হয়েছে। এমনি পাথরের স্তূপের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একাকী অগ্রসর হওয়া খুবই বিপজ্জনক। তবে সবার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে উচ্চ কোন পাথরের ওপরে ছোট ছোট পাথর রেখে চিহ্ন রাখতে রাখতে এগিয়ে যেতে হয় সাবধানে, যাতে নিশ্চিন্তভাবে পথ দেখে ফিরে আসা যায়। স্তূপীকৃত বিশাল পাথরের পাথরের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেলে আর উপায় নেই। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে হয়তো মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে শেষটায়। গোমুখের গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপরে বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরগুলোর আড়ালে পথ হারিয়ে কোন দুঃসাহসী যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে এমন কথাও শুনেছি। গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের দিকে অগ্রসর হতে গেলে প্রথম কিছুটা পথ পূর্বাভিমুখে এগুতে হয়। হিমবাহের দু পারের গিরিশিরা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। তারপর হিমবাহ বেশ অনেকটা পথ দক্ষিণদিকে এগিয়ে গিয়েছে। হিমবাহের উৎস মুখে মোড় ঘুরে আবার পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। উৎস মুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গোমুখ পর্যন্ত মোট দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটারেরও বেশী। হিমবাহ সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা হবে যে হিমবাহ অর্থ বরফের নদী। উচ্ছল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী যদি কোন মন্ত্রবলে প্রবাহ বন্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, হিমবাহ ঠিক তাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সামনা সামনিভাবে—হিমবাহের

বিশালতা অনুমান করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ, কোথায় সেই বরফের নদী, কোথায় সুসংবদ্ধ গতিশীলতার চিহ্ন! হিমবাহ শব্দের মধ্যে গতিশীলতার আভাষ রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেরূপ কোথায়? মাইলের পর মাইল জুড়ে স্তূপীকৃত পাথর আর পাথর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। এক বিপুল শক্তিবলে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত গিরিশিখরের ধ্বংসাবশেষ। এই বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত প্রস্তর স্তূপের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে আমরা তপোবনে পেঁছে গিয়েছিলাম।

তপোবন উত্তর পশ্চিম থেকে শুরু করে দক্ষিণে শেষ হয়ে গিয়েছে। শেষ প্রান্তে প্রায় চার পাঁচশো ফুট নীচে স্তূপীকৃত পাথরের ঢাল। এটি আসলে কীর্তি বামক ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সংযোগস্থল। এই স্থান থেকে সোজা পূর্বে তাকালে বরফাবৃত গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎস মুখ দেখতে পাওয়া যায়। তপোবনের সোজা পশ্চিমে গিরিশিরার ঢালু অংশ··· আরো উচ্চতায় আরোহণ করলে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা। শিবলিঙ্গের দুটি শিখর দেখতে পাওয়া যাবে। মূল শিখরটিই অপরূপ। পূর্বে— তপোবনের তৃণাঞ্চল অংশের পরই পাঁচ ছশো ফুট নীচে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। হিমবাহের ওপরে ভাগীরথী পর্বতমালা। শিবলিঙ্গের পাদদেশে সমাধিস্থ ভগীরথ। অনন্তকাল ধরে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন ভগীরথ। তার সাধনা সার্থক হয়েছিল। গঙ্গার পবিত্র ধারা গোমুখে বরফের গুহামুখ থেকে নির্গত হয়ে অবতরণ করেছে নিম্নমুখী মর্ত্যলোকে।

তপোবন থেকে কীর্তি হিমবাহে অবতরণ করতে হয়েছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের এই পার্শ্বদেশে প্রথম শাখা হিমবাহ কীর্তি হিমবাহ। তপোবনের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের খাড়া ঢাল বেয়ে অবতরণ করতে হয়েছিল গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথরগুলোর মধ্যে। সে স্থানটি গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও কীর্তি হিমবাহের সঙ্গমস্থল। দুটি হিমবাহের সঙ্গমস্থলে সম্ভবত দুটি উপত্যকা প্রশস্ত হয়। উপত্যকার দুপাশে পার্শ্বরেখা ছাড়াও—মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে আরও একটি গ্রাবরেখা দেখা যায়। তার নাম মধ্য গ্রাবরেখা। মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো স্তূপীকৃত হলেও বেশ অনেকটা স্থান জুড়ে তাঁবু স্থাপন করার মতো প্রায় সমতল স্থান পাওয়া যায়। সঙ্গমস্থল পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের দিকে এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে বেশ বড় রকমের হিম সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ নীলাভ জল, জলের গভীরতা রয়েছে। এই সরোবরের পাশ দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎসের দিকে এগিয়ে গেলেই গনহিম্ বামক আর গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমস্থল। গনহিম্ বামকের বরফ সংগৃহীত হয় খরচাকুণ্ড পর্বত শিখর থেকে।

অদূরেই আরো দু'তিনটি হিম সরোবর দেখা যাচ্ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের মধ্যস্থলে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহের গ্রাবরেখার সুস্পষ্ট চিহ্ন ঢেকে গিয়েছে বরফে। উৎসের দিকে তাকালেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বরফের নদীর মতোই তরঙ্গসংকুল শুভ্র জলধারা যেন কোন এক মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ মোড় ঘুরেছে সোজা পূর্বে। মোড় ঘুরবার মুখেই হিমবাহের অপর প্রান্তে আর একটি শাখা হিমবাহ রয়েছে যার নাম স্বচ্ছন্দ বামক। স্বচ্ছন্দ বামক বরফ সংগ্রহ করে স্বচ্ছন্দ পর্বত শিখর থেকে। কীর্তি হিমবাহ ও গংগোত্রী হিমবাহের সংগমস্থল থেকে স্বচ্ছন্দ হিমবাহ দেখা যায় না। স্বচ্ছন্দ পর্বত শিখরও দৃশ্যমান নয়। তবে গনহিম্ বামক ও গংগোত্রী হিমবাহের সংগমস্থলে অবস্থিত সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড যাকে স্থানীয় লোকজন সুন্দরবন বলে, সে অংশের কিছুটা দেখা যায়। কীর্তি হিমবাহ ও গংগোত্রী হিমবাহের সংগমস্থল অনুসরণ করে আরো প্রায় মাইল দেড়েক এগিয়ে গিয়ে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল ১৬৫০০ ফুট উচ্চতায়। কীর্তি হিমবাহের দৈর্ঘ্য আনুমানিক সাড়ে চার মাইল হবে। হিমবাহের ওপারে বিশাল তুষারাবৃত পর্বত শিখর—কেদারনাথ ডোম (২২৪১০ ফুট)। তার সংগে যুক্ত গিরিশিরায় অবস্থিত মূল শিখর—কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০ ফুট) তুলনামূলকভাবে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে। কেদারনাথ পর্বত শৃংগের গিরিশিরা এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিম উত্তরে, শেষে মোড় ঘুরেছে পশ্চিমদিকে। এই গিরিশিরার শীর্ষে ভারতখুণ্টা পর্বতশৃঙ্গ (২১৫৮০ ফুট), কীর্তিস্তম্ভ (২০৫৭০ ফুট ও ২০৫২০ ফুট)। সর্ব পশ্চিমে দূরে ভৃগুপন্থ পর্বত (২২২১৮ ফুট)। ভৃগুপন্থের গিরিশিরা পূর্বদিকে মোড় ঘুরছে। গিরিশিরার ওপরে রয়েছে মেরু পর্বত (২১৮৫০ ফুট), আর শিবলিঙ্গ পর্বতের দ্বিতীয় শৃঙ্গ (২১৩৩০ ফুট)। এমনি অদ্ভুত গিরিপ্রাকার দিয়ে বেষ্টিত উপত্যকার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত কীর্তি হিমবাহ।

গ্রাবরেখার অসমান পাথরগুলোকে মোটামুটি সমান শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। পাথরগুলোর তলদেশ দিয়ে কলকল শব্দে জলধারা বয়ে চলেছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সে জল সংগ্রহ করে পাত্রে রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই জমে যাচ্ছিল। শিবিরের স্থানটির মাথার ওপরে সুউচ্চ পাথরের দেওয়াল। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়—এই বিশাল গিরি প্রাচীর-মেরু পর্বতের দক্ষিণ গাত্র ও শিবলিঙ্গ পর্বতের দ্বিতীয় শিখরের দক্ষিণ গাত্র।

কীর্তি হিমবাহের পূর্ব নাম ছিল কেদারনাথ হিমবাহ। ১৯৩৫ সনে

অডেন ও ম্যাকডোল্যাণ্ড এই হিমবাহের ওপরে শিবির স্থাপন করে কেদারনাথ পর্বতমালার একটিতে আরোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই অঞ্চল তেমনভাবে জরিপ করা হয় নি পূর্বে। তাই কেদারনাথ ডোম, কেদারনাথ পর্বত ছাড়া—একই গিরিশিখার গায়ে যুক্ত ভারতখুণ্টা পর্বত ও কীর্তিস্তম্ভ—সবগুলো পর্বত শিখরকে কেদারনাথ পর্বতমালা বলে অভিহিত করেছিলেন অডেন। অবশ্য এইসব পর্বত শিখরের কোনটাতেই আরোহণ করতে পারেন নি অডেন ও ম্যাকডোল্যাণ্ড। তবু অডেনের পর্যবেক্ষণের ত্রুটি ছিল না। কীর্তিস্তম্ভ পর্বত শিখরদেশ থেকে পর্বত গাত্র বেয়ে অবতরণ করেছিল উপত্যকার পাদদেশে। এই বরফের ধারাকেই কীর্তি হিমবাহ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কীর্তি হিমবাহ অনুসরণ করে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হলেই দেখা যাবে কীর্তিস্তম্ভ পর্বত শিখরের পাদদেশে সঞ্চিত বরফ ছোট ধরনের হিমপ্রপাতের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কেদারনাথ পর্বত ও ভারতখুণ্টা পর্বতশীর্ষ থেকে সংগৃহীত প্রভূত পরিমাণ বরফ অবতরণের মুখে বিশাল মারাত্মক হিমপ্রপাতের সৃষ্টি করেছিল। সেই হিমপ্রপাত থেকে বরফের ধারা এসে মিলিত হয়েছিল কীর্তিস্তম্ভের পাদদেশে উদ্ভূত হিমপ্রপাতের সঙ্গে। সুতরাং সমস্ত অঞ্চলে সঞ্চিত বরফের ধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে হিমবাহকে কেদারনাথ হিমবাহ বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

কীর্তি হিমবাহের গতিপথ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম কীর্তিস্তম্ভের পাদদেশের কাছাকাছি। হিমবাহের মাঝামাঝি স্থানে দেখেছিলাম ছোটবড় দু-তিনটি হিমসরোবর। হিমসরোবরের জলাধার জল শূন্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলাম। জলাধারের পাদদেশে দেখেছি মিহি বালুকণা আর নরম কাদা। বুঝেছিলাম হিমসরোবরের মৃত্যু ঘটেছিল সামান্য কয়েক বছর পূর্বে। হিমবাহের দুটি বড় বড় বরফের ফাটল অতি সহজেই অতিক্রম করে হিমবাহের ওপরে পৌঁছে গিয়েছিলাম কোণাকুণিভাবে এগিয়ে। প্রায় শ'পাঁচেক ফুট খাড়া গ্রাবরেখার পাঁচিল বেয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম কেদারনাথ ডোমের সামনে অপরূপ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। সেখান থেকে আরো উঁচুতে উঠেছিলাম কেদারনাথ ডোম থেকে নেমে আসা হিমবাহ অতিক্রম করে ১৮৭৫০ ফুট উচ্চতায়। সেখানে পরবর্তী শিবির স্থাপন করেছিলাম। শিবিরটি ছিল কেদারনাথ ডোমের একটি গিরিশিরার ওপরে। গিরিশিরা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে মূল কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত। কেদারনাথ ডোম ও কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার কাছ থেকে প্রভূত বরফ নেমে এসে

মারাত্মক হিমপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। শিবিরের স্থানটির পশ্চিমে খাড়া গিরিখাতের ভেতর দিয়ে কেদারনাথ পর্বত থেকে আসা বরফের প্রবাহ দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। সামনেই ভারতখুণ্টা পর্বত, কীর্তিস্তম্ভ। চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম সমস্ত উপত্যকাটি। কীর্তি হিমবাহের নামকরণ যে যথার্থ নয়, চারপাশের গিরিশিখরগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়। কেদারনাথ পর্বতের সঙ্গে গিরিশিরার শীর্ষে ভারতখুণ্টা, কীর্তিস্তম্ভ, আরো দূরে ভৃগুপন্থ পর্বত। ভৃগুপন্থ পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা বরফের ধারা নেমে এসে অবতরণ করেছে কীর্তি হিমবাহে। এই হিমবাহটি সুন্দর ও নদীর মতোই সুস্পষ্ট। বরফের ধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বলতে যা বোঝা যায় এই সুন্দর হিমবাহ দেখলে তা বোঝা যায়। পরে আরো উঁচুতে ২০৪০০ ফুট উচ্চতায় শিবির স্থাপন করেছিলাম। সেখান থেকে কেদারনাথ ডোমের বিশাল তুষারাবৃত গিরিশিরার গা বেয়ে ২১০০০ ফুটেরও ওপরে উঠে দেখেছিলাম চারদিকটা। গঙ্গোত্রী হিমবাহের মূলধারা উৎস পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল দূরে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সজীব ধারাকে নদীর মতোই চঞ্চলা উত্তাল শুভ্র জলপ্রবাহের মতোই মনে হচ্ছিল। কীর্তি হিমবাহের ছোট্ট ধারা·· ভৃগুপন্থ থেকে আসা···অপর একটি বরফের ধারা···অবাক হয়ে দেখেছিলাম ২১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে। ভাগীরথী পর্বতমালা, শিবলিঙ্গ পর্বত, কেদারনাথ পর্বত আমার চার পাশে। শান্ত সমাহিত মহারাজা ভগীরথ, সন্নিকটেই দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যান গম্ভীর মহাদেবের বিশাল মূর্তি। অসংখ্য হিমবাহের জটাজালই কি মহাদেবের জটা? সেই বিশাল জটাজাল থেকে মুক্ত ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, আরো ছোট বড় অসংখ্য গঙ্গার ধারা। কল্পনার দৃষ্টিতে দেবপ্রয়াগে দেখি এই সব জলধারার অন্তিম স্থল—যার নাম গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারা মহারাজা ভগীরথের নির্দেশিত পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মর্ত্যলোকে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রধান দুটি শাখা হিমবাহের নাম চতুরঙ্গী আর রক্তবরণ। ১৯৩৬ সনে ওসম্যানটন সাহেব দলবল নিয়ে সমস্ত অঞ্চল জরিপ করেছিলেন। ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মান দল গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও শাখা হিমবাহ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই সব হিমবাহের শাখা প্রশাখার উৎস স্থলে অবস্থিত পর্বত শিখরগুলো আরোহণ করেছিলেন একটির পর একটি করে।

চতুরঙ্গী হিমবাহ ও রক্তবরণ হিমবাহ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করবার সুযোগ ঘটেছিল ১৯৪৪, ১৯৪৯, ১৯৬০ ও ১৯৪৪ সনে। এই হিমবাহ ও তার শাখা প্রশাখা, গ্রাবরেখার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থান করেছিলাম। তাই এই সব অঞ্চলের জলবায়ু, তুষারপাত, হিমানী সম্প্রপাত লক্ষ্য করেছিলাম। এই সব শাখা হিমবাহের প্রবাহিত বরফ মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধারা অব্যাহত রেখেছে সুদূর অতীতকাল থেকে। হিমালয়ের অন্য কোন হিমবাহে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আর কোথায়ও আছে বলে মনে হয় না। ভাগীরথী যে গঙ্গার মুখ্য ধারা, একথা ভাববার পূর্বে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বিশালতার কথাই ভাবতে হবে।

১৯৪৪ সনে বাস-পথে উত্তরকাশী থেকে রওনা হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম সুখী। ঝালা যাবার পথে ভাগীরথীর ধারার পাশের গিরিশিরার গায়ে দেখেছিলাম মূল্যবান চুনি পাথর। এই গিরিশিরা মূল ঝালা গ্রামের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ গিরিশিরা। ঝালায় ভাগীরথীর প্রশস্ত উপত্যকার পাদদেশ বালুকাপূর্ণ জমির ওপর দিয়ে জলধারা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হওয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলাম নতুন করে। সুখীর বিপরীত দিকের গিরিশিরার ঝুলন্ত উপত্যকা। সেই উপত্যকার গা থেকে প্রবাহিত ধারা খাড়া গিরিগাত্র বেয়ে অবতরণ করেছে। এই ধারা এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর জলধারার সংগে। এই ধারা হয়তো কতকাল পূর্বের হিমবাহের বরফগলা জলধারা। হিমবাহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কালের পরিবর্তনে। সেই হিমবাহ কোন এককালে গিরিগাত্র বেয়ে অবতরণ করেছিল। হিমবাহটি লুপ্ত হয়ে হিমবাহ উপত্যকার স্বাক্ষর রেখে গেছে। জানি না, এই ঝুলন্ত হিমবাহ উপত্যকা কি অতীত কালের তুষার যুগের ইতিহাস বহন করে রেখেছিল? গঙ্গার উৎস তখন হয়তো ছিল সুখী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চাদপসরণের সময় হ্রদের সৃষ্টি করে রেখেছিল। সে হ্রদ সৃষ্টির কাহিনী ও কালনির্ণয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্য কোন লিপিকার এসেছিলেন কিনা জানি না। হয়তো বা লিপিবদ্ধ সে যুগের ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে। রামায়ণ যুগের বিন্দুসরোবর যে স্থানে মহারাজা ভগীরথ এসেছিলেন তার অস্তিত্ব আজ ভূগোল বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাবেন না সত্যি। কিন্তু হিমালয়ের গর্ভে এমনি বিস্ময়কর অনেক হ্রদেরই সৃষ্টি হয়েছিল। সেই হ্রদগুলোর কোনটি হয়তো ক্ষীণজীবি, কোনটির স্বাক্ষর আজো বর্তমান। ১৯৪৪ সনে বাস-পথ এগিয়ে গিয়েছিল ধারালী পর্যন্ত।

১৯৭২ সনে বাস-পথ জাংলা পেরিয়ে পেঁাছে গিয়েছিল লংকা পর্যন্ত। গংগোত্রী থেকে গোমুখের অতি পরিচিত পথ; ভাগীরথীর জলধারা অনুসরণ করে পায়ে চলা পথ। গংগাকে দেখতে দেখতে ক্লান্তি ভুলে যেতে হয়, পথ চলতে চলতে বার বার দেখি সুদর্শন পর্বত, ভৃগু পর্বত। ভুজবাসা পেরুতেই দেখি শিবলিংগের শীর্ষ দেশ আর দূরে ভগীরথ পর্বতমালা। গোমুখে পেঁাছেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাই অনন্তকাল থেকে বরফের গুহা থেকে মুক্ত গংগার উচ্ছল প্রবাহ।

১৯৬৬ সন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত গোমুখের অবস্থান, বরফের গুহার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছি। ১৯৬৭ সনে গোমুখে যে স্থানে শিবির স্থাপন করে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম—১৯৬৯ সনে সে স্থানটি খুঁজে বার করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। তিন বছরে তিনটি শীত আর তিনটি বর্ষা, তুষার ঝড়, শীতের তুষার ধস এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় গোমুখের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছে। বরফের গুহামুখ দিক পরিবর্তন করেছে। বেশ কয়েক শ' গজ পিছিয়ে গিয়েছে গোমুখ। ১৯৭৪ সনে গোমুখের আরো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। ১৯৬৭ সনে দেখা ভুজবাসাধরের গিরিশিরার কাছে অডেনের চিহ্নিত পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে গোমুখের অবস্থান নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। ১৯৬৯ সন থেকে ১৯৭৪ এই পাঁচ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট যেন আরো দ্রুতবেগে পিছিয়ে যেতে চলেছে। বাৎসরিক তুষারপাত, তুষারধস, যা দ্রুত বেগে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৬৯ সনে গোমুখে বাধ্য হয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল বেশ কয়েক-দিন। কারণ, গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখে পেঁাছতেই সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বেগে। প্রচণ্ড তুষারপাত একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। সমস্ত উপত্যকা গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। ভাগীরথীর উচ্ছল শব্দ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই বিপর্যয় বোধ হয় আর বন্ধ হবে না। অবশ্য তুষারপাত বন্ধ হতেই আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। গোমুখে হাঁটু-খানেক তুষার জমেছিল। সূর্য উঠবার পরই তুষার গলে গোমুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জল জমে গিয়েছিল সেদিন। পরিষ্কার নীল আকাশ, হিম-শীতল ঝোড়ো হাওয়া। সূর্যের তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভুজবাসাধরের গিরিগাত্র বেয়ে ছোট বড় অজস্র পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল বরফ গলবার সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরু ঘরু শব্দে পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে প্রচণ্ড

বেগে ছিটকে পড়ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখার ওপরে। এইসব সঞ্চিত পাথরগুলোই কালক্রমে হিমবাহে বাহিত হয়ে স্নাউটের কাছে সঞ্চিত হতে থাকে। এমনি হিমবাহের উভয় পার্শ্বে গ্রাবরেখার ওপরে অফুরন্ত পাথরগুলোর যোগানদার হিমবাহের উভয় পারের গিরিশিরা আর গিরিশিরার শীর্ষদেশের পর্বতশৃঙ্গগুলি।

সেদিন কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যেই ভৃজবাসাধরের পাদদেশের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম খুব সাবধানে পার্শ্ব গ্রাবরেখাকে ডান পাশে রেখে। প্রায় মাইল দুয়েক অসমান পাথরগুলোর ঢাল বেয়ে এগুতে এগুতে থমকে যেতে হয়েছিল। ভৃজবাসাধরের দীর্ঘ গিরিশিরা যেন সোজা উত্তরাভিমুখে এগিয়ে গিয়েছে। সেদিকে প্রশস্ত রক্তবরণ উপত্যকা। গঙ্গোত্রী হিমবাহের একটি প্রধান শাখা হিমবাহ-রক্তবরণ এসেছে এই দিক থেকে। প্রায় সাত আট শ' ফুট নিচে দেখছিলাম কালীগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে। এই কালীগঙ্গা উৎসারিত হয়েছে রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউট থেকে। উত্তরে রক্তবরণ উপত্যকার উচ্চভূমি, সেই ভূমির ওপর দিয়ে কালীগঙ্গার জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিচের দিকে।

পাথরের ঢাল বেয়ে বেয়ে নিম্ন অবতরণের পর পেঁছে গিয়েছিলাম কালীগঙ্গার ধারে। কালীগঙ্গার প্রশস্ত তটভূমি ছোট ছোট পাথর আর বালুকণা। হয়তো সুদূর অতীতে রক্তবরণ হিমবাহ এই স্থানে এসে মিলিত হয়েছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ধারার সঙ্গে। পরে রক্তবরণ হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণের সময় চিহ্নগুলো রেখে গিয়েছে। কালীগঙ্গার ধারা দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত ঢালু পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কালীগঙ্গার সমান্তরালে একটি দীর্ঘ ও উচ্চ গিরিশিরা প্রসারিত হয়েছে পূর্ব দিকে। এই গিরিশিরার দক্ষিণ ঢালে চতুরঙ্গী হিমবাহ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ্য শাখা হিমবাহ। গিরিশিরার উত্তর ঢালে রক্তবরণ হিমবাহ। মূলতঃ এই গিরিশিরা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত হয়ে রক্তবরণ উপত্যকা ও চতুরঙ্গী উপত্যকাকে পৃথক করে রেখেছে উচ্চ গিরিপ্রাচীর সৃষ্টি করে। আর এই উচ্চ গিরিশিরার শীর্ষে কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। এই দীর্ঘ গিরিশিরার প্রবেশ পথেই স্তূপীকৃত চতুরঙ্গী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো। এই হিমবাহের স্নাউট কোথায় অবস্থিত ছিল, খুঁজে বার করা যাবে না। চতুরঙ্গী হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেছিল বহু পূর্ব থেকেই। সেই পশ্চাদপসরণ আজো অব্যাহত। ১৯৬৮ সন থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত

পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথরের তলা দিয়ে জলধারা লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম থেকেই। এই জলধারা সোজা পশ্চিমে এসে কালীগংগার ধারার সংগে মিলিত হয়েছে। এই কালীগংগা রক্তবরণ উপত্যকার উচ্চভূমি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েক শ' ফুট নিচে। তারপর সেই জলধারা সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে প্রায় গংগোত্রী হিমবাহ ও চতুরংগী হিমবাহের সংযোগস্থল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তারপর সেখান থেকে জলধারা সামান্য পশ্চিম দিকে বেঁকে গংগোত্রী হিমবাহের বরফের সুড়ংগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। হয়তো গোমুখের সংগে যুক্ত হয়েছে এই জলধারা দীর্ঘ বরফের সুড়ংগ পথ বেয়ে। এই সুড়ংগ পথ পর্যবেক্ষণ করেছি ১৯৩৫ সন থেকে। হয়তো অত্যধিক তুষারপাতে অথবা তুষার ধসে সুড়ংগ মুখ সাময়িকভাবে ঢাকা পড়তে পারে। তবে এই সুড়ংগপথ দীর্ঘ, কালীগংগা ও চতুরংগী হিমবাহ থেকে আসা জলধারা গংগোত্রী হিমবাহের বরফের ভেতর দিয়ে পথ বানিয়েছিল। এই সুড়ঙ্গপথে বয়ে আসা জলধারা যে গোমুখে পেঁাছে গিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩৫ সনের সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার টপোশীটে রক্তবরণ হিমবাহ থেকে আসা জলধারা গঙ্গোত্রী হিমবাহ পর্যন্ত আসার চিহ্ন রয়েছে। পরবর্তী ১৯৩৫ সনের সার্ভে শীটেও এই জলরেখা চিহ্নিত রয়েছে। ভাগীরথীর উৎস স্থান তবে কি গোমুখ পেরিয়ে আরো বেশী উচ্চতায় অবস্থিত।

চতুরংগী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা পেরিয়ে বেশ কিছুটা পাথরের ঢাল পেরুলেই চতুরঙ্গী হিমবাহের মধ্য গ্রাবরেখায় পেঁাছে যাওয়া তেমন কষ্টকর নয়। মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে প্রায় সমতল স্থানের সৃষ্টি করেছে। বড় বড় পাথরগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে। সেখানে ছোট ছোট গুল্মের আভাস দেখা দিয়েছে উপযুক্ত পরিবেশ গুণে। সেখানে রাত্রিবাসের উপযোগী শিবির স্থাপন করা যায় সহজেই। এই মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলোর ঢালের শেষ প্রান্তে বেশ বড় হিম সরোবরের সৃষ্টি হয়েছিল অতীত হিমবাহ পশ্চাদপসরণের সময়। ১৯৩৫ সনে দেখে ছিলাম সেই হিম সরোবর নীলাভ জলে পূর্ণ। ১৯৩৫ সনে সরোবর শুষ্কও প্রায়। জলাধারের তলদেশে কাদা আর বালি, সামান্য নোংরা জলে ছোট ছোট পোকা কিলবিল করছিল। এই মধ্য গ্রাবরেখা পেরিয়ে প্রায় পাঁচ দশ ফুট খাড়া গ্রাবরেখার প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠলেই অপরূপ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড নন্দন বন। বেশ প্রশস্ত সমতলভূমি-মাঝখান দিয়ে দু-তিনটি

ধারায় সুন্দর স্বচ্ছ জলের ঝরনা বয়ে চলেছে। সমতল ভূমির দক্ষিণে খাড়া গিরিপ্রাচীর। ভাগীরথী পর্বতমালার গিরিশিরা—এই গিরিশিরার দক্ষিণ পূর্বে ঘুরে গিয়েছে। গিরিশিরার ওপরেই ভাগীরথীর দ্বিতীয় শৃঙ্গ। এই দ্বিতীয় শৃঙ্গের পূর্ব ঢাল থেকে হিমবাহ বয়ে এসে মোড় ঘুরে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহ পর্যন্ত। কিন্তু কালের অমোঘ নির্দেশে এই হিমবাহের বরফ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছিল। হিমবাহের স্নাউট পেছিয়ে যেতে যেতে ভাগীরথীর পূর্ব ঢালের ওপর স্থিত হয়ে রয়েছে। স্নাউট থেকে আসা জলধারা এসেছে নন্দনবনে। ভাগীরথী হিমবাহের উপত্যকা ভাগীরথী পর্বতমালার গিরিশিরাকে বেষ্টন করে রয়েছে পূর্ব দক্ষিণ থেকে উত্তরে তারপর সোজা পশ্চিমে উপত্যকার শেষ অংশ নন্দনবনে। ভাগীরথী হিমবাহের উপত্যকার তলদেশ তেমন গভীর হতে পারে নি কারণ—হিমবাহের আয়ুষ্কাল খুবই কম ছিল। স্বল্প পরিমাণ বরফের প্রবাহ উপত্যকার তলদেশ ও পার্শ্বদেশে ক্ষয়ের চিহ্ন রাখতে পারে নি। তবু উপত্যকার পার্শ্বদেশে সঞ্চিত পার্শ্ব গ্রাবরেখার পাথরগুলো বেশ সুন্দর দীর্ঘ গ্রাবরেখা প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। এই প্রাচীরের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে খাড়া পাঁচ ছশো ফুট নিচ দিয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহ প্রবাহিত। চতুরঙ্গী হিমবাহ আজো সজীব···হিমবাহের প্রভাবে পার্শ্বদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে···চতুরঙ্গী উপত্যকার তলদেশ তাই গভীর। গ্রাবরেখা প্রাচীর সুদূর অতীতে হয়ত এমন ছিল না—ভাগীরথী হিমবাহ উপত্যকা ও চতুরঙ্গী প্রায় একই রূপ ছিল। দুপাশে দুটি হিমবাহকে পৃথক করে রেখেছিল এই মধ্য গ্রাবরেখা। আজও এই গ্রাবরেখার প্রাচীরের দু পাশ থেকে পাথর সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—চতুরঙ্গী হিমবাহের গ্রাবরেখা ও ভাগীরথী হিমবাহের গ্রাবরেখায় দু ধরনের পাথর সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। হিমবাহের সজীবতা···ও ক্ষয় হওয়া ···এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর কোথায়ও বোধহয় পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এই ভৌগোলিক পরিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশকেও অদ্ভুত ভাবে পরিবর্তিত করে। সুদূর অতীতের চিহ্নগুলো গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তখন। নতুন করে ভাবতে হয় সমস্ত ধ্যান ধারণার কথা।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের মুখ্য দুটি হিমবাহ রক্তবরণ ও চতুরঙ্গী। চতুরঙ্গী হিমবাহের দৈর্ঘ্য আট মাইল। পূব থেকে অলকানন্দা আরোয়া উপত্যকার জলবিভাজিকার ওপারকার কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ থেকে সঞ্চিত বরফ চতুরঙ্গী

হিমবাহের জন্ম দিয়েছিল। এই হিমবাহের বরফের ধারা অব্যাহত রেখেছে উত্তর থেকে আসা কালিন্দী বামক ও খালিপেট বামক, দক্ষিণ দিকে থেকে আসা সেতা বামক, সুরালয় বামক, সুন্দর বামক ও বাসুকী বামক। সবগুলোর উৎস মুখে বড় বড় সুদৃশ্য তুষারবৃত পর্বতশৃঙ্গ। সেগুলোর নাম চন্দ্রাপর্বত, সতোপন্থ পর্বত ও বাসুকী পর্বত। বাইশ হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বত শিখরগুলো মনোমুগ্ধকর। ১৯৬৮ সনে বাসুকী বামক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ছোট হিমবাহ বাসুকী পর্বতের পশ্চিম গাত্র থেকে বরফের ধারা এসে সৃষ্টি করেছিল এই ছোট্ট হিমবাহ। বেশ উচ্চ পর্বতগাত্র থেকে বরফের ঢাল নেমে আসবার পথে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। গভীর সেই ফাটল···হিমবাহের দুধারে খাড়া গিরিগাত্র—কঠিন শিলার মতো শক্ত বরফ···। ১৯৬৯ সনে দেখেছি বাসুকী হিমবাহ মৃতপ্রায় হতে চলেছে। ১৯৭৪ সনে অবাক হয়েছি হিমবাহের মৃত্যু ঘটেছে। বড় বড় পাথর এলোমেলো বিক্ষিপ্ত তলা দিয়ে কল কল শব্দে জলধারা বয়ে চলেছে। বাসুকী পর্বতের উত্তরগাত্র থেকে কোনো এককালে বরফের ঢাল নেমে এসে বেশ প্রশস্ত হিমবাহের সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে হিমবাহের মৃত্যুর পর হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিল। পিছিয়ে যাওয়া স্নাউট থেকে আসা জলধারা সঞ্চিত হয়ে অপরূপ হ্রদের সৃষ্টি করেছিল। আদর করে নাম রেখেছিল বাসুকী তাল। পর্বতারোহীরা এই হ্রদের তীরে শিবির স্থাপন করে রাত্রিবাস করতেন। ১৯৩৫ সন থেকে দেখেছি, রাত্রিবাস করেছি। ১৯৩৫ সনে দেখি এই অপরূপ হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে। কাদা মাটি আর বালির ওপরে মসৃণ ঘাস জমেছে। ১৯৩৫ সনের পূর্ব থেকে যাঁরা বাসুকী তালের তীরে বসে বসে সহস্র ফণাযুক্ত বাসুকীর তুষার-শুভ্র শীর্ষ দর্শন করতেন হ্রদের জলে, ১৯৭৪ সনে সে দৃশ্য আর দেখতে পান নি। উচ্চ হিমালয়ে এমন ভৌগোলিক পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটন ঘটে, পর্যবেক্ষণ না করলে বিশ্বাস করা যাবে না। ১৯৫০ সনে সুন্দর বামকে সতোপন্থ পর্বতের মারাত্মক হিম প্রপাতের কাছেই শিবির স্থাপন করে হিমবাহের প্রকৃতি বরফের মারাত্মক ফাটল পর্যবেক্ষণ করবার পর ১৯৩৫ সনে এসে দেখা গিয়েছে অনেক পরিবর্তন। মূল চতুরঙ্গী হিমবাহের বরফ সম্ভার দ্রুত যেন নিঃশেষিত হতে চলেছে। তারই প্রতিক্রিয়া গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগ স্থলে দেখা গিয়েছে। হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে গিয়েছে···রেখে গেছে হিমবাহের মৃত কঙ্কালস্বরূপ অজস্র প্রস্তরের

স্তূপ।

১৯৩৫ সনে রক্তবরণ হিমবাহে প্রবেশ করেছিলাম। ১৯৩৫ সনের পূর্বেই সেই অঞ্চল জরিপ করেছিল ভারতীয় জরিপ বিভাগ। ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজার্মান দল এই অঞ্চলে এসেছিলেন শ্রীকৈলাস পর্বতারোহণের আশায়। কিন্তু রক্তবরণ হিমবাহের অপরূপ স্নাউট—বরফের বিস্ময়কর গুহার উল্লেখ দেখিনি কোন বিবরণে। রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউটের মুখে যেন সত্যিকারের গোমুখ। সেই গোমুখ থেকে নিঃসৃত ধারার প্রচলিত নাম কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গা অবশেষে রক্তবরণ উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে অবতরণ করেছে অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে। তারপর গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করেছে। রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউট তুলনামূলক ভাবে চতুরঙ্গী হিমবাহের মতো দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেনি। রক্তবরণ উপত্যকার মনোরম ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড নন্দনবনের মতোই সুশস্য ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। মানচিত্রে এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের চিহ্ন আছে, তবে কোন নাম নেই। এই সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলকল শব্দে সুন্দর জলধারা। ধারাটির উৎসস্থল রক্তবরণ হিমবাহের শাখা থেলুবামকের স্নাউট থেকে। ধারাটি ছোট, তবু ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের অনেক অংশই সিক্ত করে রেখেছে। রক্তবরণ হিমবাহের উৎসস্থল থেকে সোজা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে প্রভূত বরফ সম্ভার নিয়ে। যেখানে হিমবাহের পূর্বপাশ্বে প্রথম শাখা হিমবাহ নীলাম্বর বামক। তার পরই রক্তবরণ হিমবাহ সোজা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে। এই বাঁকের মুখেই দ্বিতীয় শাখা হিমবাহ পিলাপানি বামক। রক্তবরণ হিমবাহের অপর পারে অনামী বামক, তারপর বেশ বড় শ্বেত বরণবামক, সর্বশেষে থেলু বামক। এই সব শাখা হিমবাহ যেখানে এসে মিলিত হয়েছে রক্তবরণ হিমবাহে সে স্থানগুলোয় প্রভূত পরিমাণ পাথর সঞ্চিত হয়ে বামকগুলির ধারার চিহ্ন যেন ঢেকে রেখেছে। প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথর মূল রক্তবরণ হিমবাহে এসে এমনভাবে সঞ্চিত হয়েছে যে রক্তবরণের পার্শ্ব-গ্রাবরেখার প্রাচীর অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। রক্তবরণ হিমবাহের গতিবেগ মন্থর নয় হয়তো। হিমবাহের উভয় তীরের গিরিগাত্রে অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান। হিমবাহের মধ্য অংশে হিম সরোবরের সংখ্যা খুবই নগণ্য। চতুরঙ্গী হিমবাহের মতো রক্তবরণ হিমবাহ অত দীর্ঘ নয়।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রধান দুটি শাখা হিমবাহ চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ কোনো এককালে প্রভূত বরফ সম্ভার বয়ে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এসে মিলিত হয়েছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহে। পরে শাখা হিমবাহ দুটির স্নাউট পিছিয়ে যেতে যেতে প্রান্তিক গ্রাবরেখার প্রভূত পাথরগুলো ছড়িয়ে চলে গিয়েছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে শাখা হিমবাহগুলোর সঙ্গমস্থলের ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন সুস্পষ্ট। কালীগঙ্গার ধারা এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহে হারিয়ে গিয়েছে—এ চিহ্ন ১৯৩৫ সনের জরিপ বিভাগের টপোশীটে চিহ্নিত রয়েছে। গোমুখে বরফের গুহামুখে যতটা সম্ভব অগ্রসর হয়ে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় ভাগীরথীর জলধারা বহু দূরে বরফের নীলাভ সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে এসেছে প্রচণ্ড বেগে। এই সুড়ঙ্গ পথ যে দীর্ঘ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কালীগঙ্গার ধারা এসে যে স্থানে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ভেতরে সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি করে প্রবেশ করেছে, সে সুড়ঙ্গ গোমুখে দৃষ্ট বরফের সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। তবে একথা কি বলা যায় না যে ভাগীরথীর জলধারা গোমুখ পেরিয়ে দীর্ঘ বরফের সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত হয়েছে কালীগঙ্গার সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে সত্যি-কারের গোমুখ রক্তবরণ হিমবাহের স্নাউটে অপরূপ বরফের গুহা। আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে পরিব্রাজক শিল্পী শ্রদ্ধেয় প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় গোমুখ পেরিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপর দিয়ে। তিনি অপরূপ এক গোমুখ দর্শন করেছিলেন। তাঁর লেখা "যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ" বইয়ে উল্লেখ রয়েছে। সেই গোমুখ থেকে উৎসারিত ধারা দর্শন করেছিলেন তিনি। যদিও তাঁর রচনায় নিখুঁত ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। তবে তার দর্শন তীর্থযাত্রীর দর্শন। সে দর্শন সুদূর অতীত যুগের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের, যাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, দুর্গম পদযাত্রার দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে আসতেন হিমালয়ে। সেই গঙ্গার উৎস দর্শনের প্রথম তীর্থযাত্রী মহারাজা ভগীরথ। তাঁর প্রথম দর্শন, প্রথম উৎস আবিষ্কার-এর স্মৃতিকে স্মরণ করে তীর্থ-যাত্রীরাই হয়তো গঙ্গার ধারার নাম রেখেছিলেন ভাগীরথী।

॥ ১৮ ॥

অথো বিহায়ে মনমুগ্ধ লোকং, বিমর্শিতৌ হেয়তয়া গৃহস্থাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবামধিন্যমান, উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫

যা বৈলসচ্ছী তুলসী বিমিশ্র কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি দেশান্ ভয়ত্রলোকান্, কস্তাং সেবেত মরিষ্যমানঃ ।। ৬

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।১৯।৫-৬

মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় শমীক ঋষির কণ্ঠে মৃত সর্প স্থাপন করে মহারাজা পরীক্ষিৎ রাজপুরীতে এসে নানা চিন্তা করেছিলেন। ঠিক সেই সময় শমীক ঋষির প্রেরিত গৌরমুখ মহারাজা পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা বর্ণনা করেছিলেন সবিস্তারে। তদনুযায়ী, সপ্তম দিবসে মহারাজার মৃত্যু হবে তক্ষকের দংশনে। অভিশাপের কথা শুনবার পর রাজা চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি বিলাসব্যসনে মগ্ন, তিনি গভীরভাবে বিষয়ে আসক্ত। আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর সংবাদে তাঁর চিত্ত-বৈকল্য ঘটবে...বিষয় বৈরাগ্য জন্মিবে। ফলে তক্ষকের বিষাক্ত দংশনরূপ বিষয়াগ্নিকে শ্রেয় মনে হবে। অভিশাপের পূর্বে তিনি ইহলোক পরলোক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরে, এইসব চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবাকে সর্বপুরুষার্থ শ্রেয় মনে করে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনপূর্বক নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে-ছিলেন। এই পবিত্র গঙ্গানদী শ্রীকৃষ্ণের তুলসী মিশ্রিত চরণারেণুর সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট বারি বহন করে লোকপালের সঙ্গে সমস্ত লোকদের অন্তর ও বাহির পবিত্র করেছেন। আসন্ন মৃত্যুর সময় মহারাজা পরীক্ষিৎ এই পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্বক গঙ্গার জল সেবা করাই শ্রেষ্ঠ সেবা বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলোর নানা স্থানে নানা-ভাবে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে নানাচ্ছলে। পৃথিবীর ইতিহাসে নদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার কথা এমন করে আর কোথাও লেখা আছে কি না জানি না। রামায়ণে বর্ণিত মহারাজ ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী আজ সর্বজন বিদিত। গঙ্গার ধারা আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যাকে বর্তমানের দৃষ্টি দিয়ে হয়তো গঙ্গার উৎস আবিষ্কারের কথাই ভাবা যেতে পারে। গঙ্গার উৎসস্থল বিন্দুসরোবর···এ তথ্য রামায়ণেই প্রথম বলা হয়েছে। অযোধ্যানগর পরিত্যাগ করে মহারাজা ভগীরথ সমতলভূমি পর্যটন করে পেঁৗছে গিয়েছিলেন হিমালয়ের বন্ধুর অঞ্চলে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্য অতিক্রম করে ধীরে ধীরে তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে পেঁৗছেছিলেন গঙ্গার উৎস সন্ধানে। উৎস আবিষ্কার

করেছিলেন তিনি। গঙ্গার ধারা অনুসরণ করেছিলেন তিনি। তার অনুসৃত পথের চিহ্ন হারিয়ে গেলেও পথের আভাস হারিয়ে যায় নি নিশ্চয়ই। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে বিন্দুসরোবর থেকে মর্ত্যভূমিতে এসেছিলেন কোন পথ বেয়ে···এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। গঙ্গার জল পরম পবিত্র, গঙ্গার উৎসস্থল পবিত্র তীর্থস্থল, এ কথা নানা ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য তীর্থযাত্রী হিমালয়ের গভীরে এসেছিলেন গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎস স্থলে। সে ধারা কি মহারাজা ভাগীরথের নির্দেশিত চিহ্নিত পথ নয়? সুদূর অতীত যুগ থেকেই গঙ্গার কথা যেমন ভারতবাসীদের মনের মধ্যে গাঁথা ছিল, তেমতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তথ্যানুসন্ধানীরা গঙ্গার ধারা ও উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন।

তার মধ্যে রোমান দার্শনিক প্লিনি (৭০ খৃষ্টঃ), মিশরীয় দার্শনিক টলেমি (১৫০ খৃঃ) গঙ্গার ধারা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গঙগার ধারা পাটলিপুত্র পর্যন্ত জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন প্লিনি। ষ্ট্র্যাবো অবশ্য পাটলিপুত্র পর্যন্ত গঙগার ধারা পর্যবেক্ষণ করে জরিপ করেছিলেন। তাঁদেরও অনেক পূর্বে গ্রীক পর্যটক মেগাস্হিনিস (৩০০ খৃঃ পূঃ) গঙগার ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল অবস্হান করেছিলেন পাটলিপুত্র নগরে। গঙগার ধারা পর্যবেক্ষণ করবার সময় তিনি নদীর গভীরতা, জলসম্ভার সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। মেগাস্হিনিসের পূর্বে বৈদিক যুগে গঙগার উৎস ও ধারা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবার মতো কোন প্রাচীন যুগের তথ্যবিদ্ ছিলেন না হয়তো। তাই সে যুগে গঙ্গা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। রামায়ণের যুগেই সম্ভবতঃ প্রথম গঙ্গা সম্পর্কে পুরনো তথ্য দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাহিনী রামায়ণের অনেক স্থানকেই সমৃদ্ধ করে রেখেছে। রামায়ণে গঙ্গাকে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সবচাইতে পবিত্র ও বৃহৎ নদী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রামায়ণের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে মহাভারত ও পুরাণগুলো গঙ্গাকে হিমালয়ের দুহিতা বলে অভিহিত করেছে।

"ইয়ম্ হৈমবতী জ্যৈষ্ঠা গঙ্গা হিমবতো সুতো ॥" রামায়ণ আদিখণ্ড
৪২ অঃ ৩৩ শ্লঃ মহাভারত-অনুশাসন পর্ব ২৪ অঃ

গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। মহারাজা ভগীরথ গঙ্গার ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যলোকে। তাঁর নাম অনুসারেই গঙ্গার আর এক নাম হয়েছিল ভগীরথ। রামায়ণে এ কথাও লেখা আছে।

মহারাজা ভগীরথ সংসার ত্যাগ করে, বিলাসব্যসন ছেড়ে অযোধ্যার রাজপুরী থেকে চলে এসেছিলেন হিমালয়ের গভীরে। গভীর অরণ্য, পাহাড় পর্বতের বাধা অতিক্রম করে এসেছিলেন তুষারাবৃত অঞ্চলে। সেখানে অনাহারে, অনিদ্রায় গভীর তপস্যা করেছিলেন। কঠোর সাধনার ফলে তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে যেখানে গঙ্গার ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন। পরে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে সর্বশেষে এসেছিলেন সাগর সঙ্গমে' রামায়ণের যুগে মহারাজা ভগীরথই সম্ভবতঃ প্রথম অভিযাত্রী, প্রথম তথ্যানুসন্ধানী। গঙ্গার উৎস, গঙ্গার ধারা, গঙ্গার গভীরতা, সবকিছু মিলে মোটামুটি ভৌগোলিক পরিবেশের চিত্র এঁকে রেখেছিলেন। কালের কোন সঠিক হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহারাজ ভগীরথের কালের ইতিহাস আজ তাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মহারাজা হিমালয়ের গভীরে তুষারাবৃত অঞ্চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহে। এ তথ্য প্রমাণ করা দুঃসাধ্য বলেই কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীর মূল সূত্র রামায়ণ হলেও কিন্তু মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গঙ্গার জলধারার পবিত্রতা সুদূর অতীত যুগের অসংখ্য নরনারীদের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। এইসব তীর্থযাত্রীর দল জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে পেঁছে যেতেন গঙ্গার উৎস স্থলে। মহারাজা ভগীরথের আবিষ্কৃত ভাগীরথীর উৎস স্থল প্রচারিত হবার ফলে অতীতযুগের তীর্থযাত্রীদের ভীড় হত। গঙ্গার উৎস স্থল আজো তাই অসংখ্য নরনারীর কাছে পবিত্র তীর্থস্থল। মহারাজা ভগীরথ তুষারাবৃত হিমালয়ে সন্ধান পেয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে। যদিও রামায়ণ মহাভারতে বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। ভগীরথকে গঙ্গার উৎসে পেঁছবার জন্য হিমালয়ের গভীর তপস্যা করতে হয়েছিল।

বিন্দুসরোবর যেখানেই থাকুক না কেন, বর্তমানকালে ভূগোল-বিজ্ঞানীরা এই বিস্ময়কর হ্রদের অবস্থান খুঁজে পান নি। বিন্দুসর বা বিন্দুসরোবর হিমালয়ের গভীরে কোথায় অবস্থিত কিম্বা হিমালয় পর্বত-মালা অতিক্রম করে তিব্বতের মালভূমিতে অবস্থিত, এ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গার উৎস স্থলে একটি হ্রদ ছিল একথা অনুমান করা যায়। সেই হ্রদ মানসসরোবরের মতো বিশাল ছিল না। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বিন্দুসরোবর কোন স্থায়ী বিশাল জলাধার ছিল না বলেই মনে হয়। রামায়ণ, মহাভারতে বিন্দুসরোবরের কথা বলা হলেও সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই নেই।

পুরাণকার অবশ্য বিন্দুসরোবরের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করেছেন। সেই হ্রদ হয়তো কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্য। তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন অনেক জলধারাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত অনেক হ্রদের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবার মতো তথ্য ও চিহ্ন আজো বর্তমান।

মহারাজা ভগীরথের তপস্যার স্থল সম্পর্কে লেখা আছে রামায়ণে।

মন্ত্রি স্বাধ্যায় তদ্রাষ্যাম্ গঙ্গাবতরণে রতা।

তপো দীর্ঘম্ সমাতিষ্ঠৎ গোকর্ণে রঘুনন্দনে।। রামায়ণ বালখণ্ড ৪২ অধ্যায়।

রামায়ণ অনুসারে মহারাজা ভগীরথ গোকর্ণে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ করা আছে মহারাজা দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ে। পুরাণ অনুসারে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ে-বিন্দুসরে। রামায়ণে অবশ্য ভগীরথের পূর্ব পুরুষরা গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ে। হিমালয়েই তাঁরা দেহরক্ষা করেছিলেন। মহারাজা ভগীরথ গোকর্ণে দীর্ঘ তপস্যা করলেও বিন্দুসর বা বিন্দুসরোবরে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে লেখা আছে ঃ

ভগীরথো মহারাজো জটাচীরাধরোমুনে
গচ্ছন হিমাদ্রিম্ তপসে প্রাপ্তো গোদাবরী ততম্।।

অর্থাৎ রাজা ভগীরথ রাজ্য সংসার ত্যাগ করে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করে গোদাবরী তীর্থ দর্শনান্তে গিয়েছিলেন হিমালয়ের গভীরে। সেখানে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন গঙ্গা আনয়নের জন্য। এ তথ্য অনুসারে ভগীরথ অযোধ্যা থেকে ভিন্ন পথে গোদাবরী তীর্থে গিয়েছিলেন। সেখানে গোদাবরী তীরে গৌতম ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে গোকর্ণ। রামায়ণে বর্ণিত গোকর্ণের সঙ্গে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে গোদাবরীর যাত্রা প্রসঙ্গের উল্লেখের বেশ কিছু মিল রয়েছে। রামায়ণের তথ্য হয়তো নারদীয় পুরাণে আরো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

রামায়ণে বর্ণিত গোকর্ণের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়—গোকর্ণ উত্তর কানাড়া ও কারোয়ার ঝুমটা (বোম্বাই অন্তর্গত) অঞ্চলে গোকর্ণ অবস্থিত। মহাভারত ও পুরাণে গোকর্ণের উল্লেখ রয়েছে। গোকর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে গোকর্ণ মহাবালেশ্বরে অবস্থিত বিখ্যাত শিব মন্দির। পুনা শহর

থেকে বাসে মহাবালেশ্বর যাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিখ্যাত শৈলাবাস মহাবালেশ্বর সমুদ্রতল থেকে ৪৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সুতরাং বিখ্যাত শিবমন্দির গোকর্ণে মহারাজা ভগীরথ কেনই বা আসবেন গঙ্গা আনয়নের জন্য। গোকর্ণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে…বিন্দুসরোবর হিমালয় পর্বতমালার উত্তরাংশে। এমন বিস্ময়কর তথ্যের সঙ্গতি নেই বললেই সম্ভবতঃ গোকর্ণের নাম প্রসঙ্গে সংশয় জাগে। গোকর্ণ হয়তো মহারাষ্ট্র প্রদেশের তীর্থ স্থান নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে গোকর্ণ হিমালয়ের গভীরে কোন স্হানে অবস্হিত। যে স্হানে দীর্ঘ তপস্যার পর মহারাজা ভগীরথ তুষারাবৃত অঞ্চল অতিক্রম করে গিয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে।

গঙ্গার উৎস স্হল নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত পৌরাণিক ভূগোলতত্ত্ববিদ্ নন্দলাল দে।[১] রামায়ণে লেখা আছে—মহারাজা ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন গোকর্ণে। প্রাচীনযুগের তীর্থযাত্রীরা কিন্তু গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত গোকর্ণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরিচয় জানতেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন গঙ্গার উৎস স্হল গোমুখ। তাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে হয়তো বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ। সেই অতীত যুগের তীর্থ যাত্রীর ধারা আজও অব্যাহত। প্রখ্যাত নন্দলাল দে'র মতে গঙ্গার উৎস স্থল গোমুখ। সেখানেই মহারাজা ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। গোকর্ণ শব্দটি সম্ভবতঃ গোমুখই হওয়া উচিত। বিন্দুসর যা বিন্দুসরোবর গঙ্গোত্রীর সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্বও খুব বেশী নয়। মহারাজা ভগীরথ গোমুখে দীর্ঘ তপস্যার পর গিয়েছিলেন বিন্দুসরোবরে।

তুষার যুগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রীর বর্তমান মন্দিরের স্থান পেরিয়ে হয়তো বা ঝালা অবধি প্রসারিত ছিল। কালক্রমে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পিছিয়ে পড়তে শুরু করলে, হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তূপীকৃত পাথর কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট থেকে নিঃসারিত জলধারা সঞ্চিত হয়ে জন্মলাভ করেছিল এক বিশাল হ্রদের। ঝালা থেকে জাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই হ্রদ। পরবর্তীকালে সেই হ্রদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঝালা থেকে জাংলা পর্যন্ত এই বিশাল জলাধারের চিহ্ন সে যুগের হ্রদের সুস্পষ্ট চিহ্ন। অধুনালুপ্ত সেই হ্রদের পরিচয়পত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের তীর্থযাত্রীরা এই দুর্গম তীর্থের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন তথ্যই সংগ্রহ করে রেখে যায় নি। তবু গঙ্গার উৎস

১. The Early Course of the Ganges—Nondalal Dey.

স্থানের সঙ্গে জড়িত কোন হ্রদের অস্তিত্বের কথা দেখতে পেলেই…এই অধুনালুপ্ত নাম-গোত্র-পরিচয়হীন হ্রদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে চায়। ঝালায় অতীতযুগের হ্রদ সৃষ্টির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী অডেন ও তরুণ ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। হ্রদ সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে দুজন একমত না হলেও—একথা সত্য যে, তুষার যুগের গঙ্গোত্রী হিমবাহ ঝালা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রামায়ণের যুগে এই গঙ্গোত্রী হিমবাহের অবস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে তুষার যুগের পর হিমবাহ নিশ্চয়ই পিছিয়ে গিয়েছিল। সে যুগের গোমুখ আর বর্তমানের গোমুখের মধ্যে হয়তো অনেক দূরত্ব ছিল। রামায়ণের যুগে গঙ্গার উৎসস্থল হাজার হাজার বছর পরে পরিবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। বৈদিক যুগে গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু গঙ্গার উৎস স্থল সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। তবে গঙ্গার উৎস স্থল হিমালয়ে তুষারাবৃত অঞ্চল। কালের প্রভাবে পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন অনেক চিহ্নই মুছে ফেলে। বিরেহি তাল, মানা গিরিপথের কাছে দেবতাল, কালের সাক্ষী হয়ে বর্তমান থাকলেও আগামী যুগের ভূগোলতত্ত্ববিদ্দের কাছে কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হবে।

মানসসরোবর থেকে গঙ্গা উৎসারিত হয়েছিল। একথা শুনেছিলাম প্রথমে শৈশবে মায়ের মুখ থেকে। মা কেমন করে এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। বড় হয়ে, গঙ্গাকে দেখতাম। একবার একটি মানচিত্রে দেখেছিলাম—গঙ্গার উৎপত্তি স্থল মানসসরোবর। বিন্দু-সরোবর থেকে ভূগোলতত্ত্ববিদ্গণের দৃষ্টি গিয়েছিল এই মানসসরোবরের দিকে। হিমালয় পর্বতমালার উত্তরে তিব্বতের মালভূমি। সে মাল-ভূমির বুকের ওপরে এমন অপরূপ সরোবর। সুদূর অতীত যুগের তীর্থযাত্রীর দল যেতেন সেখানে তীর্থ করবার জন্য। গঙ্গার উৎস স্থল পবিত্র তীর্থভূমি। মানসসরোবরও পবিত্র তীর্থস্থান। মহাভারতের যুগেও বিন্দুসরোবরকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তীর্থস্থান হিসাবে বিন্দুসরোবরের প্রসিদ্ধি কালক্রমে হারিয়ে গিয়েছিল স্মৃতি থেকে। হয়তো সরোবর কোন এক সময়ে ক্ষীণ হয়ে শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অল্পায়ু বলেই সম্ভবতঃ এমন একটি হ্রদ তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টিপথে ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে নি। মানসসরোবর বিশাল, নীলাভ জলরাশি তীর্থযাত্রীদের দুচোখ ভরিয়ে রেখেছিল। তাই বিচার করবার সুযোগ হয় নি, প্রয়োজন বোধ করে নি সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য।

তীর্থযাত্রীরাই সম্ভবতঃ সবচাইতে বড় শক্তিশালী প্রচারক। ভূগোলতত্ত্ববিদ্গণ এই প্রচারকে অমূলক বলে পারে নি তুচ্ছ করতে। মানচিত্র দেখে অন্তত আমার এই কথাই মনে হয়েছিল।

গঙ্গা মানসসরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে—এ বিশ্বাস ভারতের বাইরে তিব্বত ও চীনদেশের অধিবাসীদের মনেও ছিল। তার প্রমাণ—গঙ্গার উৎপত্তিস্থল নিয়ে প্রথম মানচিত্র অঙ্কিত করেছিল চীনদেশের সামরিক দল ১৭১১ সনে। এই মানচিত্রের ত্রুটি লক্ষ্য করে ১৭১৭ সনে চীন সম্রাটের নির্দেশে নতুন করে মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। ১৭১১ সনের মানচিত্রে যে সব ত্রুটি ছিল···পরবর্তীকালে ১৭১৭ সনের মানচিত্রটিও কিন্তু ত্রুটি মুক্ত ছিল না। কারণ দুজন লামা মানসসরোবরে উপস্থিত হয়ে গঙ্গার উৎস পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের কাছে ভুল বিবরণ দিয়ে···ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করেই মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। পরে অবশ্য এই মানচিত্রের সত্যতা নির্ধারণ করে ১৭৩৩ সনে দ্য-অ্যানভেলিস নতুন করে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন গঙ্গার গতিপথ নির্দেশ করে। ১৭১১ সন থেকে শুরু করে ১৭৩৩ সন পর্যন্ত চারটি মানচিত্রেই গঙ্গার উৎস স্থলকে দেখানো হয়েছিল মানসসরোবর। ১৭৩৩ সনের পরে মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল ১৭৭৬ সনে, ১৮৮৪ সনে। সুতরাং ১৭১১ সনের চীনদেশের সামরিক কর্মচারীর অঙ্কিত মানচিত্রটির সংস্করণ পরিবর্তন ও ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য দ্য-হ্যালডেন, লামা ভূগোলতত্ত্ববিদ্গণ, দ্য-অ্যানভেলিস, অ্যাস্কুইটিল্ দ্য-প্যারন, টিয়েফন থালার সবাই ছটি মানচিত্র অঙ্কন করে গঙ্গার উৎস স্থল মানসসরোবর বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পর্তুগীজ মিশনারী আন্তোনিও দ্য আন্দ্রে (১৬২৪) আজে ভেদো (১৬৩১), ফাদার দেসদেরী (১৭১৫) গঙ্গার ধারা (অলকানন্দা) অনুসরণ করে গিয়েছিলেন তিব্বতে। তাদের ভ্রমণ বিবরণে গঙ্গার উৎস স্থল মানসসরোবর দর্শন করার উল্লেখ ছিল। পরবর্তী ভূগোলতত্ত্ববিদ্গণ পর্তুগীজ মিশনারীদের বিবরণের ত্রুটি উল্লেখ করেছিলেন। মিশনারীরা মানা গিরিপথেরওপরে দেবতাল নামে বরফের মধ্যে অবস্থিত সুন্দর হ্রদকে মানসসরোবর বলে ভুল করেছিলেন। দেবতালের পাশেই অবস্থিত অপর হ্রদকে রাক্ষস তাল বলে উল্লেখ করেছিলেন মিশনারীরা। অপ্রচুর শীতবস্ত্র ও খাদ্যের জন্য হিমশীতল পরিবেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার জন্য মিশনারীরা বস্তুত যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। তুষারের ঔজ্জ্বল্যের জন্য সাময়িকভাবে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল। সুতরাং সুস্থ সবল

অবস্থায় ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মতো দেহ ও মনের অবস্থা তেমন ছিল না। অথচ এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ তথ্যকে যথার্থ বিচার করে গঙ্গার উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছিল। গঙ্গার উৎস ও গতিপথ নির্দেশ করে যে সব তথ্য ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, প্রখ্যাত ভূগোলতত্ত্ববিদ্ রেনেল ১৭৯৭ সনে ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কন করে গঙ্গার উৎসকে মানসসরোবর বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই তথ্যই প্রচারিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। এই পুরনো মানচিত্রই আমি দেখেছিলাম।

রেনেল মানসসরোবর যান নি। মানসসরোবর থেকে গঙ্গা উৎসারিত হয়ে তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর সেই জলধারা ছোট বড় অনেকগুলো ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমালয়ের গিরিশিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুহামুখ থেকে নির্গত হয়েছে। এই গুহামুখের নাম ছিল গোমুখ। গঙ্গা মানসসরোবর থেকে উৎসারিত হলেও হিমালয় পর্বতমালায় প্রবেশ করে নির্গত হয়েছে গোমুখ থেকে। রেনেল মানসসরোবরকে উৎস বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনি গোমুখ··· গঙ্গোত্রীকেও অস্বীকার করেন নি। রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র পর্যালোচনার সময় ভূগোলতত্ত্ববিদ্গণ 'গঙ্গার উৎস মানসসরোবর' এ তথ্য স্বীকার করতে চাইলেন না। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পর্কে এমন ভুল ধারণা থাকা উচিত নয় মনে করতে শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। রেনেলের ত্রুটিপূর্ণ মানচিত্রকে অনুসরণ করা যথার্থ হবে না মনে করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদনীন্তন সার্ভেয়র জেনারেল লেফ্টেন্যাণ্ট কর্নেল-কোলব্রুককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন গঙ্গার উৎস পথ জরিপ করবার জন্যে। ১৮০৮ সনে ১২ই এপ্রিল লেফ্টেন্যাণ্ট ওয়েব, ক্যাপ্টেন র‍্যাপার ও হিয়ারসে হরিদ্বার থেকে পদযাত্রা শুরু করে ২০শে এপ্রিল পেঁছে গিয়েছিলেন ভাটোয়ারী। দুর্গম পথ ··ভাটোয়ারী পেরিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন নি তাঁরা। ভাটোয়ারীতেই অবস্থান করে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তাঁরা বদ্রীনাথ পেঁছেছিলেন ২৯ মে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ওয়েব ও র‍্যাপারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে। এই প্রবন্ধের আলোচনা হয়েছিল, ওয়েব লিখেছিলেন—গোমুখেরঅস্তিত্ব শুধুমাত্র বাইরের কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ। আসলে গোমুখ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। গঙ্গার ধারা ক্ষীণ হয়ে গঙ্গোত্রী থেকে আরো ওপরে বরফের স্তূপের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। ১৭৭০ সন থেকে ১৮৭০ সনে উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী

প্রাণপুরী মানসসরোবর দর্শন করে সর্বশেষে গঙ্গোত্রী এসেছিলেন। প্রাণপুরী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে। গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার ধারাকে ক্ষীণ দেখেছিলেন। ধারা এত ক্ষীণ যে লাফ দিয়ে পারাপার করা যায়।

ওয়েব ও র‍্যাপারের প্রবন্ধে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিপূর্ণ। প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার ধারা বর্ণনা অবিশ্বাস্য। ১৯৪৯ সনে অধ্যাপক চিবের ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর বিস্তর ১৯ মিটার বা ৬৩ ফুট। সুতরাং ভাগীরথীর ধারা লাফ দিয়ে পারাপার অবাস্তব ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর ধারা পর্যবেক্ষণ করেছি। জলধারার বিস্তার লাফ দিয়ে অতিক্রম করা অবাস্তব। এমন কি কেদারগঙ্গার ক্ষীণ ধারাও লাফ দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

১৮১৭ সনে হজসন ও হাবার্ট এসেছিলেন গোমুখ! কর্ণেল ফোর্ড মারখম ১৮৪৫ সনে গিয়েছিলেন গোমুখ। এশিয়াটিক রিসার্চে ও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে গোমুখের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণ অত্যন্ত বাস্তব···১৯৩৮ সন থেকে ১৯৩৮ সনে দেখা গোমুখ পর্যবেক্ষণের সময় হজসন ও মারখমের সুন্দর ও বাস্তব বর্ণনার কথাই মনে পরে। ১৮১২ সনে মুরক্রফ্ট ও হিয়ারসে মানসসরোবর পরিক্রমা করেছিলেন। তাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক রিসার্চে! মুরক্রফ্ট বেশ স্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন যে মানসসরোবরের সঙ্গে গঙ্গার ধারার কোন যোগাযোগ নেই। ১৮৪৬ সনে মানসসরোবর পরিক্রমা করেছিলেন হেনরী স্ট্র্যাচে। মানসসরোবর থেকে কোন দীর্ঘ জলধারা তিনি দেখতে পান নি। ১৯০৪ সনে রায়ডক মানসসরোবরে পৌঁছে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম এই অঞ্চল জরিপ করে একটি সুন্দর মানচিত্র রচনা করেছিলেন। রায়ডক মানসসরোবর থেকে নির্গত ছোট একটি জলধারা রাক্ষস তালের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই ধারাটির প্রচলিত নাম গঙ্গা চ্যু। চ্যু শব্দের অর্থ নদী··· সুতরাং গঙ্গা চ্যুর অর্থ গঙ্গা নদী। ১৯০৭ সনে হেডিন গঙ্গা চ্যু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মানসসরোবর পরিক্রমার সময়! ১৯২৮ সন থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত স্বামী প্রণবানন্দজী মানসসরোবর অঞ্চলে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অবস্থান করে এই অঞ্চল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সর্বশুদ্ধ ছেচল্লিশ বার গঙ্গা চ্যু অতিক্রম করে এই

ধারাটির উৎস ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গঙ্গা চ্যুর সঙ্গে যুক্ত কোন দীর্ঘ জলধারা দেখতে পান নি তিনি। তবু তিব্বতের মালভূমির বুকের ওপরে এমন একটি জলধারাকে গঙ্গা নদী বলে তিব্বতীয়রা প্রচার করেছিলেন কেন জানা যায় নি। সুদূর অতীতে এই ধারার অবস্থান...কেমন ছিল জানা সম্ভব নয়। রেনেলের মানচিত্রে চিহ্নিত গঙ্গার উৎস স্থল মানসসরোবর এ তথ্য অসার প্রমাণিত হয়েছিল মুরক্রফ্ট-এর মানসসরোবর ভ্রমণের পর থেকেই। রেনেলের মানচিত্রে ত্রৌটি থাকলেও গঙ্গার দুটি মুখ্য ধারা ভাগীরথী ও অলকানন্দা···এ তথ্য স্বীকৃত। রেনেল আরো নিশ্চিত ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে গঙ্গার দুটি প্রধান ধারার মধ্যে মুখ্য ধারার নাম ভাগীরথী।

ভাগীরথীর উৎস স্থল গোমুখ। গোমুখ—গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে দীর্ঘতম পর্বতমালার নাম হিমালয় পর্বতমালা। হিমালয় পর্বতমালার দীর্ঘতম হিমবাহ—গঙ্গোত্রী হিমবাহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দৈর্ঘ ৩০ কিলোমিটার।[১] হিমবাহটি প্রথমে লম্বালম্বি ভাবে উত্তর পশ্চিমে ১১·২০ কিলোমিটার অগ্রসর হবার পর আড়াআড়িভাবে উত্তর পশ্চিমে ১৯·২০ কিলোমিটার। হিমবাহটি প্রশস্তে তিন কিলোমিটার, প্রান্তদেশে প্রশস্ত আট কিলোমিটার। গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎস মুখের কাছেই মায়াশিদ ও স্বচ্ছন্দ বামক। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বাম দিকে গলহিম ও কীর্তিবামক। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দুটি প্রধান উপ-হিমবাহ—চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ। চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ হিমবাহের অনেকগুলো উপ-হিমবাহ রয়েছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফ যোগানদার এই ছোট বড় উপ-হিমবাহগুলি। এমন বৃহৎ ও বিস্ময়কর হিমবাহ আর কোথায়ও আছে কিনা জানা নেই। এই বিস্ময়কর হিমবাহের প্রান্তিক প্রাবরেখায় গোমুখ। সেখান থেকে নিঃসারিত হয়েছে ভাগীরথী। গঙ্গার এই একটি মাত্র ধারার উৎস স্থলে এমন বিশাল বরফের ভাণ্ডার, অসংখ্য পর্বত শিখর সব মিলিয়ে ভাগীরথীর সুপ্রাচীন পরিচিত অব্যাহত রয়েছে।

গোমুখের বরফের গুহার ভেতর থেকে জলধারা নির্গত হয়েছে। গলিত তুষার ও হিমবাহের ফাটল দিয়ে সঞ্চিত জলরাশি দীর্ঘ বরফের সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি করেছে। এই দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ আমি পর্যবেক্ষণ করেছি···। মনে হয়েছে রক্তবরণ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের স্নাউট থেকে

১. অধ্যাপক চিত্তবর

নির্গত জলধারা এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ভেতরে প্রবেশ করে গোমুখের দীর্ঘ বরফের সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত।

রেনেলের পরবর্তীকালে গঙ্গার উৎস মুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহ, গঙ্গার ধারার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধারার উৎস মুখ সম্পর্কে দৃষ্টি পড়েছিল দুঃসাহসী অভিযাত্রী আর ভূগোল-বিজ্ঞানীদের। ফলে গাড়োয়াল কুমায়ুনের তুষারাবৃত অঞ্চলে জরিপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। তুষারাবৃত পর্বতশিখরগুলোর উচ্চতা নির্ধারিত হয়েছিল। গাড়োয়াল কুমায়ুনে অবস্থিত হিমবাহগুলোর বৈশিষ্ট্য, বরফের গভীরতা, সেখানকার বাৎসরিক তুষারপাত, স্নাউটগুলোর উচ্চতা ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। উচ্চ হিমালয়ের ভৌগোলিক পরিবেশ, উল্লেখযোগ্য ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলোও চিহ্নিত হয়েছিল। সর্বোপরি এই সব অঞ্চলে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বত শিখর আরোহণের জন্য বিদেশী পর্বতারোহী এসেছিলেন ১৯৫২ সন পর্যন্ত। গাড়োয়াল কুমায়ুনের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে উৎসারিত নদীগুলো মূলতঃ গঙ্গার বিভিন্ন ধারা। এই ধারাগুলো সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। ফলে ভারতীয় জরিপ বিভাগ দ্বারা ১৯৩৫-৩৭ সনে গাড়োয়াল কুমায়ুনের সমস্ত অঞ্চলের মূল্যবান মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

১৯৫২ সনের পর থেকেই ভারতীয় অভিযাত্রীরা গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। সেই সব অভিযাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূগোল বিজ্ঞানী সেই সব অঞ্চলের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। সেই সময় ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মীরা গাড়োয়াল কুমায়ুনের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল জরিপ করেছিলেন। তাঁদের মূল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৩৮ সনে প্রকাশিত হয়েছিল মূল্যবান মানচিত্র। ফলে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য শাখা নদীগুলোর উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় গঙ্গার পরিচয় সহজ হয়েছিল। ফলে ভারতীয় ভূগোল-বিজ্ঞানীদের কাছে গঙ্গার প্রকৃত উৎস আর তেমন রহস্যাবৃত ছিল না।

গঙ্গার জন্ম হয়েছিল সভ্যতার উষালগ্নে। মধ্যাহ্নের দাবদাহে গঙ্গার কথা আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। সুদূর অতীত যুগ থেকে গঙ্গা অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন নিয়েছিল। বর্তমান যুগেও গঙ্গা বিশ্বের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে রয়েছে। আজ তাই আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতো আমাকেও জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল গোমুখে বরফের গুহার সামনে এসে।

নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?

ভাগীরথীর উচ্ছল কলধ্বনির মধ্যে উত্তর এসেছিল—মহাদেবের জটা-হইতে !

মহাদেবের জটা। কোথায় সেই মহাদেব···যিনি বিশাল হিমালয়ের গিরিগাত্র থেকে পাথর খসিয়ে স্তূপীকৃত করেছিলেন। বিশাল বিশাল পাথরগুলো ভেঙে চুরমার করেছিলেন। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথর ভেঙে ভেঙে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের দেবতা··· কোথায় তার বিশাল জটাজাল যেখান থেকে গঙ্গার ধারা অবতরণ করেছিল।

১৯৬৭ সনে সেবার কেদারনাথ অভিযানে যোগদান করেছিলাম। আমাদের শেষ শিবির স্থাপিত হয়েছিল ২০৪০০ ফুট উচ্চতায়। একদিন সেই শেষ শিবির অতিক্রম করে উঠেছিলাম ২১০০০ ফুট উচ্চতায়। বেলা দ্বিপ্রহর। আকাশ গাঢ় নীল, কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। নিচের দিকে তাকাতেই থমকে গিয়েছিলাম। প্রায় সাতহাজার ফুট নিচে বিশাল গঙ্গোত্রী হিমবাহকে ক্ষীণ জলধারার মতোই মনে হয়েছিল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট অসংখ্য শাখা হিমবাহ দেখে মনে হয়েছিল এই তো সেই বিশাল মহাদেবের জটাজাল। ১৯৩৮ সনে চতুরঙ্গী হিমবাহের পার্শ্ববর্তী গিরিশিরা বেয়ে পৌঁছেছিলাম ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায়। সেখান থেকে তিন চার হাজার ফুট নিচে চতুরঙ্গী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখার মধ্যে দেখেছিলাম মহাদেবের অসংখ্য জটাজাল। ১৯৩৮ সনে রক্তবরণ হিমবাহে একটি গিরিশিরার ওপরে বসে বসে সেই অসংখ্য জটাজাল দেখেছি। এইসব জটাজাল থেকেই তো নেমে এসেছে গঙ্গার অজস্র ধারা। বুঝেছি, মুগ্ধ হয়ে দেখেছি, দেবাদিদেব মহাদেবরূপী কেদারনাথ, শিবলিঙ্গ, শ্রীকৈলাস। মহাদেব এমনি বিশাল জটাজাল বিস্তার করে রেখেছে, হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে। সেখানে অজস্র জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে গঙ্গার অসংখ্য ধারা। সেই সব অসংখ্য ধারা সম্মিলিত হয়ে দেবপ্রয়াগে এক হয়ে মর্ত্যে অবতরণ করেছে গঙ্গা নামে।

দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি গঙ্গার তীর ধরে। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা অব্যক্ত সঙ্গীতের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে কখনো গিয়েছি গঙ্গোত্রী—কখনো বা গোমুখে কাটিয়েছি দিনের পর দিন। আবার চলে এসেছি ঋষিকেশ···হরিদ্বার। গঙ্গার কথা তবু আমার শেষ করা হয় নি।